কবিমানসী

দ্বিতীয় খণ্ড

জগদীশ ভট্টাচার্য

আমার ভালোবাসার আর-একটা ধারা
মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিতবাহিনী।
মহীয়সী নারী স্নান ক'রে উঠেছে
তারি অতল থেকে।
সে এসেছে অপরিসীম ধ্যানরূপে
আমার সর্বদেহে-মনে
পূর্ণতর করেছে আমাকে আমার বাণীকে।
জ্বেলে রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে
চিরবিরহের প্রদীপশিখা।

সেই আলোকে দেখেছি তাকে অসীম শ্রীলোকে,
দেখেছি তাকে বসন্তের পুষ্পপল্লবের প্লাবনে,
সিমুগাছের কাঁপনলাগা পাতাগুলির থেকে
ঠিকরে পড়েছে যে রৌদ্রকণা
তার মধ্যে শুনেছি তা'র সেতারের দ্রুতঝংকৃত সুর।
দেখেছি ঋতুরঙ্গভূমিতে
নানা রঙের ওড়না-বদল-করা তার নাচ
ছায়ায় আলোয়।

ইতিহাসের সৃষ্টি-আসনে
ওকে দেখেছি বিধাতার বামপাশে ;
দেখেছি সুন্দর যখন অবমানিত
কদর্য কঠোরের অশুচিস্পর্শে
তখন সেই রুদ্রাণীর তৃতীয় নেত্র থেকে
বিচ্ছুরিত হয়েছে প্রলয়-অগ্নি,
ধ্বংস করেছে মহামারির গোপন আশ্রয়।
[পত্রপুট, পনেরো ।

প্রস্তাবনা

প্রীতিরতি এরস্-তত্ত্ব লিবিডো ও প্রেমধর্ম

১

ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের আদিসংহিতাকার ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে শৃঙ্গার-রসের স্থায়িভাবের নাম দিয়েছিলেন রতি। 'তত্র শৃঙ্গারো নাম রতিস্থায়িভাব-প্রভবঃ। উজ্জ্বলবেষাত্মকঃ।' এই শৃঙ্গারই পরবর্তীকালে আদিরস নামে অভিহিত হয়েছে। বৈষ্ণব রসিকগণের নিকট শৃঙ্গার বা আদিরসই মধুর কান্ত বা উজ্জ্বলরস।

ভরত শৃঙ্গারকে বলেছেন উজ্জ্বলবেষাত্মক। উজ্জ্বল শব্দের অর্থ পরস্পর-সন্নিকর্ষজনিত আস্বাদ, আর বেষ শব্দের অর্থ পরস্পরের মধ্যে তার ব্যাপ্তি। ভরত-কথিত শৃঙ্গাররসের এই সংজ্ঞার্থ অনুসরণ করে পরবর্তী অলংকারশাস্ত্রে দুটি ধারার উদ্ভব হয়েছে। একদল শৃঙ্গারকে সংকীর্ণ পরিধিতে সীমাবদ্ধ করে বলেছেন, নায়ক-নায়িকার প্রেমের কাব্য-নিবেশিত রসনিষ্পত্তির নামই আদি বা শৃঙ্গাররস। অন্যদলের মতে, স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি অভিলাষ-রূপ কামের প্রবৃত্তিমাত্রকেই শৃঙ্গার বলা অব্যাপ্তিদোষদুষ্ট। শৃঙ্গারের অর্থ অনেক ব্যাপক ও গভীর।

শৃঙ্গারকে যাঁরা নায়ক-নায়িকার প্রেমেরই রসপরিণাম বলে মনে করেন, অর্থাৎ যাঁরা সংকীর্ণ অর্থেই শৃঙ্গারকে গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কথা বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্যদর্পণে'র অনুসরণে বোঝবার চেষ্টা করা যেতে পারে। শৃঙ্গারের স্থায়িভাব 'রতি'র সংজ্ঞা-নির্দেশ করে বিশ্বনাথ বলেছেন, মনের অনুকূল প্রিয়বস্তুতে মনের প্রবণতা বা প্রেমার্দ্র অবস্থার নামই রতি। 'রতির্মনোঽনু-কূলেঽর্থে মনসঃ প্রবণায়িতম্।' টীকায় বলা হয়েছে, 'রতিরিতি মনসোঽনুকূলে প্রিয়ে বস্তুনি প্রবণায়িতং প্রেমার্দ্রং মনোরতিরিত্যর্থঃ।' শৃঙ্গারের সংজ্ঞায় বিশ্বনাথ বলেছেন—

> শৃঙ্গং হি মন্মথোদ্ভেদস্তদাগমনহেতুকঃ।
> উত্তমপ্রকৃতিপ্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার ইষ্যতে ॥

টীকায় বিশদীভূত করে বলা হয়েছে, 'শৃঙ্গমিতি। মন্মথস্য সম্ভোগেচ্ছায়াঃ উদ্ভেদ উদ্বোধঃ তদাগমনহেতুকঃ মন্মথোদ্ভেদ-প্রাপ্তিজন্যঃ বীতরাগাণাং রসানুৎপত্তেঃ উত্তমঃ প্রকৃতির্নায়কো যত্র সঃ প্রায় ইত্যনেন শৃঙ্গারাভাসাদাবধমপ্রকৃতিত্বং সূচিতং এবঞ্চ শৃঙ্গমিচ্ছতি।'

শৃঙ্গার দ্বিবিধ। বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের চারিটি ভাগ : পূর্বরাগ, মান, প্রবাস ও করুণ। [বৈষ্ণবগণের মতে পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস]। সম্ভোগের অর্থ হল দর্শন ও আলিঙ্গনাদির আনুকূল্যহেতু নায়ক-নায়িকার উল্লসিত ব্যবহার ও ভাব। উজ্জ্বলনীলমণিতে বলা হয়েছে :

দর্শনালিঙ্গনাদিনামানুকূল্যান্নিষেবয়া।
যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্যতে॥

মুখ্য ও গৌনভেদে সম্ভোগ দ্বিবিধ। জাগ্রত অবস্থায় সম্ভোগের নাম মুখ্য সম্ভোগ, আর স্বপ্নে সম্ভোগ হল গৌণ সম্ভোগ। মুখ্যসম্ভোগ আবার চতুর্বিধ। সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন এবং সমৃদ্ধিমান্। পূর্বরাগের পর সংক্ষিপ্ত, মানের পর সংকীর্ণ, প্রবাসের পর সম্পন্ন এবং সুদূর-প্রবাসের পর সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ হয়ে থাকে। সম্ভোগের শেষ পর্যায় হল সম্প্রয়োগ অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের 'অঙ্গসঙ্গ' বা দেহমিলন। সম্প্রয়োগের পূর্ববর্তী চুম্বন-আলিঙ্গনাদিকে বলা হয়েছে লীলাবিলাস। বিদগ্ধজনের কেউ কেউ সম্প্রয়োগের চেয়ে লীলাবিলাসকে মধুরতর বলে মনে করেন। উজ্জ্বলনীলমণিতে বলা হয়েছে :

বিদগ্ধানাং মিথো লীলাবিলাসেন যথা সুখং
ন তথা সম্প্রয়োগেন স্যাদেবং রসিকা বিদুঃ।

২

শৃঙ্গারকে যাঁরা এই সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেন নি, তাঁদের অগ্রগণ্য হলেন অভিনবগুপ্ত। খ্রীস্টীয় দশম শতকের এই দার্শনিক ও আলংকারিক 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের "লোচন" টীকা রচনা করে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তিনি ভরতের নাট্যশাস্ত্রেরও 'অভিনবভারতী' নাম্নী একটি উল্লেখযোগ্য টীকা রচনা করেছিলেন। অভিনব তাঁর নাট্যশাস্ত্রের টীকায় শৃঙ্গার এবং তার স্থায়ি-ভাব রতির স্বরূপ নির্ণয়ে 'অঙ্গসঙ্গ'কে মুখ্যস্থান দেন নি। তিনি স্পষ্টই

বলেছেন, স্ত্রীপুরুষের পরস্পরাভিলাষরূপ কামপ্রবৃত্তিকেই শৃঙ্গার বা রতি বলে না। তিনি স্ত্রীপুরুষের পরস্পরাভিলাষকে বলেছেন রতি-স্থায়িভাবের ব্যভিচারী ভাব। ভরতের "স চ স্ত্রীপুরুষহেতুকঃ উত্তম-যুবপ্রকৃতিঃ"—এই বাক্যের টীকায় অভিনব বলেছেন, "স্ত্রীপুরুষশব্দেন পরস্পরাভিলাষসংভোগ-লক্ষণয়া লৌকিক্যা 'অস্য ইয়ং স্ত্রী' ইতি ধিয়া। তেন অভিলাষমাত্রমপরায়াঃ কামাবস্থানুবর্তিন্যা ব্যভিচারিরূপানীতিয়া [পানীতায়া] বিলক্ষণ এব ইয়ং স্থায়িরূপা প্রারম্ভাদিফলপ্রাপ্তিপর্যন্তা ব্যাপিনী পরিপূর্ণসুখৈককল্পরতিশ[ক্ত]ক্তা ভবতি।"

অভিনবের মতে আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত মিলন-বিরহ-নির্বিশেষে নায়ক-নায়িকার চিত্তে যে অবিশ্রান্ত সুখপ্রবাহ বিরাজমান থাকে তারই নাম রতি। অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার মধ্যে যে পারস্পরিক একাত্মতা ও নিরন্তর অবিচ্ছিন্ন ঐক্যভাব, অভিনব তাকেই বলেছেন রতি। "একা এব হি অসৌ তাবতী রতিঃ। যত্র অন্যোন্যসংবিদা একবিয়োগো ন ভবতি।" অভিনব এখানেই থামেন নি, তাঁর ব্যাখ্যায় আরেক পদ অগ্রসর হয়ে বলেছেন, "অবিযুক্তসংবিৎপ্রাণস্তু শৃঙ্গারঃ। ব্যাখ্যাতঃ পরস্পরং জীবিতসর্বস্বাভিমানরূপঃ। বেষয়তি ব্যাপয়তি চিত্তবৃত্তি-মন্যত্র জ্ঞাপনয়া সংক্রময়তি ইতি বেষঃ বিভাবানুভাবাত্মা।" অর্থাৎ একজন যেখানে অপরকে নিজের প্রাণস্বরূপ মনে করে এবং অপরের মধ্যে সেই ভাবকে সংক্রামিত করে দেয় সেখানেই থাকে শৃঙ্গারের স্থায়িভাব বা রতি। অধ্যাপক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'কাব্যবিচার' গ্রন্থে অভিনবের এই টীকার ব্যাখ্যায় বলেছেন, "পরস্পর জ্ঞানের মধ্যে, চিন্তার মধ্যে ধ্যানরূপে বা সমাধিরূপে পরস্পরের যে অবস্থিতি তাহাই শৃঙ্গারের স্থায়িভাব বা রতি। বাহ্যিক মিলনেচ্ছা রতি নহে। * * * যদিও শৃঙ্গারের মধ্যে পরস্পরের আস্বাদ আনন্দরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে তথাপি সেই আস্বাদের মূল কেন্দ্রস্বরূপ রহিয়াছে জগতের একটি গভীর সত্য—আত্মার সহিত আত্মার মিলন, প্রাণের সহিত প্রাণের মিলন।[১]

৩

রতিকে হৃদয়সম্পর্কের ব্যাপকতম ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করেছেন কবিকর্ণপূর তাঁর 'অলংকারকৌস্তভ' গ্রন্থে। কবিকর্ণপূর 'শৃঙ্গারপ্রকাশ' ও 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ'-রচয়িতা ভোজরাজকে অনুসরণ করে দশম ও একাদশ রস হিসাবে বাৎসল্যরস ও প্রেমরসকেও স্বীকার করেছেন। বাৎসল্যের স্থায়ী 'মমকার', আর প্রেমের স্থায়ী 'চিত্তদ্রব'। কবিকর্ণপূর 'রতি'র নূতন সংজ্ঞা রচনা করে বললেন, চিত্তরঞ্জনকারী ধর্মবিশেষের নামই রতি। তা সুখভোগের আনুকূল্যকারী। 'রতিশ্চেতোরঞ্জকতা সুখভোগানুকূল্যকৃৎ।' বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁর সুবোধনী টীকায় এই সূত্রের ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'চিত্তস্য রঞ্জনং দ্রবীভাব ইতি তজ্জনকধর্মবিশেষ এব চেতোরঞ্জকতা'—অর্থাৎ যা চিত্তকে রঞ্জিত করে বা রাঙিয়ে দেয় তারই নাম রতি। এই সংজ্ঞায় হৃদয়সম্পর্ক-মাত্রকেই যেন রতি নামে অভিহিত করতে পারা যায়।

এই চিত্তরঞ্জনী রতি দ্বিবিধ। সম্প্রয়োগবিষয়া, এবং অসম্প্রয়োগবিষয়া। চেতোরঞ্জকতা সম্প্রয়োগবিষয়া হলে সাধারণ অর্থে তাকে বলা হয় 'রতি', আর অসম্প্রয়োগবিষয়া হলে তার সাধারণ নাম হয় 'প্রীতি'।

যা সম্প্রয়োগবিষয়া সা রতিঃ পরিকীর্তিতা।
সম্প্রয়োগঃ স্ত্রীপুরুষব্যবহারঃ সতাং মতঃ।
অসম্প্রয়োগবিষয়া সৈব প্রীতির্নিগদ্যতে ॥

অসম্প্রয়োগবিষয়া রতিকে সাধারণ ভাবে প্রীতি বলা হলেও, [ভোজরাজ[২] তাই বলেছেন], কবিকর্ণপূর এই অসম্প্রয়োগবিষয়া রতিকে আবার চারভাগে বিভক্ত করেছেন—প্রীতি, মৈত্রী, সৌহার্দ ও ভাব। 'সা প্রীতিমৈত্রীসৌহার্দভাবসংজ্ঞাং চ গচ্ছতি।'

প্রীতি মনোবৃত্তিময়ী রতি। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা হয়েছে সখার পত্নী এবং পতির সখাতে যে চিত্তরঞ্জকতা তারই নাম হল প্রীতিরতি। দ্রৌপদীর সঙ্গে কৃষ্ণের সম্পর্কই তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। সখাতে সখাতে, বা সখীতে সখীতে, অর্থাৎ পুরুষে পুরুষে এবং নারীতে নারীতে যে অনুরাগ তার নাম মৈত্রী। প্রীতিরতি একান্তই মনোময়ী, সুতরাং সেখানে অঙ্গস্পর্শাদি নেই। মৈত্রী অঙ্গস্পর্শোচিতা। সখার পত্নী এবং পতির সখাতে যে ভাব তা যদি 'নির্বিকারা',

'সদৈকাভা' ও 'সদৈকরূপা' হয় তাহলে তার নাম সৌহার্দ। 'নির্বিকারা সদৈকাভা সা সৌহার্দমিতীষ্যতে। সদৈকাভা সদৈকরূপা সা চেতোরঞ্জকতা।' সৌহার্দের সার্থক উদাহরণ বোধ করি কাদম্বরী-কাহিনীর চন্দ্রাপীড় আর পত্রলেখার সম্পর্ক। প্রীতি থেকে সৌহার্দকে পৃথক করে নেওয়ার অর্থ হল এই যে, পুরুষে নারীতে যে অসম্প্রয়োগবিষয়া মনোময়ী রতি তার মুখ্যত দুটি ভেদ স্বীকার্য। যে-সম্পর্কে অনুভূতির মধ্যে কোন বিকার নেই, যার রঙ ও রূপ চিরদিনই এক, অর্থাৎ যেখানে চিত্তরঞ্জকতার হ্রাস-বৃদ্ধি নেই, তাকেই বলা হয়েছে সৌহার্দ। পক্ষান্তরে পুরুষে নারীতে যে মনোময়ী রতিতে বিকারও হতে পারে এবং যার রঙ ও রূপের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় তারই নাম প্রীতিরতি। দেবতা ও গুরুজনবিষয়া যে মনোময়ী রতি তার নাম হল 'ভাব'। মম্মটভট্টও [একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী] তাঁর 'কাব্যপ্রকাশে' দেবাদিবিষয়া রতিকে বলেছেন ভাব। 'রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথাঞ্জিতঃ। ভাবঃ প্রোক্তঃ।'

'অলংকারকৌস্তভ'-প্রণেতা সম্প্রয়োগ এবং অসম্প্রয়োগবিষয়া দ্বিবিধ রতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারবিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু সম্প্রয়োগ-বিষয়ে তিনি কোনও উন্নাসিক মনোবৃত্তির আভাসমাত্র দেন নি। তিনি বলেছেন, অবস্থার উৎকর্ষবিশেষে সম্প্রয়োগবিষয়া রতিও পাক থেকে পাকান্তর প্রাপ্ত হয়ে ইক্ষুরসের সিতোপলারূপে পরিণামের মত চরমপাকে পরিণত হয়।

যা সম্প্রয়োগবিষয়া সাঽপি অবস্থাবিশেষতঃ।
পাকাৎ পাকান্তরং প্রাপ্য চরমে পর্যবস্যতি ॥

এই শ্লোকে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা একান্ত প্রয়োজন। যা সম্প্রয়োগবিষয়া রতি তাও [সা অপি] অবস্থাবিশেষে চরম পরিণাম অর্থাৎ রসে পর্যবসিত হয়। অবস্থাবিশেষ বলায় এই অর্থই অভিব্যঞ্জিত হচ্ছে যে, সব সম্প্রয়োগবিষয়া রতিই চরমে পর্যবসিত হয় না। তার জন্যে অবস্থার উৎকর্ষ প্রয়োজন। 'সা অপি' বলাতে ব্যঞ্জনায় বলা হয়ে গেল যে, অসম্প্রয়োগবিষয়া রতি অবশ্যই চরম অবস্থা লাভ করে। অর্থাৎ প্রীতিরতি, মৈত্রীরতি, সৌহার্দরতি এবং ভাবরতি স্থায়িভাবরূপে বিভাব অনুভাবের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে শৃঙ্গার রসে পরিণমিত হয়। বলাই বাহুল্য, এই বিশ্লেষণে শৃঙ্গার রসেরও পরিধি বহু ব্যাপকতায় প্রসারিত হল। প্রচলিত ও লৌকিক অর্থে আমরা যাকে প্রেম বলি, অর্থাৎ যে-সম্পর্কে সম্প্রয়োগ বারিত নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হল সাধারণ সংজ্ঞায় যাকে

বলা হয়েছে প্রীতি। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে সেই প্রীতি চার ভাগে বিভাগিত— প্রীতি, মৈত্রী, সৌহার্দ ও ভাব। ওই চতুর্বিধ প্রীত্যাখ্য রতির ক্ষেত্রেই সম্প্রয়োগ বারিত। পুরুষে নারীতে সম্পর্কের বেলা তা একান্তভাবেই মনোবৃত্তিময়ী। চতুর্বিধ অসম্প্রয়োগবিষয়া রতির মধ্যে প্রীতিরতিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তা একান্তভাবেই মানসলোকের ব্যাপার হওয়া সত্ত্বেও তার বিকার আছে, এবং তার রং ও রূপের হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। অর্থাৎ প্রীতিরতিতে মানসলোকে বিচিত্র বাসনা বিলসিত। এমন কি, পরস্পর পরস্পরকে অবলম্বন করে মনে-মনে লীলাবিলাস ও সম্প্রয়োগের বাসনাও সেখানে আস্বাদ্যমান হতে পারে। বলাই বাহুল্য, এই প্রীতিরতির বিকাশ, বিবর্তন ও বিশুদ্ধিকরণ, অর্থাৎ পাক থেকে পাকান্তর প্রাপ্ত হয়ে তার অন্তিম রসপরিণাম নরনারীর হৃদয়-সম্পর্কের এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার। যেখানে মনঃপ্রকর্ষ চারুচর্যা ও শুচিশীলনে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছে সেখানে নরনারীর মানসলোকে প্রীতিরতির লীলা পরম বিস্ময়াবহ। উজ্জ্বলনীলমণিতে বলা হয়েছে বিদগ্ধজনের কাছে সম্প্রয়োগের চেয়ে লীলাবিলাস মধুরতর। জীবগোস্বামী প্রীতিসন্দর্ভে বলেছেন, বনিতার অনুরাগ-আস্বাদনে বিদগ্ধজনের যে বাঞ্ছা তার স্পর্শাদিতে তা নেই। 'বিদগ্ধানাং যথা বনিতানুরাগাস্বাদনে বাঞ্ছা ন তথা তৎস্পর্শাদাবপি।' [প্রীতিসন্দর্ভ, ৩৭৬ অনুচ্ছেদ।]

গুরুজন ও দেববিষয়া মনোরতির নামকরণ করা হয়েছে 'ভাব'। গুরুজনের প্রতি ভাবরূপা প্রীতিরতিও সমভাবেই চিত্তরঞ্জক। এবং তারও রসপরিণামের নাম শৃঙ্গার। জীবগোস্বামী তাঁর প্রীতিসন্দর্ভে দেববিষয়া প্রীতিরতির অপূর্ব বিশ্লেষণ করেছেন। গুরুজনবিষয়া ভাবরূপা প্রীতির অনুশীলন প্রস্ফুরণ এবং শৃঙ্গারে তার চরম রসপরিণামও কম আহ্লাদজনক নয়। রবীন্দ্রমানসে তাঁর মানসলক্ষ্মীর প্রতি অনুরাগ গঙ্গা-যমুনা-প্রবাহের মত প্রীতি ও ভাবরতির যুগলধারায় প্রবাহমান। কখনও তা যুক্তবেণী, কখনও তা মুক্তবেণী। কখনও প্রীতিই মুখ্য। তখন কবির অনুরাগ মানস-বিপ্রলম্ভের বিচিত্র-লীলায় বিলসিত। আর যখন ভাবই মুখ্য হয়ে উঠেছে তখন মানসসুন্দরী দেখা দিয়েছেন দেবীমূর্তিতে। পাক থেকে পাকান্তর প্রাপ্ত হয়ে তাই হয়েছে অন্তর্যামী-জীবনদেবতা-চেতনার অনিঃশেষ উৎস।

৪

প্রতীচ্য জগতে প্রেমচেতনার আদি-সংহিতাকার হলেন গ্রীক কবি-দার্শনিক প্লেটো। এমার্সন তাঁর 'রিপ্রেজেণ্টেটিভ মেন' গ্রন্থে বলেছেন, 'Plato is philosophy, and philosophy, Plato'. এমার্সনের অনুকরণ করে বলা যায়, প্লেটোই দিব্যপ্রেম, দিব্যপ্রেমই প্লেটো। প্লেটো তাঁর প্রেমতত্ত্ব এরস্-তত্ত্বের মধ্য দিয়েই ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে দিব্য-এরস ও জৈব-এরসের জন্মকথা বলেছি। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা-চেতনার আলোচনা প্রসঙ্গে যথাস্থানে এরস-তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে।

প্লেটোর এরস-তত্ত্ব তথা প্রেমতত্ত্বের নানা টীকাভাষ্য হয়েছে পরবর্তী য়ুরোপে। খ্রীস্টীয় মিষ্টিকদের হাতে, প্লটিনাস-প্রমুখ নিও-প্লেটোনিস্টদের নবব্যাখ্যায়, কিংবা এলিজাবেথীয় ও পরবর্তী রোমান্টিক প্রেমকল্পনায় প্লেটোর প্রেমাদর্শ নব নব রূপ পরিগ্রহ করেছে। তার ফলে প্লেটো দিব্য-এরসের প্রেরণাসম্ভূত মানবহৃদয়ের মহত্তম প্রেরণারূপী যে প্রেমচেতনার কথা তাঁর 'সিম্পোসিয়াম' এবং 'ফিড্রাস' নামক ডায়লগে বলেছেন, তার স্বরূপই আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ইদানীং কালে যাকে বলা হয় 'প্লেটোনিক প্রেম' তার সঙ্গে প্লেটোর মূল চিন্তার পার্থক্য অনেকখানি। প্লেটোনিক প্রেমের যে অর্থ সাধারণ্যে প্রচলিত তার পরিচয় সহজেই দেওয়া যাবে চণ্ডীদাসের কবিতার ঈষৎ পরিবর্তন করে :

প্লেটোনিক প্রেম নিকষিত হেম
কামগন্ধ নাহি তায় ॥

রোমান্টিসিস্টদের হাতে প্লেটোনিক প্রেমের এই যে নবরূপায়ণ তাকে প্লেটো-বিশেষজ্ঞগণের অন্যতম এ. ই. টেলর বলেছেন সবচেয়ে 'un-Platonic.'[৩] এ সম্পর্কে জি. এল. ডিকিন্সনের বিশ্লেষণে বক্তব্যটি বিশদীভূত হয়েছে। তিনি বলেছেন :

"We are accustomed to the phrase 'Platonic Love,' but we do not use it in Plato's sense, since few of us have his temperament and attitude. He was not thinking of love without sex-feeling, a mere comradeship, still less of a kind of pretence or hypocrisy. He was thinking of a passion which

should transform itself, in the better and nobler instances, into objects more and more public and disinterested, until it should lose, or rather find, itself in direct apprehension of a higher world."[৪]

অর্থাৎ কামগন্ধহীন প্রেমের কল্পনা প্লেটোর কল্পনা নয়। কামের উর্ধ্বায়িত ও বিশুদ্ধীভূত অবস্থারই নাম প্লেটোনিক প্রেম। কাম সেখানে শুধু যে আছে তাই নয়, উর্ধ্বগতির জন্যে তা অত্যাবশ্যকও বটে। এ সম্পর্কে সাম্প্রতিককালের প্লেটো-বিশেষজ্ঞ জার্মান অধ্যাপক Paul Friedlander একথা অকুণ্ঠ ভাষাতেই প্রকাশ করে বলেছেন :

"Moreover, the sensual element is not merely mask or veil. It is a steppingstone to a higher level, but a necessary steppingstone whose absence would make that higher level inaccessible!"[৫]

৫

প্লেটোনিক প্রেম সম্পর্কে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে চিন্তনীয়। আপাত-দৃষ্টিতে এ কথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে, প্লেটো তাঁর ডায়লগে দাম্পত্য-প্রেমের কথা তো বলেনই নি, এমন কি পুরুষে নারীতে যে মুক্তপ্রেম তার কথাও বলেন নি। পুরুষে পুরুষে যে অনুরাগ—কামশাস্ত্রের পরিভাষায় যার নাম সমকামুকত্ব—প্লেটো শুধু তার উর্ধ্বায়িত রূপের কথাই বলেছেন। এতদ্দেশীয় 'অলংকারকৌস্তভ'-প্রণেতা কবিকর্ণপূর যাকে বলেছেন মৈত্রীরতি, বাহ্যত প্লেটোর প্রেম তারই সগোত্র। কবিকর্ণপূর মৈত্রী বলতে বুঝেছেন পুরুষে পুরুষে অথবা নারীতে নারীতে চিত্তরঞ্জক হৃদয়ধর্ম। প্লেটোর পরিধি তার অর্ধেক অংশমাত্র জুড়ে আছে। তাঁর কল্পনা শুধু পুরুষে পুরুষে সম্পর্কের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ।

প্লেটোর এই কল্পনার হেতুনির্দেশ করতে হবে তৎকালীন গ্রীসের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে। প্লেটোর এথেনীয় সমাজে জায়া ও জননীরূপে নারী ছিল শুদ্ধান্তঃপুরের অবরোধেই বন্দিনী। সামাজিক জীবন ছিল একান্তভাবেই পুরুষের জীবন। তা ছাড়া, বর্তমান দৃষ্টিতে যতই নিন্দনীয় ও ন্যক্কারজনক

বলে বিবেচিত হোক না কেন, পুরুষে পুরুষে সমকামুকত্বই ছিল সে যুগের গ্রীসের যৌনজীবনের সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য। সুন্দরদেহধারী কিশোরই ছিল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের "প্রেমের পাত্র"। এই প্রেমকেই প্লেটো রিরংসাবৃত্তির প্ররোচনা থেকে উন্নমিত করে মহত্তর জীবনচর্যার প্রেরণারূপে বিশুদ্ধীভূত করেছেন।

এথেন্সের তৎকালীন জীবন ও সামাজিক অবস্থার বর্ণনা করে অধ্যাপক Friedlander বলেছেন—

"...this society, the most productive the world has ever seen, is completely filled with male love on every level and in all its manifestations, from the most passionate devotion to casual play, from loftiest adoration to crudest sensuality, rising to the heights of creative power, as it survives in Greek art, and reverberating in the halls of state..."৬

স্বভাবতই প্লেটোর প্রেমচেতনার ভিত্তি এই সমাজ-ভূমিতেই গড়ে উঠেছে। প্লেটোর দৃষ্টিতে পুরুষ ও নারীর দাম্পত্য-সম্পর্ক সন্তানজননের সামাজিক বিধানরূপেই পরিগৃহীত হয়েছে। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা।'—বিবাহিত জীবনের এই উদ্দেশ্যকেই তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু এ থেকে সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হবে যে, নারীদের সম্পর্কে প্লেটো উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না। 'রিপাব্লিক' ও অন্যান্য রচনায় দেখা যাবে যে, প্লেটো পুরুষ ও নারীর সমানাধিকারে বিশ্বাসী ও উৎসাহদাতা ছিলেন।

"Women, he still insists, should share in all the activities of men. They are to be members of the governing assembly and the administrative bodies; and in case of need they are to be soldiers too."৭

নারী সম্পর্কে এই যাঁর ধারণা ছিল তিনি নারী ও পুরুষের প্রেম সম্পর্কে একেবারেই চিন্তা করেন নি, এ কথা শুধু বিস্ময়করই নয়, অবিশ্বাস্য বলেও মনে হওয়াই স্বাভাবিক। এ সম্পর্কে 'ফিড্রাস' ও 'সিম্পোসিয়ামে'র দুটি ইঙ্গিতের প্রতি প্লেটো-গবেষকগণের দৃষ্টি আকর্ষণীয়। প্লেটো তাঁর আলোচ্য ডায়লগ দুটিতে সক্রেটিসের কণ্ঠেই তাঁর মূল বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। প্লেটোর ডায়লগে বর্ণিত এই সক্রেটিস-চরিত্র সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিকই প্লেটোর ডায়লগের সক্রেটিস। প্লেটো ছিলেন

সক্রেটিসের শিষ্য। যুবকদের বিপথগামী ও বিনষ্ট করার অপরাধে সক্রেটিসের বিচার হয়, এবং তাঁকে বিষপানে আত্মহত্যা করতে হয়। সক্রেটিসের বয়স তখন সত্তর বৎসর। প্লেটো সেই বিচারসভায় উপস্থিত ছিলেন বলেই মনে হয়। তাঁর 'অ্যাপলজি'তে তিনি গুরুকৃত্য পালন করেছেন। অনেকে মনে করেন এই অ্যাপলজি ও ফিডো-[Phaedo]-র সক্রেটিস এবং অন্যান্য ডায়লগের সক্রেটিস অভিন্ন পুরুষ। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় দলের প্লেটো-বিশেষজ্ঞগণ এ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন, এবং তাঁদের মতে প্লেটোর ডায়লগের সক্রেটিস একটি কাল্পনিক চরিত্র। কাল্পনিকই হোক আর ঐতিহাসিকই হোক, সক্রেটিসের মুখেই প্লেটো তাঁর প্রেমতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। 'ফিড্রাসে' সক্রেটিস প্রেমের শিক্ষা কোন্ সূত্রে কিভাবে পেলেন সে কথা ফিড্রাসকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে বলছেন :

"...like a pitcher I have been filled, through my ears, from some foreign source; but here again so stupid am I, that I have quite forgotten both how and where I gained my information."[৮]

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় হল এই যে, সক্রেটিস বলছেন যদিও তিনি সঠিক মনে করতে পারছেন না কিভাবে এবং কোন্ সূত্রে আদর্শ প্রেমের ধারণা পেয়েছেন, কিন্তু কোনও বহিরাগত সূত্র থেকেই যে তিনি তা পেয়েছেন, সেকথা তিনি অস্বীকার করেন নি। প্লেটোর প্রাচ্য-পরিক্রমা এবং প্লেটোর জীবনে প্রাচ্যপ্রভাব সম্পর্কে আজও সুনিশ্চিত কোনও মতবাদ গড়ে ওঠেনি। কিন্তু সক্রেটিস-স্বীকৃত এই 'বহিরাগত সূত্র' প্রাচ্য দিগন্তেরই কোনও দেশের ইঙ্গিত বহন করছে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সিম্পোসিয়ামে ইঙ্গিতটির ব্যঞ্জনা আরও গভীর। পূর্বেই বলা হয়েছে, কিশোরের প্রতি পুরুষের দৈহিক আকর্ষণ গ্রীসে সর্বজনীনভাবেই প্রচলিত ছিল। সামরিক স্পার্টা প্রভৃতি রাজ্যে তা ছিল আইনসিদ্ধ। এথেন্সে অবশ্য আইন এই অস্বাভাবিক প্রথাকে অনাচরণীয় বলেই অনুৎসাহিত করেছে। কিন্তু আইনের সমর্থন না থাকলেও সর্বত্রই লোকাচারের সমর্থন ছিল তার পক্ষে। প্লেটো তৎকালপ্রচলিত পুরুষের এই প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করতে পারেন নি। এই দুর্নিবার আকর্ষণের পশ্চাতে যে প্রবল শক্তি বা প্রেরণা ক্রিয়াশীল তিনি তাকে দেহবাসনার স্তর থেকে মানসিক ও আত্মিক স্তরে উন্নীত করে সৌন্দর্য

ও শ্রেয়োবোধের শুচিশীলনে নিয়োজিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছেন। বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে পুরুষের প্রতি পুরুষেরই আকর্ষণ। কিন্তু সিম্পোসিয়ামে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করবার বস্তু হল এই যে, প্লেটোর প্রেমধর্মের প্রবক্তা সক্রেটিস বলছেন, প্রেম সম্পর্কে তাঁর সমস্ত চিন্তা ও চেতনা তিনি লাভ করেছেন একজন নারীর কাছে। অর্থাৎ বিষয়টি পুরুষের প্রেম, কিন্তু তার মন্ত্রে দীক্ষা দিচ্ছেন এক অসামান্যা রমণী। সক্রেটিস অকুণ্ঠ ভাষাতেই স্বীকার করেছেন যে, প্রেমশাস্ত্রে তিনি দীক্ষা পেয়েছেন মন্তিনিয়ার যাজিকা ও ভবিষ্যদ্‌বক্ত্রী দিয়োতিমার কাছে। "...There is a speech about Love which I heard once from Diotima of Mantineia."[৯] দিয়োতিমার ভাষণকেই সক্রেটিস ভোজসভায় সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করেছেন। সক্রেটিস শুধু দিয়োতিমার ভাষণই যে একবার মাত্র শুনেছিলেন তা নয়, তিনি প্রেমের ব্যাপারে তাঁর কাছেই পাঠ নিয়েছিলেন, এ কথাও বলতে কুণ্ঠিত হন নি। "And she it was who taught me about love affairs."[১০] প্রেম সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্যে সক্রেটিস যে বহুবার দিয়োতিমার কাছে গিয়েছেন সেকথাও তিনি বলেছেন, "I, in admiration of your wisdom, have come to you as your pupil to find out these very matters."[১১] পুনশ্চ, "...Diotima, this is just why I have come to you, as I said; I knew I need a teacher."[১২] দিয়োতিমার বক্তব্য শেষ করেও সক্রেটিস বলছেন, "All this she taught me at different times." এ সব উদ্ধৃতির পরে আর সংশয়মাত্র থাকে না যে, সক্রেটিস [অর্থাৎ প্লেটো] নারীর কাছ থেকেই অর্জন করেছেন প্রেমশাস্ত্র ও প্রেমবিদ্যার পরাজ্ঞান। এক তপস্বিনী নারীই প্লেটোর প্রেমমন্ত্রের দীক্ষাদাত্রী গুর্বী।

যে-তত্ত্ব নারীর কাছেই পুরুষ পেয়েছে সে-তত্ত্বে নারীচেতনার কোন অস্তিত্ব নেই এ কল্পনা অবাস্তব। কাজেই প্লেটোর সমসাময়িককালে তাঁর প্রেমতত্ত্ব পুরুষের প্রতি পুরুষের আচরণীয় হৃদয়ধর্মের অনুশাসন বলে গৃহীত হলেও, পরবর্তীকালে যখন প্রেম স্ত্রীপুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্কের সুস্থ ও সুন্দর পরিণাম বলেই সমস্ত সভ্যসমাজে গৃহীত হয়েছে তখন প্লেটোব্যাখ্যাত সেই তত্ত্বই হয়েছে নরনারীর আদর্শ প্রেমের চর্যাচর্যবিনিশ্চয়কারী অনুশাসনের মূলমন্ত্র। তাই য়ুরোপীয় প্রেমধর্মের আদি-গঙ্গোত্রী হল প্লেটোর সিম্পোসিয়াম।

আমরা পূর্বে বলেছি, আপাতদৃষ্টিতে প্লেটোর প্রেম কবিকর্ণপূরের মৈত্রীরতিরই সহোদরা অনুভূতি। কিন্তু এ সাদৃশ্য বাহ্যসাদৃশ্যমাত্র। স্বরূপলক্ষণে প্লেটোর প্রেম তথা দিব্য-এরসতত্ত্ব কবিকর্ণপূরের প্রীতিরতিরই সহোদর-তত্ত্ব। উভয়তই অনুভূতি একান্তভাবেই মনোময়ী। উভয়ক্ষেত্রেই মানস-বাসনাকে অস্বীকার করা হয় নি, কিন্তু সর্ববিধ দেহসম্পর্ককে একান্তভাবেই বারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ আদিতে বা উৎসমূলে প্রীতিরতির মত প্লেটোনিক প্রেমও সবিকারা কিন্তু মনোবৃত্তিময়ী। উভয়তই অনুরাগের রূপ ও রঙ নিয়ত-উপচীয়মান এবং মানসিক ও আত্মিক স্তরে সৌন্দর্য ও শ্রেয়োবোধের দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে নব নব পর্যায়ে ঊর্ধ্বায়িত জীবনচর্যা ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির দিব্য প্রেরণা।

৬

এবার প্লেটোনিক প্রেমের মূল সূত্রগুলিকে বোঝবার চেষ্টা করা যেতে পারে। ফিড্রাস-শীর্ষক ডায়লগে প্লেটো বন্ধুত্ব ও প্রেমের পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই ডায়লগের শেষার্ধে সাহিত্যিক কলাবিধি সম্পর্কেও আলোচনা আছে। সেজন্যে ফিড্রাসে প্লেটোর মূল বক্তব্য সম্পর্কে সমালোচকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। মূল বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, যৌন-বাসনার সুগতি ও দুর্গতিও যে ফিড্রাসের বিষয়ীভূত হয়েছে সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। প্রেম কি, তার উদ্দেশ্য কি, তার ফল আমাদের জীবনে শুভংকর না অশুভংকর—এ সব প্রশ্ন সেখানে উত্থাপিত হয়েছে এবং প্লেটো সক্রেটিসের মুখ দিয়ে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন।

ফিড্রাসে সক্রেটিস বলছেন, প্রেম নিশ্চয়ই এক ধরনের বাসনা। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই দুটি নিয়ন্ত্রী শক্তি আছে। মানুষ এই দুটি শক্তির অনুশাসনেই পরিচালিত হয়। একটি হল সুখের জন্য সহজাত বাসনা, অপরটি হল শ্রেয়ঃ বা মঙ্গলের জন্য বাসনা—এই দ্বিতীয় বাসনাটি মানুষের সহজাত নয়, তাকে বিচারের দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়। মানুষের সহজাত আত্মরতি বা আত্মসুখের বাসনা যেখানে বলবৎ সেখানে প্রেমের পাত্র "ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য।" ',As wolves love lambs, so lovers love their loves.'

কিন্তু সত্যকার প্রেম হল একটি ঐশ্বরিক চেতনা। প্রেমের মধ্যে উন্মত্ততা আছে, কিন্তু সে উন্মত্ততা ক্ষেমংকর। সক্রেটিস বলেছেন, "**we owe our greatest blessings to madness, if only it be granted by Heaven's bounty.**"[১৩]

মহৎ কাব্যরচনা যেমন ঐশ্বরিক প্রেরণাসঞ্জাত উন্মাদনা, তেমনি মহৎ প্রেমও দিব্যোন্মাদনা। '...**such a madness as this is given by God to man for his highest possible happiness.**"[১৪]

প্লেটো বলেছেন, এই দিব্য প্রেরণা ছাড়া যেমন সত্যকার কাব্য রচিত হতে পারে না, তেমনি প্রেমের দিব্য প্রেরণা ছাড়াও মানুষ পৃথিবীতে সত্যকার মহৎ কোন ব্রতে ব্রতী হতে পারে না।

প্লেটো ফিড্রাসে দুটি রূপকের সাহায্যে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। প্রথম রূপকটি হল পক্ষবান আত্মার কল্পনা। এককালে প্রতি আত্মাই ছিল পক্ষবান। সেই পক্ষবান আত্মাগুলি স্বর্গের আশেপাশেই ঘুরে বেড়াত। অবশেষে একদিন তাদের পক্ষ ছিন্ন হল, তারা ওড়বার শক্তি হারিয়ে নেমে এল পৃথিবীর বুকে। এই পৃথিবীতে যখন আত্মা মর্ত্যসৌন্দর্যের সন্ধান পায় তখন তার স্মৃতিতে ঊর্ধ্বলোকের সৌন্দর্যের কথা মনে পড়ে। ধীরে ধীরে তার পাখা গজাতে থাকে। শুরু হয় তার নভোবিহার। "**by the sight of beauty in this lower world, the true beauty of the world above is so brought to his remembrance that he begins to recover his plumage, and feeling new wings, longs to soar aloft.**"[১৫]

আর একটি রূপকে প্লেটো আত্মাকে অশ্ববাহিত রথের সারথি রূপে কল্পনা করেছেন। সে রথে আছে দুটি পক্ষবান অশ্ব; একটি সদ্বংশজাত, অপরটি দুষ্কুলোদ্ভব। অর্থাৎ, একটি দিব্য-এরসের দ্বারা অনুপ্রাণিত, অপরটি জৈব-এরসের প্ররোচনায় সর্বদা অবাধ্য ও বিপথগামী। প্রেমচেতনার প্রথম পর্যায়ে এ দুটির মধ্যে দ্বন্দ্ব অনিবার্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সারথি যখন দুটি অশ্বকেই সুনিয়ন্ত্রিত করে রথ পরিচালনা করতে পারে তখনই সে অভীষ্ট লাভ করে। প্লেটো অবশ্য সারথি এবং অশ্বযুগলকে একই সত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, **as a single organism**-রূপেই কল্পনা করেছেন।

আত্মার অভীষ্ট লাভ বলতে প্লেটো কী ধারণা করেছেন সে কথা এ প্রসঙ্গে

অবশ্যই আলোচনার যোগ্য। মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হবার পর আত্মা দিব্য-সৌন্দর্যকে ভুলে যায়। সুন্দরের প্রতি প্রেমাবিষ্ট হলে তার মধ্যে সেই হারানো সৌন্দর্যানুভূতি পুনরুজ্জীবিত হতে পারে। যে দিব্যসৌন্দর্যের চেতনা একেবারেই বিস্মৃত হয়েছে তার মধ্যে দেহসঙ্গমের জন্যে জৈবচেতনাই উদগ্র হয়ে ওঠে, কিন্তু যার মধ্যে দিব্যসৌন্দর্যের রেশ এখনও রয়েছে মর্ত্য-লোকের সৌন্দর্য দেখে সে দৈববিস্ময় ও উপাসনার ভাবে উজ্জীবিত হয়। "In the soul which has all but lost the impression of heavenly beauty, the effect of its earthly adumbration is to provoke 'brutal' appetite for intercourse with the beautiful body. But in a soul fresh from deep contemplation of spiritual beauty, the sight of earthly beauty arouses religious owe and worship ;"[১৬]

৭

ফিড্রাসের বৈশিষ্ট্য হল এই দুটি রূপকের ব্যাখ্যান : স্বর্গচ্যুত আত্মার মর্ত্যলীলা, আর যুগল-অশ্ববাহিত রথের সারথিরূপে দেহধারী আত্মার আত্ম-সংগ্রাম ও আত্মজয়। প্রথম রূপকে আমরা দেখলাম, স্বর্গচ্যুত আত্মা মর্ত্যলোকে এসে সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ পেয়ে কি করে স্বর্গীয় সৌন্দর্যের কথা স্মরণ করে। এর মধ্যেই রয়েছে প্লেটোর বিখ্যাত 'স্মরণতত্ত্বে'র রহস্য। এই স্মরণতত্ত্ব শুধু প্রেম ও সৌন্দর্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, পরাজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তারই লীলা ক্রিয়াশীল। স্বভাবতই পরাজ্ঞান সম্পর্কে প্লেটোর দার্শনিক ব্যাখ্যার কথাও এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে। 'রিপাব্লিকে' গুহা-রূপকের সাহায্যে প্লেটো এই বিষয় বিশদীভূত করেছেন।

ফিড্রাসের দ্বিতীয় রূপক যুগল-অশ্ববাহিত রথের সারথির সাহায্যে প্লেটো আত্মা ও শরীরধর্মের সংগ্রামের কথাই বলেছেন। সারথিকে বলা যেতে পারে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা। যুগল অশ্বের মধ্যে যে সদ্বংশজাত সে "loves honour and temperance and modesty, and a votary of genuine glory, he is driven without strike of the whip by voice and reason alone." নীচকুলোদ্ভব অশ্বটি প্রেমের পাত্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। তাকে প্রগ্রহে শান্ত ও সংযত করবার জন্যে সারথিকে বহু সংগ্রাম করতে হয়। অবশেষে সে

বশীভূত হয় এবং অনুগত ভাবে শাসন মেনে প্রথম অশ্বের একযোগে পথ চলে। এই সুকঠিন সংগ্রামে উত্তীর্ণ হলে পরে প্রেমের সত্যকার লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। বলাই বাহুল্য, তার লক্ষ্য হল প্রিয়জনের আত্মাকে উচ্চতর জীবনচর্যায় উন্নীত করা।

প্রেম সম্পর্কে প্লেটোর তৃতীয় এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রূপক হল প্রেমের জন্ম ও প্রেমের ধর্ম-সম্পর্কিত উপাখ্যান। তারই নাম প্লেটোর এরস-তত্ত্ব। সিম্পোসিয়ামের মূল বিষয় হল এই এরস-তত্ত্বের ব্যাখ্যা। ট্রাজিক কবি আগাথনের নাট্যসাফল্যের অভিনন্দনে একটি ভোজসভা আহূত হয়। এই সভার অতিথিবৃন্দের মধ্যে ছিলেন সক্রেটিস, সভাপতি হিসাবে বৃত হন প্লেটোর বন্ধু ফিড্রাস,আর ছিলেন পোসানিয়াস, কমিক কবি এরিস্টোফেনিস, রাষ্ট্রনীতিবিদ এলসিবিয়াডিস প্রমুখ গুণিজন। এই ভোজসভার বর্ণনা করেন এরিস্টোডেমস, তাঁর মুখে শুনে এপলোডোরাস যে ভাবে পুনর্বর্ণনা করেছেন তারই সাহিত্যরূপ হল সিম্পোসিয়াম। ভোজসভার আলোচ্য বিষয় ছিল প্রেম।

বক্তারা প্রেমের স্বরূপ ও মানবজীবনের উপর তার বিচিত্র প্রভাবের কথা নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথম বক্তা ছিলেন ফিড্রাস এবং সর্বশেষ বক্তা সক্রেটিস। মধ্যবর্তী বক্তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল কমিক-কবি এরিস্টোফেনিসের দোসর-তত্ত্ব। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই এরিস্টোফেনিসই তাঁর **Ecclesiazusae** নাটকে তাঁর স্বভাবসুলভ লঘু-পরিহাসের মধ্য দিয়ে মুক্তপ্রেমের আদর্শ প্রচার করেছিলেন:

All women and men will be common and free,
No marriage or other restraint there will be.

সিম্পোসিয়ামে এরিস্টোফেনিস এক অদ্ভুত তত্ত্ব প্রচার করলেন। তিনি তাঁর হাস্যোদ্দীপক ভঙ্গিতে বললেন, আদিযুগে মানুষ ছিল পূর্ণবৃত্ত জীব: চার হাত, চার পা, দুই মুখ ও এক মাথা। তাদের 'লিঙ্গ' ছিল তিনটি: যুগল-পুরুষ, যুগল-নারী ও যুগল-নারীপুরুষ। তারা ছিল অসামান্য শক্তির অধিকারী। স্বভাবতই স্বর্গে গিয়ে তারা দৌরাত্ম্য করত। তারই ফলে জিউস প্রত্যেক মানুষকে উপর থেকে নীচে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত কেটে কেটে দু টুকরো করে দিলেন। সেই থেকে মানুষ তার আদি সত্তার অর্ধাংশ মাত্র। তারা পরস্পর পরস্পরের অর্ধকে খুঁজে বেড়ায়। এরিস্টোফেনিসের

মতে নিজ সত্তার এই অর্ধাংশের অন্বেষণ এবং তার সঙ্গে পুনর্মিলনের নামই প্রেম :

"Since then man is only half a complete creature, and each half goes about with a passionate longing to find its complement and coalesce with it again. This longing for reunion with the lost half of one's original self is what we call "love", and until it is satisfied, none of us can attain happiness. Ordinary wedded love between man and woman is the reunion of the two halves of one of the originally double-sexed creatures; passionate attachment between two persons of the same sex is the reunion of the halves of a double-male or a double-female, as the case may be."[১৭]

মানুষের এই আদিম যুগ্মসত্তার কল্পনা হাস্যোদ্দীপক সন্দেহ নেই। কিন্তু এর মধ্যে একটি নিগূঢ় সত্য নিহিত আছে। এই মর্ত্যলোকের প্রেমিক তার প্রাণের দোসর তার 'মনের মানুষ'কে খুঁজে বেড়ায়। সেই মনের মানুষকেই সে ভালবাসে। তারই নাম প্রেম। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কৈশোর রচনা "যথার্থ দোসর" প্রবন্ধ ['ভারতী', জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮] এবং 'পূরবী'র "দোসর" কবিতাটি অবশ্যই স্মরণীয়। "যথার্থ দোসর" প্রবন্ধটির আলোচনা প্রথম খণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৮

সিম্পোসিয়মের এরস-তত্ত্বের মুখ্য প্রবক্তা হলেন সক্রেটিস। তাঁর পূর্বে তরুণ কবি আগাথন বললেন, এরস হচ্ছেন দেবসমাজে সবচেয়ে সুন্দর পুরুষ, তিনি বয়সে সর্বকনিষ্ঠ ও সর্বগুণসম্পন্ন। [স্মরণীয় : রবীন্দ্রনাথের উক্তি 'সৃষ্টির শেষ রহস্য,—ভালোবাসার অমৃত।'] সক্রেটিস তাঁর স্বভাবসুলভ বাগ্মিতার চিরন্তন পদ্ধতি অনুযায়ী আগাথনের বক্তব্যকেই 'পূর্বপক্ষ' রূপে গ্রহণ করে বললেন, এরস দেবতা নন, তিনি মানুষ ও দেবতার মধ্যবর্তী এক সত্তা, গ্রীক ভাষায় তাঁর নাম "daimon". [স্মরণীয় : রবীন্দ্রনাথ এই 'ডেমন'-এরই বাংলা প্রতিশব্দ করেছিলেন "জীবনদেবতা"]। সক্রেটিস বলছেন, তিনি দিয়োতিমার কাছে যে প্রেমতত্ত্ব শিখেছেন দিয়োতিমার ভাষাতেই তা ব্যক্ত করবেন।

দিয়োতিমার বক্তব্য হল, এরস শিবও নন্ সুন্দরও নন্। এই দুটো ধর্মেরই তাঁর অভাব, সেই জন্যেই এরস শিব-সুন্দরের চিরপ্রত্যাশী। এই যুক্তি অনুসারেই দিয়োতিমা বলছেন, এরস দেবতা নন, কেন না দেবতারা সবাই শিব-সুন্দর। এরস যদি দেবতা না হন, তা হলে তাঁর ধর্ম ও শক্তি কি? মানুষ ও দেবতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনই তাঁর ধর্ম। **"To interpret and to ferry across to the gods things given by men, and to men things from the gods; from men petitions and sacrifices, from the gods commands and requitals in return; and being in the middle it completes them and binds all together into a whole."**[১৮]

এরসের জন্ম সম্পর্কে দিয়োতিমার কাহিনীটি বর্ণনা করে সক্রেটিস বললেন: আফ্রোদিতির জন্ম হলে দেবতারা একটি ভোজের ব্যবস্থা করলেন। সেখানে মেতিসের পুত্র 'পোরোস'-[প্রাচুর্য]-কেও আমন্ত্রণ করা হল। ভোজশেষে পেনিয়া [দারিদ্র্য] এল সেখানে ভিক্ষা চাইতে। পোরোস ভোজনান্তে প্রচুর সুধা পান করে প্রমত্ত হয়ে জিউসের নন্দনকাননে গেল শয়ন করতে। সুধাই সে পান করল, কেন না তখনও সুরার সৃষ্টি হয়নি। অভাবের তাড়নায় পেনিয়া চাইল পোরোসের সঙ্গ। তাই নন্দনকাননে সে গিয়ে পোরোসের পাশে শয্যা গ্রহণ করল। পোরোস ও পেনিয়ার সঙ্গমে যে সন্তানের জন্ম হল তারই নাম এরস বা প্রেম। যেহেতু পিতা ও মাতা পোরোস ও পেনিয়া, সেইজন্যে তার মধ্যে পিতামাতা উভয়েরই ধর্ম বর্তমান। মায়ের স্বভাবে সে দরিদ্র, গৃহহারা ও আশ্রয়হীন; অভাবই তার চিরসহচর। পিতার স্বভাবে সে শিবসুন্দরের উপাসক, নির্ভীক, দুর্দম ও অমিতবলশালী। সে দার্শনিক, ঐন্দ্রজালিক ও শিক্ষক। মানুষের জীবনে এই এরস বা প্রেমের দান কি? সুন্দরের প্রতি ভালবাসা। সুন্দরের প্রতি ভালবাসার অর্থ কি? অন্য দিক থেকে, যে সুন্দরকে ভালবাসে সে কি চায়? উত্তর, সে পেতে চায় সুন্দরকে। দিয়োতিমা বললেন, সুন্দরের বদলে শিব [বা শুভ কিংবা শ্রী] কথাটি প্রয়োগ করলে কি দাঁড়ায়? যে শিবকে ভালবাসে সে কি চায়? সে চায় সুখ। এই সুখলাভের উপায় কি? যা শিব যা সুন্দর তাকে সৃষ্টি করার বাসনা থেকেই সুখলাভ হয়। **"It is a breeding in the beautiful both of body and soul."**[১৯]

দিয়োতিমা পুনশ্চ বললেন, "love is not for the beautiful.···It is for begetting and birth in the beautiful···begetting is, for the mortal, something everlasting and immortal. But one must desire immortality along with the good, according to what has been agreed, if love is love of having the good for oneself always. It is necessary then from this argument that love is for immortality also."[২০]

অর্থাৎ সুন্দর দেহে এবং সুন্দর আত্মায় সন্তান-জননের মধ্য দিয়ে অমরত্ব প্রাপ্তি এবং তজ্জনিত সুখলাভই মানব-জীবনে এরসের দান। প্রথম পর্যায়ে, অর্থাৎ দেহমিলনে সন্তানজননের ফল বংশানুক্রম। দ্বিতীয় পর্যায়ের ফল কাব্য ও অন্যান্য সৃষ্টিধর্মী শিল্প; এবং বিচিত্র মানবধর্মী জীবনচর্যা; জ্ঞান কর্ম ও ধর্মের সুন্দর ও ক্ষেমংকর অনুশীলন।

সক্রেটিসকে দিয়োতিমা বললেন, এই হল প্রেমের বিচিত্র রহস্যের কয়েকটি দিক। সুপথে পরিচালিত হলে এই রহস্যজাল ভেদ করে জীবনের একটি পরম তত্ত্বে প্রেমিক উপনীত হয়। আর তাই হল আত্মিক প্রেমের চূড়ান্ত পরিণাম। বিচিত্র থেকে পরম একে, সীমা থেকে অসীমের চেতনায় এই প্রেম-পরিক্রমার কয়েকটি সুস্পষ্ট স্তর পরিলক্ষিত হবে। প্রথমে একটি সুন্দর দেহকে ভালবাসা। তারপরে এই বিশ্বাস যে, প্রতিটি সুন্দর দেহের মধ্যে একই চিরসুন্দর প্রকাশিত। এই অনুভূতির ফল সুন্দর দেহমাত্রকেই ভালবাসা। তার পরের স্তরে এই বিশ্বাস যে, দেহের সৌন্দর্য থেকে আত্মার সৌন্দর্যের উৎকর্ষ অনেক বেশি। এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মিক সৌন্দর্যের অনুশীলন এবং তজ্জনিত জ্ঞানই পরবর্তী স্তর। এই ভাবে নিঃসীম সৌন্দর্য-সমুদ্রের সন্ধান এবং সর্বশেষ স্তরে পরম-সুন্দর ও পরম-শিবের চেতনায় এক এবং অদ্বিতীয় সত্যের পরা-জ্ঞানই প্রেমচর্যার শেষ কথা। "···beginning from these beautiful things, to mount for that beauty's sake ever upwards, as by a flight of steps from one to two, and from two to all beautiful bodies, and from beautiful bodies to beautiful pursuits and practices, and from practices to beautiful learnings, so that from learnings he may come at last to that perfect learning, which is the learning solely of that beauty itself, and may know at last that which is the perfection of beauty".[২১]

এই আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, প্লেটোনিক প্রেমচর্যা উন্নততর জীবনচর্যারই নামান্তর। তার রয়েছে বিচিত্র সোপান-পরম্পরা। কিন্তু এর সর্বশেষ স্তরে অসীমের কোটিতে পৌঁছে প্রেমের দৃষ্টিতে চিরসুন্দরের অনুধ্যানই প্লেটোনিক প্রেমধর্মের পরমতত্ত্ব। বলাই বাহুল্য, এই প্রেমতত্ত্ব, যার অন্য নাম এরসতত্ত্ব, তা দার্শনিক প্লেটোর জীবনতত্ত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত। প্লেটোর ইউটোপিয়া—তাঁর ভূস্বর্গ 'রিপাব্লিক'—এই এরস বা দিব্যপ্রেমেরই প্রেরণাসঞ্জাত মহত্তম কবিস্বপ্ন।

৯

প্লেটোর এরস্-তত্ত্বই বিংশ শতাব্দীতে ফ্রয়েডের 'লিবিডো'-তত্ত্ব রূপে দেখা দিয়েছে। ফ্রয়েড-প্রবর্তিত মনঃসমীক্ষণ-বিদ্যা [Psycho-analysis] এযুগের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারের অন্যতম বলে পরিগণিত হয়। তাঁকে ডারুইন, স্পিনোজা, নিউটন ও আইনস্টাইনের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। অধ্যাপক ডক্টর সুহৃৎচন্দ্র মিত্র বলেছেন, 'বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁহার এই নির্জ্ঞানের আবিষ্কার কোপার্নিকাসের এবং ডারুউইনের আবিষ্কারের সহিত তুলনীয়।'[২২] হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন-অধ্যাপক ডক্টর জেমস জে. পুট্‌নম্ বলেছেন :

"Freud has made considerable addition to this stock of knowledge, but he has done also something of greater consequence than this. He has worked out, with incredible penetration, the part which the instinct plays in every phase of human life and in the development of human character,"[২৩]

ডক্টর সিগ্‌মুণ্ড্ ফ্রয়েড [১৮৫৬-১৯৩৯] প্রবর্তিত মনঃসমীক্ষণ এবং নির্জ্ঞান-বাদের প্রথম প্রকাশ মানুষের মানসলোক সম্পর্কে এত বিপ্লবী পদক্ষেপ বলে মনে হয়েছিল যে, মানুষের রক্ষণশীল চেতনা তাকে সাদরে বরণ করে তো নেয়ই নি, উপরন্তু তার সম্পর্কে প্রভূত বিরূপতাই ভাববাদী শিবিরে দেখা দিয়েছিল। মানবজীবনে ফ্রয়েড-ব্যাখ্যাত লিবিডো [Libido] বা কামশক্তির প্রভাব যেভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে তার মধ্যে অত্যুক্তির লক্ষণ তাঁর সহকর্মিবৃন্দের চোখেও ধরা পড়েছে। তারই ফলে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ

পরিবর্তিত হয়ে য়ুংয়ের বৈশ্লেষিক মনোবিদ্যা [Analytical Psychology] এবং অ্যাড্লরের প্রাতিস্বিক মনোবিদ্যার [Individual Psychology] স্বরূপ পরিগ্রহ করেছে। তবে এঁদের মধ্যে পারস্পরিক মতপার্থক্য যাই থাক না কেন, প্রতিপক্ষীয় সমালোচকের দৃষ্টিতে এঁরা মানুষের মধ্যে আদিম পশু বা শয়তানকেই আবিষ্কার করেছেন বলে ধিকৃত হয়েছেন। সি. ই. এম. জোড তাঁর 'গাইড টু মডার্ন থট্' গ্রন্থে বলেছেন :

"Where Freud has revealed the beast in man, Adler claims to have exposed the devil, and the devil is simply this dominating urge to power and self-assertion."[২৪]

ফ্রয়েড এবং তাঁর সহকর্মী ও শিষ্যসম্প্রদায় সম্পর্কে এ জাতীয় মনোভাব বিজ্ঞানসম্মত নয়। ফ্রয়েড কখনও মানুষের মধ্যে পশুকে আবিষ্কার করার হীন প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হন নি। তিনি মানসিক ব্যাধির কবল থেকে মানুষকে মুক্ত করার মহৎ ব্রতেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সেই ব্রত উদ্যাপন করতে গিয়ে বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ফলেই তিনি মানবমনের নির্জ্ঞান স্তরের সন্ধান লাভ করেন। তাঁর মনঃসমীক্ষণ প্রারম্ভে এবং প্রাথমিক স্তরে মানসিক ব্যাধিতে পর্যুদস্ত মানুষের রোগমুক্তির উপায় রূপেই দেখা দিয়েছিল। এদিক দিয়ে ফ্রয়েড এযুগের ভিষগ্‌রত্ন বা ধন্বন্তরি। নিন্দা নয়, প্রশংসা ; পরিবাদ নয়, সাধুবাদই তাঁর প্রাপ্য।

১০

মূলত ফ্রয়েডের অনুসরণে মনঃসমীক্ষণ-বিদ্যার মূল-সূত্রগুলির সঙ্গে পরিচয় লাভের চেষ্টা অফলপ্রসূ হবে না। মনঃসমীক্ষকগণের সব মতবাদেই এ কথা স্বীকার্য যে, মানুষের মনের বেশির ভাগ অংশই অজ্ঞেয়। যেটুকু আমাদের জানার জগতে রয়েছে তা মনের অতিশয় সামান্য অংশমাত্র। এদিক দিয়ে মানুষের মনকে জলে-ভাসমান একটি বরফের পাহাড়ের সঙ্গে [Iceberg] তুলনা করা যেতে পারে। বরফের পাহাড়ের যেমন অতি সামান্য অংশই জলের উপরে এবং বেশির ভাগই জলের নীচে থাকে, তেমনি মনের অতি সামান্য অংশ সম্বন্ধেই আমরা সচেতন থাকি, অধিকাংশই আমাদের অজ্ঞাত থেকে যায়। যে অংশ সম্বন্ধে আমরা সচেতন থাকি মনঃসমীক্ষণে তার নাম দেওয়া হয়েছে

সংজ্ঞান মন। যে অংশ আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত নয় তার নাম নির্জ্ঞান মন। সংজ্ঞান এবং নির্জ্ঞানের মধ্যবর্তী আর একটি স্তর কল্পনা করা হয়েছে, তার নাম আসংজ্ঞান। যা ঠিক এই মুহূর্তে আমার সংজ্ঞান স্তরে নেই, অথচ একটু চেষ্টা করলেই তাকে সংজ্ঞানে আনতে পারি তারই নাম আসংজ্ঞান।

সংজ্ঞান মনের তুলনায় নির্জ্ঞান মন বা নির্জ্ঞান শুধু যে আয়তনেই বৃহৎ তা নয়, তা সমধিক গুরুত্বপূর্ণও বটে। কেন না আমাদের সংজ্ঞানে যা পাচ্ছি তা নির্জ্ঞানেই উদ্ভূত এবং নির্জ্ঞানের পথ দিয়েই সংজ্ঞানে উপস্থিত হয়ে থকে। কাজেই সংজ্ঞানে যা পাওয়া যাচ্ছে তার মূল্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়, কেন না তার উপকরণ এবং তার ব্যবহার আমাদের নির্জ্ঞানস্থিত শক্তিরই প্রকাশমাত্র। অথচ সেই নির্জ্ঞান স্তরের শক্তিসমূহের সন্ধান পাওয়া মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। আমাদের মনের নির্জ্ঞান স্তরে লুক্কায়িত শক্তি বা বৃত্তিসমূহের আবিষ্কার ও অনুসন্ধানই মনঃসমীক্ষণের মুখ্যকৃত্য। "To discover and explore these hidden trends of the unconscious is the main object of Psycho-analysis,"[২৫]

মানুষের মনের এই তিন স্তরের মত মানুষের ব্যক্তিত্বেরও তিনটি মুখ্য স্তরের কল্পনা করা হয়েছে: ইদং বা অদস্‌, অহং এবং অধিশাস্তা। প্রত্যেক মানব-শিশুই কতকগুলি প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে ইংরেজিতে বলা হয় instinct. এই ইন্‌স্টিংক্ট বা প্রবৃত্তিগুলিই শিশুমনের একমাত্র সম্বল এবং মানসিক জীবনের আদি উপকরণ। এদের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানতে পারি না, কিন্তু কাজের ভিতর দিয়ে এদের শক্তির বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়, এবং তার দ্বারা এদের যথেষ্ট পরিচয়ও পাওয়া যায়। প্রথম অবস্থায় সমস্ত মনটির ওপর প্রভাব বিস্তার করে এরা সম্পূর্ণভাবে মনটিকে অধিকার করে থাকে। মনের এই আদি অবস্থার নাম ফ্রয়েড দিয়েছেন Id. ইদ্‌ ল্যাটিন কথা, তার ইংরেজি প্রতিশব্দ It। এই 'ইদে'র বাংলা করা যেতে পারে ইদং বা অদস্‌। অধ্যাপক ডক্টর সুহৃৎচন্দ্র মিত্র বলেছেন, অদস্‌ বলতে আমরা বুঝব, মনের সেই প্রাচীনতম অবস্থা যখন অজ্ঞাতস্বরূপ সহজাত প্রবৃত্তি ছাড়া মনে আর কিছু নেই। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রবৃত্তিগুলি সমস্ত মানসিক বৃত্তির উপর আধিপত্য বজায় রেখে সর্বতোভাবে এদের নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা করে থাকে। জীবনে ইদং বা অদসের প্রভাব

তাই সর্বাপেক্ষা অধিক।[২৬] ইদং-এর স্বরূপ বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক ব্রিল বলেছেন :

"According to Freud's formulation the child brings into the world an unorganized chaotic mentality called the Id, the sole aim of which is the gratification of all needs, the alleviation of hunger, self-preservation, and love, the preservation of the species"[২৭]

শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ইদং-এর যে-অংশ ইন্দ্রিয়গ্রামের মাধ্যমে পরিবেশের সংস্পর্শে আসে এবং বহির্জগতের নির্মম বাস্তবতার সঙ্গে পরিচিত হয় তাকে ফ্রয়েড বলেছেন Ego বা অহং। এই অহং পরিবেশ-সচেতন হয়ে ইদং-এর নীতিবিগর্হিত প্রবৃত্তিগুলির প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে, এবং তারই ফলে মানুষের অদিম সত্তা এবং নৈতিক সত্তার মধ্যে দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়। ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় তারই অর্থ ইদং এবং অহং-এর দ্বন্দ্ব।

এই দ্বন্দ্বের মত মনের উচ্চতর স্তরে আরেকটি দ্বন্দ্ব বিরাজমান—তা হল অহং-এর সঙ্গে অধিশাস্তার দ্বন্দ্ব। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শিশু নিজেই নিজেকে শাসন করার ভার গ্রহণ করে। অহং-এর যে অংশ এই শাসনের ভার গ্রহণ করে ফ্রয়েড তারই নাম দিয়েছেন Super-ego বা অধিশাস্তা। আমাদের চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের গুরু হল এই অধিশাস্তা। এই স্তরই হল মানস-বিবর্তনের চূড়ান্ত স্তর। অধ্যাপক ব্রিল বলেছেন :

"In a psychosis,···the illness results from a conflict between the ego and the outer world, and in the narcistic neurosis from a conflict between the ego and the super-ego,·· the super-ego re-presents a modified part of the ego, formed through experiences absorbed from the parents, especially from the father. The super-ego is the highest mental evolution attainable by man, and consists of a precipitate of all prohibitions and inhibitions, all the rules of conduct which are impressed on the child by his parents and by parental substitutes. The feeling of conscience depends altogether on the development of the super-ego."[২৮]

মনঃসমীক্ষকগণের মতে ইদং, অহং এবং অধিশাস্তা—মনের এই তিন স্তরের মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তিসম্পন্ন আদিম মন অর্থাৎ ইদং-ই সবচেয়ে বলশালী।

সহজাত প্রবৃত্তি-নিচয়ের মধ্যে ক্ষুৎপিপাসা এবং রিরংসা—এই দুটিই প্রধান। ভারতীয় দৃষ্টিতে তারই নামান্তর হল শিশ্নোদর-পরায়ণতা। কিন্তু ইদং-এর আদিম প্রবৃত্তিগুলিকে শুধু শিশ্নোদরপরায়ণ বলা সমীচীন নয়। ফ্রয়েড এই আদিম প্রবৃত্তিনিচয়কে মূলত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন: বন্ধনস্থাপনের প্রবৃত্তি, আর বন্ধনছেদনের প্রবৃত্তি। তাঁর পরিভাষায় বন্ধনস্থাপনের প্রবৃত্তির নামই 'এরস'। এবং এই এরস-এর শক্তিকেই তিনি বলেছেন Libido বা কামশক্তি। অধ্যাপক ব্রিলের ভাষায়:

"In psycho-analysis libido signifies that quantitatively changeable and nct at present measurable energy of the sexual instinct which is usually directed to an outside object. It comprises all those impulses which deal with love in the broad sense. Its main component is sexual love; and sexual union is its aim; but it also includes self-love, love for parents and children, friendship, attachments to concrete objects, and even devotion to abstract ideas."[২৯]

এই লিবিডো বা কামশক্তির লীলা মানবমনে আশৈশব ক্রিয়াশীল। ফ্রয়েড বলেন, শিশুর মনে স্বভাবী ও অস্বভাবী (normal and abnormal) সকল প্রকার কামভাবের অঙ্কুর আছে, এবং শিশু তদনুরূপ কামচেষ্টাও করে থাকে। ফ্রয়েডের এই সিদ্ধান্ত কাল্পনিক নয়, তা বহু পর্যবেক্ষিত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই কামভাবের উৎপত্তি, কিন্তু সাধারণত পরিবারের যে পরিবেশের মধ্যে সে লালিত হয় যৌনবিকাশের পক্ষে তা প্রতিকূল। যখনই শিশু কোন কামচেষ্টার উপক্রম করে তখনই সে তার পিতামাতা বা পরিবারের অন্য কারো নিকট থেকে বাধা পায়। শিশুকে নানা নিষেধের বশেই চলতে হয়। শিশু যেমন বড় হতে থাকে, শিক্ষাদীক্ষা এবং পারিবারিক ও সামাজিক শাসনে তার মনে ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, কর্তব্য-অকর্তব্য ইত্যাদি নানা বিবেকবুদ্ধি জাগরিত হয়, এবং তখন সে বাইরের বাধা-নিষেধের অপেক্ষা না রেখেই নিজের অসামাজিক যৌন ভাবগুলিকে নিজেই নিগৃহীত করার চেষ্টা করে। ফলে এই সব যৌনভাব ক্রমে মনের অজ্ঞাত প্রদেশে বা নির্জ্ঞানে চলে যায়। সহজাত প্রবৃত্তিগুলির চরিতার্থতার পথে বাধা এলে মনে অশান্তি উৎপন্ন হয়, কিন্তু তারা অজ্ঞাত মনে বা নির্জ্ঞানে নির্বাসিত হলে অতৃপ্ত কামনার তাড়না ভোগ করতে হয় না। অসামাজিক

ইচ্ছার অজ্ঞাত মনে বা নির্জ্ঞানে নির্বাসনের নাম repression বা অবদমন। মনঃসমীক্ষকগণ দেখেছেন যে, মুখ্যত কামপ্রবৃত্তিই অবদমিত হয়। বিখ্যাত বাঙালী মনঃসমীক্ষণবিৎ ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসুর মতে, যে সব কর্মে ব্যতিহার-প্রত্যাশা আছে, কেবল তৎসংক্রান্ত ইচ্ছাই অবদমিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে কর্মে কর্তৃস্থানীয় এবং পাত্রস্থানীয় উভয় ইচ্ছার সাক্ষাৎ পরিতৃপ্তির সম্ভাবনা আছে, কেবল সেই ক্ষেত্রেই অবদমন ও তৎফলে ইচ্ছার নির্জ্ঞানে নির্বাসন সম্ভব।[৩০]

দুর্ভাগ্যবশত অবদমিত ইচ্ছা বহুকাল রুদ্ধ থাকলেও ধ্বংস হয় না। জেলখানার দুর্দান্ত কয়েদীর মত সুযোগ পেলেই বাইরে এসে নিজের অভীষ্ট সাধনের চেষ্টা করে। যে মানসিক ভাবসমষ্টি বা যে মানসিক শক্তি অসামাজিক কামজ ইচ্ছাকে অবদমিত করে এবং নির্জ্ঞানে আবদ্ধ করে রাখে তাকে বলা হয়েছে censor বা মনের প্রহরী। আমাদের মনের প্রহরী সব সময় সমান সজাগ থাকে না। নিদ্রাবস্থায়, মানসিক অবসাদ বা উত্তেজনার সময় এবং কোন কোন মানসিক রোগে প্রহরী অসতর্ক হতে পারে। এই সুযোগে অবদমিত রুদ্ধ ইচ্ছা স্বপ্নে, নানাপ্রকার ভুলভ্রান্তির সহায়তায় ও আবেগজ ক্রিয়ায় পরিতৃপ্তি লাভের চেষ্টা করে। ফ্রয়েডের মতে আমাদের নির্জ্ঞান মনে নির্বাসিত বাসনা স্বপ্নের মাধ্যমেই চরিতার্থ হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, স্বপ্নই নির্জ্ঞান-লোকে পৌঁছবার রাজপথ। "The dream is the royal road to the unconscious."

অবদমিত ইচ্ছা যখন রোগ সৃষ্টি না করে প্রতীকের সাহায্যে বা অপর কোন ভাবে সামাজিক রীতিনীতির আবেষ্টনে গৌণ রূপে প্রকাশ পায় তখন তাকে বলা হয় sublimation বা উদ্‌গতি। এই উদ্‌গতি আমাদের চেষ্টাসাধ্য নয়। কেনই বা এক ক্ষেত্রে অবদমিত ইচ্ছা থেকে রোগ উৎপন্ন হয় এবং কেনই বা অপর ক্ষেত্রে অবদমিত ইচ্ছা শিল্পকলা ও সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা আনে তা আজও মানুষের জ্ঞানের গোচরীভূত হয় নি।[৩১]

"Sublimation is a process of deflecting libido or sexual-motive activity from human objects to new objects of a non-sexual, socially valuable nature.

"Sublimation, too, gives justification for broadening the concept of sex; for investigation of cases of the type

mentioned conclusively show that most of our so-called feelings of tenderness and affection, which colour so many of our activities and relations in life, originally form part of pure sexuality, and are later inhibited and deflected to higher aims."৩২

১১

অবদমিত প্রবৃত্তির নির্জ্ঞান থেকে শিবসুন্দর রূপ নিয়ে সংজ্ঞান মনে পুনরাগমনের নামই 'সাব্‌লিমেশন' বা উদ্‌গতি কিংবা উদ্‌গমন। আর মনঃসমীক্ষকগণের মতে আমাদের কামপ্রবৃত্তিই মুখ্যত অবদমিত হয়ে থাকে। কাজেই অবদমিত কাম-ইচ্ছা ও কাম-জীবন—এক কথায় ফ্রয়েডের লিবিডো বা কামশক্তির লীলা সম্পর্কে আর-একটু বিশ্লেষণ অত্যাবশ্যক। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, ফ্রয়েডের লিবিডো-তত্ত্ব প্রচলিত যৌনতত্ত্বের সমার্থক নয়। লিবিডো বা কামশক্তির কল্পনায় যৌনবৃত্তির অনেক অর্থব্যাপ্তি ঘটেছে। অধ্যাপক ব্রিল্ বলেছেন:

"...by broadening the term sex into love or libido, much is gained for the understanding of the sexual activity of the normal person, of the child, and of the pervert...the libido concept loosens sexuality from its close connection with the genitals and establishes it as a more comprehensive physical function, which strives for pleasure in general, and only secondarily enters into the service of propagation. It also adds to the sexual sphere those affectionate and friendly feelings to which we ordinarily apply the term love."৩৩

বলা বাহুল্য, শুধু ফ্রয়েড বা আধুনিক মনঃসমীক্ষকগণের মতেই শুধু নয়, প্রাচীনগণের মতেও কামশক্তিই মানুষের মনোলোকের প্রবলতম শক্তি। মনু যখন বলেন, 'বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি' তখন তিনি মুখ্যত কামশক্তির প্রতিই ইঙ্গিত করে থাকেন। এই বলবান কামশক্তিকে জীবনীশক্তির ভিত্তিমূলে স্থাপন করে ফ্রয়েড ভুল করেন নি। বরং তার অর্থব্যাপ্তি ঘটিয়ে শাশ্বত সত্যকেই নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। ফ্রয়েড বলেন,

কাম-বৃত্তির বিশ্লেষণ করলে তার তিনটি অঙ্গ দেখা যায় : (১) কামানুভূতি (sexual feeling), (২) কাম-চেষ্টা (sexual aim) ও (৩) কামপাত্র (sexual object)। সুস্থ ও স্বাভাবিক মানসে স্ত্রীপুরুষের পরস্পর যে অনুরাগ ও পরস্পরের সঙ্গলাভের যে সুখ তাই কাম-ভাব বা কামানুভূতি। পরস্পরের আলিঙ্গন সহবাসাদির যে চেষ্টা অর্থাৎ যে কায়িক বা মানসিক ব্যাপারকে উদ্দেশ্য করে কামভাব বিকশিত হয় সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়াসই কাম-চেষ্টা। পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোক, এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষই স্বাভাবিক কামপাত্র। ফ্রয়েড বলেন, কামবৃত্তির তিনটি অঙ্গের প্রত্যেকটির বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন রূপে হতে পারে। রতিসুখ থেকে আরম্ভ করে স্ত্রীপুরুষের পরস্পর কথোপকথনের আনন্দ পর্যন্ত সব রকম অবস্থাতেই কাম-ভাব ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়। স্ত্রীপুরুষের কথোপকথনের যে আনন্দ তা রতিসুখ থেকে ভিন্ন, কিন্তু তাও কামপ্রবৃত্তির রূপান্তর মাত্র। কামচেষ্টাও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হতে পারে। স্ত্রীপুরুষের মিলনের উদ্দেশ্য, কখনও পরস্পরের সঙ্গলাভ, কখন-বা রতিক্রিয়া। কামপাত্রও সব সময় এক না হতে পারে। পুরুষ আজ যে নারীকে ভালবাসে কাল তাকে ভাল না বেসে অন্যতরাতে আসক্ত হতে পারে। নারী সম্পর্কেও একই নিয়ম সত্য। এমন কি একই সময়ে একই ব্যক্তি দুই বা ততোধিক ব্যক্তিতে আসক্ত হতে পারে।

তা হলেই দেখা গেল, কামবৃত্তির বিকাশ কোন-একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মনোবিদ্‌গণ বলেন, কামগন্ধহীন পবিত্র প্রেমও সেই আদি কামভাবেরই রূপান্তর মাত্র। তেমনি সখিত্ব, বন্ধুত্ব ইত্যাদির মূলেও রয়েছে কামশক্তি। পুরুষে পুরুষে এবং নারীতে নারীতে আসক্তির মূলেও রয়েছে এই কামশক্তির লীলা। ফ্রয়েড বলেন, আমাদের প্রত্যেকেরই মনে প্রীতি, ভক্তি ও স্নেহবন্ধনের সঙ্গে কামভাব জড়িত।

স্ব-রতি [narcissism], বিষয়-রতি [object-love] এবং স্বতঃরতি [auto-eroticism] ভেদেও আবার কামবৃত্তির নানা রূপভেদ হয়েছে। কামভাব যদি আত্মসুখেরই জনক হয় তা হলে তার নাম স্ব-রতি বা আত্মরতি। আসক্তির পাত্র বা পাত্রীর প্রতি ঔৎসুক্য ও আকর্ষণ যখন প্রবল তখন তার নাম বিষয়-রতি, এবং কেবল প্রেমের জন্যেই প্রেম, অর্থাৎ ভালবাসাকেই ভালবাসার নাম স্বতঃরতি। ৩৪

বলাই বাহুল্য, কামশক্তিকে বিশ্লেষণ করে মনঃসমীক্ষক ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর মনোবিদ্‌গণও প্রেম বা প্রেমশক্তির নানা উপকরণ বিশ্লেষণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁর 'প্রিন্সিপল্‌স অব সাইকোলজি' গ্রন্থে প্রেমের নয়টি উপকরণ আবিষ্কার করেছেন। ১ দৈহিক যৌনবাসনা, ২ সৌন্দর্যানুভূতি, ৩ স্নেহ, ৪ শ্রদ্ধা ও ভক্তি, ৫ অনুমোদন-প্রীতি, ৬ আত্মাদর, ৭ মমকার, ৮ কর্মের সম্প্রসারিত স্বাধীনতা এবং ৯ সহানুভূতির উধ্বর্ায়ন।[৩৫]

ফ্রয়েড এবং অন্যান্য মনঃসমীক্ষকগণের লিবিডো বা কামশক্তির অর্থব্যাপ্তি সাধারণ মনস্তাত্ত্বিক মহলেও স্বীকৃত হয়েছে। ম্যাক্‌ডোগাল প্রবৃত্তিসমূহ সম্পর্কে তাঁর প্রাথমিক চিন্তাকে সংশোধিত করে সেগুলিকে মানুষের জিজীবিষাপ্রবৃত্তির মধ্যে ঐক্যগ্রথিত করার দিকেই প্রবণতা প্রদর্শন করেছেন। তাই তিনি প্রবৃত্তিসমূহের একটা সংহতিবদ্ধ রূপের কল্পনা করে জীবনের অমরত্ব ও সম্প্রসারণকামী প্রাণ-শক্তিরই অঙ্গরূপে তাদের স্বীকার করে নিয়েছেন, "The great purpose which animates all living beings, whose end we can only dimly conceive and vaguely describe as the perpetuation and increase of life."[৩৬]

য়ুং ফ্রয়েডের 'কামশক্তি'র ধারণাকে সমধিক সম্প্রসারিত করে তাকে এমন অর্থে পরিব্যাপ্ত করেছেন যাকে অনায়াসেই বলা যায় আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের ব্যবহৃত ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের 'কাম' বা বাসনা। য়ুং-এর এই অর্থসম্প্রসারণে ফ্রয়েডীয় 'লিবিডো' শোপেনহাওয়ারের **Will** বা 'অভীপ্সা', এবং বের্গসঁর **'Elan vital'** বা প্রাণাবেগের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে উঠেছে।

১২

'লিবিডো' বা কামশক্তির এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় সংকলন করার পর মনঃসমীক্ষকগণের 'সাবলিমেশন' বা উদ্‌গতির তাৎপর্য আবিষ্কার করা আশা করি সহজসাধ্য হবে। পূর্বেই বলেছি ফ্রয়েড এবং তাঁর অনুপন্থিগণের মতে আমাদের অবদমিত বাসনাই শুভসুন্দর বেশে উদ্‌গতি লাভ করে। আর একথাও তাঁদের কাছে আমরা জেনেছি যে, কেবল কামবৃত্তিই অবদমিত হয়। ফ্রয়েডীয় শাস্ত্রে অবদমিত বাসনার উদ্‌গতি-তত্ত্ব একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার

করে আছে, কেন না ফ্রয়েডের মতে আমাদের সমগ্র সভ্যতাই উদ্‌গতির ফল [All civilization may be regarded as a sublimation of libido.] ফ্রয়েডের এই মূলসূত্র পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশের মনঃসমীক্ষকগণের চিন্তায় নব নব রূপ পরিগ্রহ করেছে। Maeder প্রমুখ সুইস মনঃসমীক্ষকগণ উদ্‌গতিকে বলেছেন, মনঃ-সংহতি [Psycho-synthesis] বা 'ধর্ম', যার দ্বারা আত্মা মর্ত্যসীমা অতিক্রম করে যেতে পারে। "as helping to constitute a kind of psycho-synthesis, and even a kind of religion, the soul being led, as Dante was in his great poem, through Hell and Purgatory to Paradise, the physician as guide playing the part of Virgil."[৩৭]

ইতালীয় মনঃসমীক্ষক Assagioli বলেন, কামশক্তি একটি পাশবিক বৃত্তি সুতরাং মানুষের লজ্জার কারণ—এই ধারণা আমাদের পরিবর্তন করতে হবে। তাঁর মতে অবদমনও অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত হয় নি। তিনি স্বতঃ-উদ্‌গমন বা Auto-sublimation-এ বিশ্বাসী। তাঁর মতে "The sexual excitation may be intense but it may at the same time be linked on to higher emotional and spiritual activities, and especially,...by a complete change of occupation to some *creative* work, for artistic creation is deeply but obscurely related to the process of sexual sublimation."[৩৮]

অবদমিত বাসনার উদ্‌গতি সর্বক্ষেত্রেই সমান হবে এমন কোন কথা নেই। ফ্রয়েড তাঁর 'Introductory Lectures'-এ বলেছেন, সাধারণ মানুষ অতৃপ্ত কামশক্তির বেগের সামান্য অংশমাত্রই ধারণ করতে পারে। বেশির ভাগ লোকের পক্ষেই উদ্‌গতির পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর। তা ছাড়া অবদমিত কামনাশক্তির সমস্তটাই যে উদ্‌গতি লাভ করতে পারে এমন নয়। [sublimation can never discharge more than a certain proportion of libido,] এমন কি অবদমিত বাসনার উদ্‌গতি-ক্রিয়াতেও কামশক্তির কিছু অংশ আদিম বৃত্তির সুস্থ ও স্বাভাবিকপথেই চরিতার্থতা লাভ করে। "When we deal with sublimation we are treating the organism dynamically, and we must be

prepared to accept and allow for a certain amount of sexual energy "expelled in the form of degraded heat." whatever the form may be. Even Dante had a wife and family when he wrote the Divine Comedy."[৩৯]

১৩

ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণতত্ত্বের এই সামান্য বিশ্লেষণ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হবে যে, ফ্রয়েড এবং তাঁর সহকর্মী ও শিষ্যগণ এমন কোন অসম্ভব কথা বলেন নি যা মানুষের চিন্তাজগতে একেবারেই অভিনব বা অভূতপূর্ব। আমরা ফ্রয়েডকে বলেছি এ যুগের ধন্বন্তরি। মানসিক ব্যাধি-জর্জরিত মানুষের আধি-ব্যাধির নিদান সন্ধান করতে গিয়ে তিনি সুস্থ মানুষের মনস্তত্ত্বেরও এক নূতন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আবিষ্কার করেছেন। ইদং, অহং, এবং অধিশাস্তা প্রভৃতি মনোলোকের বিচিত্র স্তরবিন্যাসের দ্বারা তিনি তত্ত্বমনোবিদ্যার [Metapsychology] নূতন অধ্যায় রচনা করলেন। নির্জ্ঞান মনের আবিষ্কার এযুগের মানবসভ্যতার এক বিস্ময়কর আবিষ্কার বলেই স্বীকৃত হয়েছে। কামশক্তি, তাঁর অবদমন এবং উদ্‌গমনের তিনি যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছেন তা মানুষের মনোজগতের রহস্যময় অন্ধকারলোকে এক বলিষ্ঠ এবং বিপ্লবী পদক্ষেপ।

তথাপি ফ্রয়েডের অনুরূপ চিন্তা প্রাচীন পৃথিবীতে—প্রাচ্যে এবং প্রতীচ্যে—সূত্রাকারে এবং অনতিস্ফুটরূপে বর্তমান ছিল, এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই। আমাদের দেশে মানুষের জৈবিক সত্তায় তার শিশ্নোদর-পরায়ণতার কথা স্বীকার করা হয়েছে। ফ্রয়েডীয় 'কামশক্তি'র মত আমাদের দেশেও কেউ কেউ রতিকেই সমস্ত সহজাতবৃত্তির ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। ভোজরাজ তাঁর 'শৃঙ্গারপ্রকাশে' 'শৃঙ্গার'কে শুধু 'আদি'ই নয়, একমাত্র রস-রূপেই গণ্য করেছেন। 'রতি'ই তা হলে তাঁর মতে একমাত্র 'স্থায়িভাব'। অলংকারকৌস্তভ-প্রণেতা সম্প্রয়োগবিষয়া এবং অসম্প্রয়োগ-বিষয়া ভেদে 'রতি'র যে বিচিত্র স্তরবিন্যাস করেছেন,—বিশেষ করে তাঁর প্রীতি, মৈত্রী, সৌহার্দ ও ভাব-রতির বিশ্লেষণের সঙ্গে ফ্রয়েডীয় কামশক্তির বিশ্লেষণ প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত।

আমরা বলেছি, প্লেটোর এরস্-তত্ত্বই ফ্রয়েডের লিবিডোতত্ত্বে রূপান্তরিত হয়েছে। প্লেটো যাকে বলেছেন মানুষের জীবনে দিব্য-এরসের লীলা, ফ্রয়েডে তাই হয়েছে 'কামশক্তি'র উদ্গতি বা উদ্গমনের ফল। মনঃ-সমীক্ষকগণের স্মরণীয় উক্তি—all civilization may be regarded as a sublimation of libido—যতই চমকপ্রদ বলে বিবেচিত হোক্ না কেন, তেইশ-চব্বিশ শো বৎসর পূর্বে প্রাচীন গ্রীসের কবিদার্শনিকও সমান উদাত্ত ভঙ্গিতেই অনুরূপ অর্থে দিব্য-এরস্-তত্ত্বের বিশ্লেষণ করেছিলেন। হ্যাভেলক এলিস তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় উদ্গতি-তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন :

"Plato said that love was a plant of heavenly growth. If we understand this to mean that a plant, having its roots in the earth, may put forth "heavenly" flowers, the metaphor has a real and demonstrable scientific truth. It is a truth which the poets have always understood and tried to embody. Dante's Beatrice, the real Florentine girl who becomes in imagination the poet's guide in Paradise, typically represents the process by which the attraction of sex may be transformed into a stimulus to spiritual activities."[৪০]

১৪

ভারতীয় বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিক সহজিয়া ধর্মে কাম-শক্তির উদ্গতি বা উদ্গমনের মহত্তম প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়েছে। অধ্যাপক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'Obscure Religious Cults' গ্রন্থে বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন :

"The most important of the secret practices is the yogic control of the sex-pleasure so as to transform it into transcendental bliss, which is at the same time conducive to the health both of the body and the mind. This yogic practice with its accessories, being associated with the philosophy of Siva and Sakti, stands at the centre

of the net-work of the Hindu Tantric systems, and when associated with the speculations on Prajna and Upaya of later Buddhism, has given rise to the Tantric Buddhist cults including the Buddhist Sahajiya system; and again, when associated with the speculations on Krisna and Radha conceived as Rasa and Rati in Bengal Vaisnavism, the same yogic pratice and discipline has been responsible for the growth and development of the Vaisnava Sahajiya movement of Bengal."[৪১]

উদ্‌গতিপ্রাপ্ত কামশক্তিকে সাধনপ্রক্রিয়ার মূলশক্তিরূপে অঙ্গীকার করে নর-নারীর পরস্পর মিলিতভাবে ধর্মসাধনার একটি ধারা ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। এর মূলে রয়েছে তন্ত্রের শিব-শক্তি-তত্ত্ব। এই সাধনার বিভিন্ন পরিণতিতেই বামাচারী তান্ত্রিক সাধনা, বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনা, বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনা এবং বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনা প্রভৃতির উদ্ভব ঘটেছে। এঁরা সবাই এক অদ্বয় পরমানন্দ-তত্ত্বকেই চরম সত্য বলে মনে করেন। এই অদ্বয় আনন্দতত্ত্বের দুটি ধারা বর্তমান। পুরুষ ও প্রকৃতি-রূপে প্রকাশিত এই দুটি ধারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হবার ফলে আবার এক অখণ্ড তত্ত্বের ভিতরে গভীর ভাবে মিলিত হয়ে যে চরমতত্ত্ব রচনা করে তাই অদ্বয় তত্ত্ব। এই রূপত দুই অথচ স্বরূপত এক তত্ত্বের নামই মিথুনতত্ত্ব বা যামলতত্ত্ব বা যুগলতত্ত্ব। তান্ত্রিক মতে এই দু ধারার নাম শিব ও শক্তি। এই শিব-শক্তির মিলন-জনিত কেবলানন্দই হল তান্ত্রিকের পরম সাধ্য। এই সাধ্যলাভের সাধনপদ্ধতি বহুবিধ। সাধক নিজের দেহের মধ্যেই এই শিবশক্তিতত্ত্বকে পূর্ণজাগ্রত ও পূর্ণ-পরিণত করে নিজের ভিতরেই এই উভয়তত্ত্বের মিলন-জনিত অপূর্ব সামরস্য-সুখ বা কেবলানন্দ অনুভব করতে পারেন। এই শিবশক্তিতত্ত্বের বহুবিধ সাধনার মধ্যে একটি হল নরনারীর মিলিত সাধনা। এই সাধনার সাধকগণের বিশ্বাস শিবশক্তি নিত্যতত্ত্বটি স্থূলে পৃথিবীর নর-নারীর ভিতর দিয়ে রূপ লাভ করেছে। সাধনার ক্ষেত্রে প্রথম সাধ্য হল নর ও নারীর মধ্যে সুপ্ত শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্বের পূর্ণ জাগরণ। সেই অবস্থায় উভয়ের যে মিলন তা সাধক-সাধিকাকে পূর্ণ সামরস্যে পৌঁছে দেয়—এই পূর্ণ সামরস্য-জনিত যে অসীম অনন্ত আনন্দানুভূতি

তন্ত্রের ভাষায় তারই নাম সামরস্য-সুখ। সহজিয়া বৌদ্ধেরা তাকেই বলেন মহাসুখ, সহজিয়া বৈষ্ণবগণের ভাষায় তা মহাভাব-স্বরূপ।[৪২]

বৌদ্ধরা মূলে নির্বাণপন্থী। সুকঠোর আত্মনিগ্রহের দ্বারা চিত্তনিরোধের পথই তাঁদের ধর্মপথ। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মহাযান-পন্থ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে মাধ্যমিক ও যোগাচার এই দুটি মত প্রচলিত হল। যোগাচার মতাবলম্বীরা যোগশাস্ত্র চর্চার ফলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন স্বীকার করে অনাত্মবাদী মহাযানদের মধ্যেও পরোক্ষে আত্মবাদ প্রচার করলেন। ধীরে ধীরে মন্ত্রযানের উদ্ভব হল। এই মন্ত্রযান বৌদ্ধরাই বিভিন্ন শক্তিপূজার সঙ্গে তান্ত্রিকতাকেও অবলম্বন করলেন। প্রথমে বৌদ্ধ সন্ন্যাসধর্মে নারীর অধিকার স্বীকৃত হয় নি। বুদ্ধশিষ্য আনন্দই নারীজাতিকে সন্ন্যাসের অধিকার দিয়েছিলেন। তারই ফলে ধীরে ধীরে বৌদ্ধবিহার ও সঙ্ঘারামে বহুতর শ্রাবক ভিক্ষুসঙ্ঘের মত শত শত শ্রাবিকাও আশ্রয় পেয়েছিলেন। এঁদের প্রাথমিক লক্ষ্য অবশ্যই ছিল নিবৃত্তিমার্গ। কিন্তু পরে এঁদের মধ্যেই পুরুষ ও নারীর মিলিত সাধনার পথ গৃহীত হতে লাগল। এই মিলিত সাধক-দল প্রচার করলেন, নিরবচ্ছিন্ন ভোগসাধনের ফলে যে সহজানন্দ লাভ হয় তা দিয়েই নির্বাণপদ সিদ্ধ হতে পারে। এই নবসম্প্রদায়ের নাম হল 'বজ্রযান'! প্রবৃত্তিমার্গী এই নবসম্প্রদায় বজ্রসত্ত্ব নামে ষষ্ঠ ধ্যানীবুদ্ধ এবং বজ্রধাত্বেশ্বরী বা বজ্রেশ্বরী নামে তাঁর শক্তির কল্পনা করে বজ্রসত্ত্বযান বা বজ্রযান মার্গ প্রচার করলেন। 'সহজানন্দ' ও 'সহজৈকস্বভাবজ্ঞান'রূপ মহাসুখই বজ্রযান বৌদ্ধদের প্রধান লক্ষ্য। এই সম্প্রদায়ের একখানি প্রাচীন গ্রন্থ 'চণ্ডরোষণমহাতন্ত্র'। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে এই গ্রন্থের আটশো-বছর-আগে হাতে-লেখা একখানি টীকার কিয়দংশ নকল করে এনেছিলেন। তাতে 'সহজতত্ত্বে'র ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ আছে। তা থেকে জানতে পারা যায়, বজ্রযানদের মতে আনন্দ চতুর্বিধ: আনন্দ, পরমানন্দ, সহজানন্দ ও বিরমানন্দ। এর মধ্যে প্রজ্ঞা ও উপায়, অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির যাতে পারস্পরিক অনুরাগ জন্মে তাদৃশ লক্ষণবিশিষ্ট লীলাবিলাস ও সম্প্রয়োগের দ্বারা যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় বজ্রপদ্মসংযোগে যে আনন্দ অনুভূত হয় তার নাম 'আনন্দ'। তারপরে পদ্মান্তর্গত বজ্রচালন দ্বারা মণিমূল বোধিচিত্ত প্রাপ্ত হলে তাকে বলে 'পরমানন্দ'। পরমানন্দের

পরবর্তী স্তর ‘সহজানন্দ’। তাতে গ্রাহ্য গ্রাহক ও গ্রহণাভিমান-বর্জিত পরম সুখ উৎপন্ন হয়। তার পর নিশ্চেষ্ট হয়ে আমি সুখভোগ করেছি এইরূপ বিকল্প অনুভবের নাম ‘বিরমানন্দ’। এই বিরমানন্দই সহজৈক-স্বভাবজ্ঞানরূপ মহাসুখ। মহাযান সম্প্রদায় ছিলেন জ্ঞানমার্গী। বজ্রযান সম্প্রদায় রসমার্গের পথিক। শুধু বজ্রযান সম্প্রদায়ই নয়, সাধারণভাবে সহজপন্থীরা সবাই রসমার্গের পথিক। প্রকৃতি-পুরুষের মিলনকেই তাঁরা পুরুষার্থ বলে মনে করেন। তাই এই সাধনায় যাঁরা সিদ্ধ তাঁদের বলা হয় ‘রসিক’ ভক্ত।[৪৩]

নরনারীর মিলিত সাধনার এই পথকে ‘সহজ-পথ’ বলা হয়েছে। বস্তুত, সাধনপন্থা হিসাবে এ পথ মোটেই সহজ পথ নয়; পদে পদে পদস্খলন হবার সম্ভাবনাই সমধিক। এ সাধনা সুকঠোর আত্মসংযমের পথে দুশ্চর তপশ্চর্যার অপেক্ষা রাখে। নইলে তা অসংযত কামকেলিতে অর্থাৎ মদনমহোৎসবলীলায় পর্যবসিত হয়। এই সাধনার নাম সহজ-সাধনা, কারণ তা সহ-জ, অর্থাৎ সহজাত। জন্মগত অধিকার-সূত্রেই তা প্রাপ্য, এই অর্থেই তা সহ-জ। উচ্চ-নীচ, কিঞ্চন-অকিঞ্চন নির্বিশেষে সকলেরই এতে সমান অধিকার। কিন্তু এই অধিকারকে আয়ত্ত করা সকলের সাধ্য নয়। চণ্ডীদাস তাই বলেছেন :

রসিক রসিক সবাই কহয়ে
কেহত রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে
কোটিতে গোটিক হয়॥

১৫

গৌড়বঙ্গে বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজিয়াদের সাধনপদ্ধতির কথা বাংলা-সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন, হাজার বছরের পুরনো বাংলা ভাষায় লেখা ‘বৌদ্ধ গান ও দোহা’য় পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব-বিলুপ্তির যুগে আর্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানের ফলে বৌদ্ধসমাজ ও হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরের ভেদরেখা একদিন বিলুপ্ত হয়ে গেল। নিত্যানন্দ-তনয় বীরভদ্র মুণ্ডিতমস্তক শত শত বৌদ্ধ শ্রমণ ও শ্রমণীগণকে বৈষ্ণব ধর্মের উদার সত্রতলে আহ্বান করে চরম দুর্গতি থেকে উদ্ধার করলেন।

এই নেড়ানেড়ীর দলই ছিলেন বজ্রযানপন্থী সহজিয়ার দল। অবশ্য সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম এই দলগত ধর্মান্তরীকরণের বহু পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিল। সহজিয়া বৈষ্ণবেরা দাবী করেন, রায় রামানন্দ জগন্নাথের দেবদাসীর সঙ্গে, চণ্ডীদাস রজকিনী রামীর সঙ্গে, বিদ্যাপতি রাজা শিবসিংহের পত্নী লছমী দেবীর সঙ্গে, জয়দেব পদ্মাবতীর সঙ্গে, রূপ গোস্বামী মীরাবাঈয়ের সঙ্গে, বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির সঙ্গে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্যামাঙ্গিনীর সঙ্গে সহজ-ধর্ম আস্বাদন করেছিলেন। তন্মধ্যে রায় রামানন্দ, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব ও বিল্বমঙ্গল এই পাঁচজন 'পঞ্চরসিক' বলে অভিহিত। 'চৈতন্যচরিতামৃত'কে চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব সহজিয়ারা ব্রহ্মসূত্র-স্বরূপ মনে করেন। তাতে আছে

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥

এতে 'পঞ্চরসিকে'র কাব্যই শ্রীচৈতন্যদেবের আস্বাদনীয় ছিল, এই সূত্র ধরে সহজিয়ারা চৈতন্যদেবকেও তাঁদের রসিক-সমাজভুক্ত করার স্পর্ধা করেন। প্রাক্‌চৈতন্য যুগেও যে সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের প্রচলন ছিল তার অভ্রান্ত প্রমাণ চণ্ডীদাসের সহজিয়া পদাবলী। বস্তুত, চণ্ডীদাসই সহজ ধর্মের মহত্তম কবি-রসিক।

নারী-পুরুষের মিলিত সহজ-সাধনা বৈষ্ণবধর্মে প্রবেশ লাভ করে একটি উল্লেখযোগ্য রূপান্তর লাভ করল। হিন্দু এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক পদ্ধতিতে—এমন কি বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের ভিতরেও যা ছিল মূলত একটি যোগ-সাধনা বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যে তা যোগ-সাধনাকে অবলম্বন করেই একটি প্রেম-সাধনায় পর্যবসিত হল। তান্ত্রিক শিব-শক্তি এবং বৌদ্ধ প্রজ্ঞা-উপায়ের বদলে বৈষ্ণব সহজ-তত্ত্বে রাধাকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা হল। শিব-শক্তির মিলন-জনিত সামরস্য ছিল আনন্দস্বরূপ, বৌদ্ধরা তাকেই বলেছেন মহাসুখস্বরূপ। বৈষ্ণব সহজিয়া রাধাকৃষ্ণের মিলন-জনিত আনন্দকে বললেন প্রেম। অবশ্য চরম অবস্থায় প্রেমই আনন্দ, আনন্দই প্রেম। যে-পথে এই চরম অবস্থা-প্রাপ্তি ঘটে বৈষ্ণবগণ তাকে যোগের পথ বললেন না, বললেন প্রেমের পথ।[৪৪] তাঁদের সাধনা প্রেম-পিরীতি-মার্গের ভজন। 'রাগের ভজন'।

এই রাগের ভজন, এই প্রেমের পথ ধরেই বাংলায় আর একটি সহজিয়া সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, তার নাম 'বাউল'। ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থে বলেছেন, "চৈতন্য-পরবর্তী সহজিয়া-বৈষ্ণবধর্ম বাউল ধর্মের প্রাথমিক স্তর। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বা পরবর্তী সহজিয়া-বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্বদর্শনই বাউল ধর্ম ও সাধনার ভিত্তি। সাধনা-অংশে বাউল-ধর্মের যে বৈশিষ্ট্য বা নূতনত্ব দেখা যায়, তাহার বীজ চণ্ডীদাসের বা চণ্ডীদাস-নামধারী এক বা একাধিক কবির রচিত বা নরোত্তমদাস, লোচন-দাস, বিদ্যাপতি, চৈতন্যদাস, বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস প্রভৃতির ভণিতা-যুক্ত সহজিয়া-পদে এবং নানা সহজিয়া-গ্রন্থে বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ বীজ হইতে উদ্ভূত তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহারিক প্রয়োগের পরিচয় বাউল-গানগুলির মধ্যে পাওয়া যায়।" [পৃ° ৩৫৫-৫৬]

উপেন্দ্রনাথের অনুসরণে বাউলধর্মের মূলসূত্রগুলির উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বাউলদের সাধনা কামের মধ্য থেকে প্রেমকে নিষ্কাশন করা; কামের বিষ নাশ করে প্রেমের অমৃত লাভ করা। তাঁরা ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড-বাদে বিশ্বাসী। তাই এই মানবজীবন ও মানবদেহকে বাউলরা পরম সম্পদ বলে মনে করেছেন। তাঁদের সাধনার মূল আশ্রয়ই দেহ। তাঁদের দৃষ্টিতে মাধুর্যময় যুগল-ভজনের ক্ষেত্র নরদেহ, তার মধ্যেই পরমতত্ত্বের বাস, তাই বাউল নরদেহকে পরম শ্রদ্ধা ও পরম বিস্ময়ের চোখে দেখেছে এবং নর-জন্মকে সার্থক মনে করেছে। মানব-দেহস্থিত পরমতত্ত্ব বা আত্মাকে বাউল বলেছেন 'মনের মানুষ'। বিখ্যাত বাউল লালন ফকিরের একটি গানে আছে :

এই মানুষে আছে, রে মন,
যারে বলে মানুষ রতন,
লালন বলে পেয়ে সে ধন,
পারলাম না রে চিনিতে।[৪৫]

এই 'মানুষ রতন', এই 'মনের মানুষ'ই বউলের পরম অন্বিষ্ট ধন। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন

সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে মানবলোকে,

আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।
তখন তিনি বাউল-সাধকের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েই কথা বলেন।

১৬

বস্তুত, বৈষ্ণবই হোক আর বাউলই হোক, সমস্ত সহজিয়া ধর্মই প্রেমের ধর্ম। আর তা একান্ত ভাবেই মানব-ধর্ম। এই প্রসঙ্গে চণ্ডীদাসের সেই বিখ্যাত উক্তি স্মরণীয় :

শুনহ মানুষ ভাই।
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই॥

সহজিয়া-গ্রন্থ 'রত্নসারে'ও বলা হয়েছে 'মানুষ বিগ্রহ ভজি ব্রজপ্রাপ্তি হবে।' মানুষের মধ্যেই যে দেবতা আছেন, এবং মানবপ্রেমই যে দিব্যপ্রেমের আধার, এই সত্যই সহজিয়া ধর্মের মূল সত্য। "It was a religious process of the divinisation of the human love and the consequent discovery of the divine in man"[৪৬] সহজিয়া পরিভাষায় মানুষের মধ্যে এই দেবতা-দর্শনতত্ত্বের নাম আরোপ-তত্ত্ব। রূপের মধ্যে স্বরূপের আরোপ। সহজিয়ারা বলেন, প্রতি পুরুষই কৃষ্ণ, প্রতি নারীই রাধা। রূপত তারা পুরুষ ও নারী, স্বরূপত কৃষ্ণ ও রাধা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের এখানেই পার্থক্য। সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মে প্রতি পুরুষই স্বরূপত কৃষ্ণ, এই তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে; কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে তা কখনোই স্বীকৃত হয় নি। আসলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে অসীমের কোটিতে পৌঁছে গীত হয়েছে রসতত্ত্বের গান, আর সহজিয়া ধর্মে সীমার কোটিতে দাঁড়িয়ে 'সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।'

নরনারীর ভিতর দিয়ে যে রাধাকৃষ্ণের সহজ-রসের লীলা চলে, এই তত্ত্বটি বিশদীভূত করতে হলে বৈষ্ণব সহজিয়াগণের স্বরূপ-লীলা ও শ্রীরূপ-লীলা এই দুটি লীলাকে ভাল করে বুঝতে হবে। প্রাকৃত জগতের একজন পুরুষের যে পুরুষ-রূপ তা হল তার বাইরের 'রূপ' মাত্র; এই বাইরের রূপের ভিতরে এই রূপকে আশ্রয় করেই একটি 'স্বরূপ' অবস্থান করে। সে স্বরূপ কৃষ্ণ-স্বরূপ।

তেমনি প্রতি নারীর নারী-রূপের মধ্যে অবস্থান করে রাধা-স্বরূপ। সাধনার প্রথম ও প্রধান কথা হল এই রূপ থেকে স্বরূপে প্রত্যাবর্তন। স্বরূপে স্থিতিলাভ করবার জন্যে নর-নারীর যে মিলন তাই হল প্রেমলীলা—তার ভিতর দিয়েই ঘটে বিশুদ্ধ সহজ-রসের আস্বাদন। 'শ্রীরূপ' তাই সাধকের সাধনপথে অবলম্বনমাত্র, এই শ্রীরূপ অবলম্বনে স্বরূপেই তাঁর আসল স্থিতি। সহজিয়াদের প্রথম সাধনা তাই হল শুধু বিশুদ্ধির সাধনা। সোনাকে যেমন পুড়িয়ে পুড়িয়ে নিখাদ করে তুলতে হয়, তেমনি মর্ত্যের প্রাকৃত দেহমনকেও পুড়িয়ে পুড়িয়ে বিশুদ্ধ করে নিতে হয়। বিশুদ্ধতম দেহমনকে অবলম্বন করে যে প্রেম তা তখন হয়ে ওঠে 'নিকষিত হেম', তাই পূর্ণ সমরস, তাই ব্রজের মহাভাব-স্বরূপ। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সহজিয়াগণের মতে মর্ত এবং বৃন্দাবন, প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃতের ভিতরে যে ভেদ তাও সাধনা দ্বারা মুছে ফেলা সম্ভব; অর্থাৎ প্রাকৃতকেই সাধনা দ্বারা অপ্রাকৃতে রূপান্তরিত এবং ধর্মান্তরিত করা যেতে পারে। তখন 'শ্রীরূপ স্বরূপ হয় স্বরূপ শ্রীরূপ।' অর্থাৎ রূপের ভিতরেই স্বরূপের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় রূপ ও স্বরূপের ভেদ তিরোহিত হয়।[৪৭]

এই শ্রীরূপে স্বরূপ আরোপিত হলে প্রাকৃত কামই অপ্রাকৃত প্রেম হয়ে ওঠে। সহজিয়া মতে তাই কামেরই উদ্গত বা ঊর্ধ্বায়িত অবস্থা প্রেম। মনোবৃন্দাবনের সরণি বেয়ে দেহবৃন্দাবনে নিত্যবৃন্দাবনের লীলারস আস্বাদনই তার নিঃশ্রেয়স। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে এখানেও সহজিয়া মতের পার্থক্য। চৈতন্যচরিতামৃতকার কাম ও প্রেমের স্বরূপ-লক্ষণ বোঝাতে লৌহ ও স্বর্ণের তুলনা দিয়েছেন। সহজিয়ারা বলেছেন আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছাই কাম বটে, কিন্তু দেহ ও মনঃসংযমের দ্বারা তাই বিশুদ্ধীভূত অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা-মুক্ত হয়েই প্রেমে পরিণত হয়। সুতরাং প্রেমের উদ্ভব কামের মধ্যেই। 'রত্নসারে' বলা হয়েছে :

> সেই ত উজ্জ্বল রহে রসে ঢাকা অঙ্গ।
> কাম হৈতে জর্মে প্রেম নহে কাম-সঙ্গ ॥
> লোহকে করয়ে সোনা লৌহ পরশিয়া।
> তৈছে কাম হৈতে প্রেম দেখ বিচারিয়া ॥
> পরশের গুণ শ্রেষ্ঠ তাহে লৌহ হেম।
> কামের কঠিন গুণ পরশিতে প্রেম।

কাম-বস্তু চন্দ্রকান্তি পরশ পাথর।
প্রেম-বস্তু সুখময় নির্মল ভাস্কর ॥
অগ্নির ভিতরে লৌহ থাকয়ে যাবৎ।
হেমের সদৃসি বস্তু থাকয়ে তাবৎ ॥
অগ্নিতেজ সুখাইলে পুন লৌহ হয়।
এই মতে কাম প্রেম জানিহ নিশ্চয় ॥[৪৮]

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে রূপ গোস্বামী তাঁর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে রতিকে সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা-ভেদে ত্রিবিধ স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। কুব্জার রতি সাধারণী, আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছাই সেখানে মুখ্য। 'সম্ভোগেচ্ছানিদানেয়ং রতিঃ সাধারণী মতা।' কৃষ্ণ-মহিষীগণের রতি সমঞ্জসা। তাতে নিজের এবং দয়িতের পরিতৃপ্তিবিধান সমভাগে বিভক্ত। সমর্থা-রতিতে নিজের সুখের কথা বিস্মৃত হয়ে দয়িতের সুখসংবিধানই একমাত্র লক্ষ্য। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছাই সেখানে সর্বসাধ্যসার। চণ্ডীদাস যখন শ্রীরাধার কণ্ঠে বলেন 'কানু অনুরাগে এ দেহ সঁপিনু তিল-তুলসী দিয়া'—তখন তিনি সমর্থা-রতিরই জয়ধ্বনি করেন। এই সমর্থা-রতিই সহজিয়াগণের সাধ্য ও আস্বাদ্য রতি।

পরকীয়াতেই এই সমর্থা রতি সম্যক্ আস্বাদ্যমান হয়, তাই সহজিয়াগণ পরকীয়া-সাধনার কথাই বলে গিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে স্বকীয়া-প্রেম ও পরকীয়া প্রেমের তর-তম-ভেদের প্রশ্ন ওঠে। রসিকগণ স্বকীয়ার চেয়ে পরকীয়াতেই অধিক রসের উল্লাস লক্ষ্য করেছেন। রূপ গোস্বামীর 'পদ্যাবলী'তে শীলা ভট্টারিকার একটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে নায়িকা তাঁর সখীকে বলছেন :

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥

অর্থাৎ, যিনি আমার কুমারীত্ব হরণ করেছিলেন আজ তিনিই আমার বর। আজও সেই চৈত্ররজনী, সেই বিকশিত মালতীর সুরভি, সেই কদম্ববনে লীলায়িত সমীরণ, আমিও সেই আছি, তথাপি সেই রেবানদীতটের বেতসী-তরুতলে যে-সব সুরতব্যাপারের লীলাবিধি তার প্রতিই আমার চিত্ত সমুৎকণ্ঠিত

হয়ে রয়েছে। রাধাকৃষ্ণ-লীলায় এই পদটির তাৎপর্য বোঝাবার জন্যে রূপ গোস্বামী স্বয়ং একটি পদ রচনা করে বলছেন :

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥

অর্থাৎ, রাধা বলছেন, হে সহচরি, সেই প্রিয় কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে মিলিত, আমিও সেই রাধা ; সেই-ই এই আমাদের সঙ্গম-সুখ, কিন্তু তথাপি যে বনমধ্যে মধুর মুরলীর পঞ্চম-স্বরে খেলা হত সেই কালিন্দীপুলিনস্থ বনের জন্যেই আমার মন অভিলাষী।

এই দুটি শ্লোকে স্বকীয়া থেকে পরকীয়া-রতিকেই অধিকতর উৎকর্ষ দান করা হয়েছে। এ সম্পর্কে মণীন্দ্রমোহন বসু তাঁর 'সহজিয়া সাহিত্য' গ্রন্থে নূতন আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, "সহজ ধর্মে স্বকীয়া হইতে পরকীয়া শ্রেষ্ঠ। সাধারণ লোকে জানে যে স্বকীয়া অর্থে নিজের স্ত্রী, আর পরকীয়া অর্থে পরের স্ত্রী। বস্তুতঃ লোকসমাজে এই অর্থেই শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাহ্যের করণে সহজিয়ারাও স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এই অর্থেই শব্দদ্বয় ব্যবহার করেন, কিন্তু মনের করণের ধর্ম-ব্যাখ্যায় ইহারা বিশিষ্টার্থে ব্যবহৃত হয়। তাঁহারা স্বকীয়া শব্দে সকাম সাধনা, এবং পরকীয়া শব্দে নিষ্কাম সাধনা নির্দেশ করেন।" [পৃঃ ৮০]

এই পরকীয়া সহজ-সাধনা সম্পর্কে চণ্ডীদাসের রাগাত্মিকা পদটি অতুলনীয়। চণ্ডীদাস বলেন :

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা।
কাজ নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা ॥
বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা।
(তোরা) নিসাড়া হইয়া আয়লো সজনি
আঁধার পেরিয়ে আলা ॥

আলার ভিতরে কালাটি আছে
চৌকি রয়েছে তথা।
সে দেশের কথা এ দেশে কহিলে
লাগিবে মরমে ব্যথা॥
পরপতি সনে সদাই গোপনে
সতত করিবি লেহা।
নীর না ছুঁইবি সিনান করিবি
ভাবিনী ভাবের দেহা॥
তোরা না হৈবি সতী না হবি অসতী
থাকিবি লোকের মাঝে।
চণ্ডীদাস কহে এমত হইলে
তবে ত পিরীতি সাজে॥

'নীর না ছুঁইবি সিনান করিবি ভাবিনী ভাবের দেহা'—বিশুদ্ধ পরকীয়া প্রীতি সম্পর্কে এ জাতীয় সংকেত-ভাষণ একমাত্র চণ্ডীদাসের পক্ষেই সম্ভব। রূপের মধ্যে স্বরূপের আরোপ-সাধনায়ও চণ্ডীদাসের রজকিনী-প্রেম সহজ-সাধনার পরাকাষ্ঠা। রামীর মধ্যেই তিনি রাধাকে আরোপ করে সাধনা করেছেন। এই আরোপ-সাধনে সিদ্ধিলাভের পর রামী হয়ে উঠেছে 'বেদবাদিনী হরের ঘরণী'। তখন 'রজকিনী-রূপই কিশোরী-স্বরূপ।' অর্থাৎ রসিক-সাধকের 'একাগ্র' চিত্তভূমিতে তাঁর 'একতান' চেতনায় রামীই মূর্তিমতী শ্রীরাধা। সেই দিব্যভাবে বিভোর হয়ে কবি বলেন :

শুন রজকিনী রামী।
ও দুটি চরণ শীতল বলিয়া
শরণ লইনু আমি॥
তুমি বেদ-বাদিনী হরের ঘরণী
তুমি সে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে ত্রিসন্ধ্যা যাজনে
তুমি সে গলার হারা॥
রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়।

রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম
বড়ু চণ্ডীদাস গায়॥

১৭

এক অর্থে রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাস-পন্থ প্রেমের কবি। 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের "বৈষ্ণব কবিতা"য় তিনি সামান্য প্রাকৃত-নায়িকার মধ্যেই রাধা-স্বরূপ আরোপের কথা বলেছেন। "বৈষ্ণব কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টি সহজিয়াদৃষ্টির সহোদর। তাঁর প্রেমচেতনার তুঙ্গশিখরে জীবনদেবতা-তত্ত্বের আরোপের মধ্যেও এই সহজিয়া-দৃষ্টিই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ কৈশোর-লগ্নে ব্রজবুলির অনুসরণে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' লিখেছিলেন। এদিক দিয়ে বিদ্যাপতিই তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কবি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সেদিন চণ্ডীদাসের ভাব-সাধনাই তাঁর চিত্তকে অধিকতর আকৃষ্ট করেছে। একুশ বৎসর বয়সে, ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে, 'ভারতী'তে তিনি "চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর 'সমালোচনা' গ্রন্থে সে প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে বিদ্যাপতির সঙ্গে চণ্ডীদাসের তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমাদের চণ্ডীদাস সহজ ভাষায় সহজ ভাবের কবি, এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি।" "বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন; চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন।" "চণ্ডীদাস কহেন প্রেম কঠোর সাধনা। কঠোর দুঃখের তপস্যায় প্রেমের স্বর্গীয় ভাব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে।" "যে তোমার অধীন নহে, তোমার নিজেকে তাহার অধীন কর; যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তোমার নিজেকে তাহার কাছে পরতন্ত্র কর; যাহার সকল বিষয়ে স্বাধীন ইচ্ছা আছে, তোমার নিজের ইচ্ছাকে তাহার আজ্ঞাকারী কর; সে কি কঠোর সাধন!" "চণ্ডীদাস হৃদয়ের তুলাদণ্ডে মাপিয়া দেখিলেন, প্রাণের অপেক্ষা প্রেম অধিক হইল।" "এত বড় প্রেমের ভাব চণ্ডীদাস ব্যতীত আর কোন্ প্রাচীন কবির কবিতায় পাওয়া যায়?" "চণ্ডীদাসের প্রেম কি বিশুদ্ধ

প্রেম ছিল! তিনি প্রেম ও উপভোগ উভয়কে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন। তাই তিনি প্রণয়িনীর রূপ সম্বন্ধে কহিয়াছেন, 'কামগন্ধ নাহি তায়'।"

"একস্থলে চণ্ডীদাস কহিয়াছেন,

রজনী দিবসে হব পরবশে
স্বপনে রাখিব লেহা।
একত্রে থাকিব নাহি পরশিব
ভাবিনী ভাবের দেহা॥

"দিবস রজনী পরবশে থাকিব, অথচ প্রেমকে স্বপ্নের মধ্যে রাখিয়া দিব। একত্রে থাকিব অথচ তাহার দেহ স্পর্শ করিব না। অর্থাৎ এ প্রেম বাহ্যজগতের দর্শন-স্পর্শনের প্রেম নহে, ইহা স্বপ্নের ধন, স্বপ্নের মধ্যে আবৃত থাকে, জাগ্রত জগতের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। ইহা শুদ্ধমাত্র প্রেম, আর কিছুই নহে।"[৪৯] এই সব উক্তি থেকেই প্রমাণিত হয় সেদিন রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসের প্রেমকেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা বলে মনে করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন।" উক্ত প্রবন্ধের অন্তিম অনুচ্ছেদে তিনি নিজেও এক জগতের কল্পনা করেছেন যেখানে "প্রেম বিতরণ করাই জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে।" একুশ বৎসর বয়সে যৌবনে পদার্পণ করে এই ছিল রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নকামনা। এই স্বপ্নকামনাই কবির সারাজীবনের উপলব্ধি ও ভাবসাধনায় সংহত ও বিশুদ্ধীভূত হয়ে যে পরিশীলিত রূপ পরিগ্রহ করেছে তারই বিচিত্র প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের প্রেম সৌন্দর্য ও জীবনদেবতা বিষয়ক কবিতাগুলিতে লক্ষ্য করা যাবে।

১৮

প্রস্তাবনার উপসংহার রচনার পূর্বে একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। আমরা বলেছি, রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসপন্থ প্রেমের কবি। একথা বলার এই অর্থ নয় যে, রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাস-প্রদর্শিত পথে সহজিয়া বৈষ্ণবের প্রেম-সাধনাকেই জীবনের উপজীব্য করেছিলেন। প্রথম খণ্ডে আমরা 'রাবীন্দ্রিক

প্লেটোনিজম' কথাটি ব্যবহার করেছি, তারও অর্থ এই নয় যে, রবীন্দ্রনাথের প্রেমানুভূতি প্লেটোনিক প্রেমসাধনার অনুপন্থী ছিল।

আমরা ফ্রয়েডের লিবিডোতত্ত্ব সম্পর্কেও বিস্তৃত আলোচনা করেছি। তার দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, ফ্রয়েডের কামসর্বস্ববাদ বা Pansexualism-কে আমরা সমর্থন করি। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ও ফ্রয়েড সমসাময়িক হলেও ফ্রয়েডের চিন্তা পৃথিবীতে প্রচারিত হওয়ার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধ বিকশিত হয়ে উঠেছে। তৎসত্ত্বেও ভেবে বিস্মিত হতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথের কোন কোন উক্তি আশ্চর্যভাবে ফ্রয়েড-তত্ত্বের সমর্থক। উনত্রিশ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ মানুষের প্রবৃত্তি সম্পর্কে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীকে এক পত্রে লিখছেন :

"যাকে আমরা প্রবৃত্তি বলি এবং যার প্রতি আমরা সর্বদাই কটুভাষা প্রয়োগ করি সেই আমাদের জীবনের গতিশক্তি—সেই আমাদের নানা সুখদুঃখ পাপপুণ্যের মধ্য দিয়ে অনন্তের দিকে বিকশিত করে তুলছে। ** যিনি আমাদের অনন্ত জীবনের মধ্যে প্রবৃত্তি নামক প্রচণ্ড গতিশক্তি দিয়েছেন তিনিই জানেন তার দ্বারা আমাদের কী রকম করে চালনা করবেন। আমাদের সর্বদা এই একটা মস্ত ভুল হয় যে, আমাদের প্রবৃত্তি আমাদের যেখানে নিয়ে এসেছে সেইখানেই বুঝি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে—আমরা তখন জানতে পারিনে সে আমাদের তার মধ্যে থেকে টেনে তুলবে। নদীকে যে শক্তি মরুভূমির মধ্যে নিয়ে আসে সেই শক্তিই সমুদ্রের মধ্যে নিয়ে যায়। ভ্রমের মধ্যে যে ফেলে ভ্রম থেকে সেই টেনে নিয়ে যায়। এই রকম করেই আমরা চলেছি। যার এই প্রবৃত্তি অর্থাৎ জীবনীশক্তির প্রাবল্য নেই, যার মনের রহস্যময় বিচিত্র বিকাশ নেই, সে সুখী হতে পারে, সাধু হতে পারে, এবং তার সেই সংকীর্ণতাকে লোকে মনের জোর বলতে পারে, কিন্তু অনন্ত জীবনের পাথেয় তার বেশি নেই।"[৫০]

এখানে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ একবার প্রবৃত্তিকে বলেছেন জীবনের গতিশক্তি, আবার বলেছেন, প্রবৃত্তিই জীবনীশক্তি। এবং তাঁর মতে এই প্রবৃত্তিরূপিণী জীবনীশক্তিই মানুষের অনন্ত জীবনের পাথেয়। এই প্রবৃত্তিই মানুষকে অনন্তের দিকে বিকশিত করে তুলছে। বলাই বাহুল্য, প্রবৃত্তির এই উর্ধ্বগতি বা উদ্গতিকেই ফ্রয়েডও বলেছেন sublimation of the libido.

কিন্তু এই ভাবসাদৃশ্য প্রমাণ করে না যে, রবীন্দ্রনাথ ফ্রয়েডের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

আসলে কোনো মহৎ প্রতিভার স্বরূপ-নির্ণয়ে আমরা যখন বাইরে থেকে কোনো তত্ত্বের প্রয়োগ করি তখন তা শুধু তুলনামূলক সাদৃশ্যরূপেই উদাহৃত হতে পারে, তার বেশি গুরুত্ব তার নেই। কেননা অপূর্ববস্তু-নির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা নিয়ে যিনি জন্মেছেন তাঁর সম্পর্কে সমস্ত পূর্বাগত তত্ত্বই বাইরে থেকে আরোপিত। প্রতিভা অন্যের নিয়ম মেনে চলে না, সে নিয়তিকৃতনিয়মরহিতা অনন্যপরতন্ত্রা। 'কাব্যপ্রকাশ'কার মম্মট ভট্ট যথার্থই বলেছেন :

নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্।
নবরসরুচিরাং নির্মিতিমাদধতী ভারতী কবের্জয়তি ॥

কবির বাণী সম্বন্ধেই শুধু যে এই উক্তি সত্য তা নয়, কাব্যসৃষ্টির উৎসমূলে যে উপলব্ধি রয়েছে তাও অনন্যপরতন্ত্র।

তথাপি আমরা যে প্রীতিরতি এরসতত্ত্ব লিবিডো ও প্রেমধর্মের আলোচনা করেছি তা তাৎপর্যহীন নয়। আমাদের বক্তব্য হল, প্রাচ্যে অথবা প্রতীচ্যে, প্রাচীন অথবা আধুনিক কালে দেশকালনির্বিশেষে যখনই মানুষ প্রেমচেতনা সম্পর্কে গভীরভাবে অনুশীলন ও ধ্যান করেছে তখনই সে প্রেমের পথ বেয়ে এক পরমতত্ত্বে উপনীত হয়েছে। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, প্রেম মানবজীবনের মহত্তম প্রেরণা। প্রেমৈকসর্বস্ব জীবনচেতনা যাঁদের নয় তাঁরাও একথা স্বীকার করেছেন। ভাববাদী দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তাঁর কমলা-বক্তৃতায় [১৯৪২] মানবজীবনে প্রেমের স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন :

"The impulse of love is the fire at the heart of life itself ; it is the voice of all creativeness."[৫১]

রাধাকৃষ্ণনের এই উক্তি, একদিকে প্লেটো অন্যদিকে ফ্রয়েডের উক্তির প্রতিধ্বনি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের কবি বা দার্শনিককে প্রেমতত্ত্বের পরাজ্ঞান অর্জনের জন্যে য়ুরোপীয় মনীষার কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণের অপেক্ষা করতে হয় না। প্রেমচর্চায় ভারত যে স্তরে উপনীত হয়েছিল প্রতীচ্যবাসীর পক্ষে তা ধারণারও অতীত। একথা হ্যাভেলক এলিস অকুণ্ঠভাষায় স্বীকার করে বলেছেন :

"[In India] sexual life has been sanctified and divinised to a greater extent than in any other part of the world. It seems never to have entered into the heads of the Hindu legislators that anything natural could be offensively obscene, a singularity which pervades all their writings, but is no proof of the depravity of their morals. Love in India, both as regards theory and practice, possesses an importance which it is impossible for us even to conceive."[৫২]

ভারতীয় প্রেমাচর্যার এই ঐতিহ্যেই রবীন্দ্রমানস পরিবর্ধিত হয়েছে। রবীন্দ্রজীবনে কাদম্বরী-প্রেম যে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল যে কথা আজ সংশয়াতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু সেই প্রেম-চেতনা যে কবির জীবনীশক্তিরূপে তাঁকে "অনন্তের দিকে বিকশিত করে তুলেছে", এবং পাক থেকে পাকান্তর প্রাপ্ত হয়ে তাই যে কবিজীবনের পরমতত্ত্ব হয়ে উঠেছে, একথাই বর্তমান গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়।

আমরা এই গ্রন্থের মূলসূত্ররূপে পত্রপুটের পনেরো সংখ্যক কবিতা থেকে যে অংশ উদ্ধার করেছি তার তিনটি স্তবকে দেখা যাচ্ছে কবির প্রেমচেতনা সৌন্দর্যচেতনা এবং জীবনদেবতাচেতনার উৎস এক ও অভিন্ন। এই কবিতায় কবি বলছেন, যে-মহীয়সী নারী তাঁর চেতনার নিভৃত গভীরে চিরবিরহের প্রদীপশিখা জ্বেলে রেখেছেন তাঁরই আবির্ভাব ঘটেছে অপরিসীম ধ্যানরূপে কবির সর্বদেহে-মনে। তিনিই পূর্ণতর করেছেন কবিকে, কবির বাণীকে। কবিজীবনে এই মহীয়সী নারী কে, এ বিষয়ে যথার্থ রবীন্দ্র-কাব্য-রসিকের মনে আর সংশয়ের কোন অবকাশ নেই।

এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তাঁর চেতনার নিভৃত গভীরে চির-বিরহের যে প্রদীপশিখা জ্বলছে তারই আলোকে তিনি তাঁর প্রিয়াকে দেখেছেন "অসীম শ্রীলোকে।" আবার "ইতিহাসের সৃষ্টি আসনে" তাঁকেই দেখেছেন "বিধাতার বামপাশে।"

প্রেমের পাত্রীকে "বিধাতার বাম পাশে" দেখার এই বাগ্‌ভঙ্গি অনিবার্য ভাবেই চণ্ডীদাসের বাগ্‌ভঙ্গিকে স্মরণ করিয়ে দেয়—"তুমি বেদবাদিনী, হরের ঘরণী, তুমি সে নয়নের তারা।"

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনা এই স্তরে দান্তে ও চণ্ডীদাসের প্রেমচেতনার

সহোদর। 'যাত্রী' গ্রন্থে প্রেমের বিরহতত্ত্বের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে দান্তে ও চণ্ডীদাসের নাম উচ্চারণ করে বলেছেন,

"বিয়াত্রিচে দান্তের কল্পনাকে যেখানে তরঙ্গিত করে তুলেছে সেখানে বস্তুত একটি অসীম বিরহ। দান্তের হৃদয় আপনার পূর্ণচন্দ্রকে পেয়েছিল বিচ্ছেদের দূর আকাশে। চণ্ডীদাসের সঙ্গে রজকিনী রামীর হয়তো বাহিরের বিচ্ছেদ ছিল না, কিন্তু কবি যেখানে তাকে ডেকে বলছে,

তুমি বেদবাদিনী হরের ঘরণী;
তুমি সে নয়নের তারা—

সেখানে রজকিনী রামী কোন দূরে চলে গেছে তার ঠিক নেই। হোক-না সে নয়নের তারা তবুও যে-নারী বেদবাদিনী, হরের ঘরণী, সে আছে বিরহলোকে।"[৫৩]

পত্রপুটের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নিজের প্রেমের কথা বলতে গিয়ে এই বিরহতত্ত্বকেই ভাষা দিয়েছেন। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অযৌক্তিক হবে না যে, রবীন্দ্রনাথ প্রেমের ক্ষেত্রে দান্তে ও চণ্ডীদাস-গোত্রের কবি। তিনি নিজের সুদীর্ঘ জীবনে প্রেমকে মানুষের চিত্তোৎকর্ষের প্রেরণা-স্বরূপিণী মহাশক্তিরূপেই অনুভব করেছিলেন। Creative Unity গ্রন্থে "কবির ধর্ম" প্রবন্ধে তিনি বলেছেন,

In human nature sexual passion is fiercely individual and destructive, but dominated by the ideal of love, it has been made to flower into a perfection of beauty, becoming into its best expression symbolical of the spiritual truth in man which is his kinship of love with the Infinite.[৫৪]

'Personality' গ্রন্থে 'নারী' প্রবন্ধেও তিনি বলেছেন,

With the growth of man's spiritual life, our worship has become the worship of love.[৫৫]

রবীন্দ্রজীবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কবিমানসে মানসীপ্রেম যেভাবে প্রেমচেতনা সৌন্দর্যচেতনা ও জীবনদেবতাচেতনার বিচিত্র স্তরে নব নব সৌন্দর্য ও মাধুর্যলীলায় বিলসিত হয়েছে তা রবীন্দ্র-কাব্য-রসিকের এক অপূর্ব আস্বাদনের বস্তু।

উল্লেখপঞ্জী

১ দ্রষ্টব্য : 'কাব্যবিচার', শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। পৃ° ১৩৫।

২ ভোজরাজ বলেছেন :

মনোঽনুকূলেষ্বর্থেষু সুখসংবেদনং রতি।
অসম্প্রয়োগবিষয়া সৈব প্রীতির্নিগদ্যতে ॥

সরস্বতীকণ্ঠাভরণ।

৩ Plato : the man and his work, পৃ° ২০৯।

৪ Plato and his Dialogues, পৃ° ১৯৬।

৫ Plato (1) An Introduction. Hans Meyerhoff-এর ইংরেজি অনুবাদ। স° ১৯৫৮। পৃ° ৪৯।

৬ তদেব, পৃ° ৪৪।

৭ Plato and his Dialogues : G. Lowes Dickinson, পৃ° ১৭৭।

৮ ফিড্রাস, জে রাইটের অনুবাদ (১৮৪৮)। দ্রষ্টব্য, এভরিম্যানস লাইব্রেরি গ্রন্থমালার ৪৫৬ সংখ্যক গ্রন্থ Plato: Five Dialogues, পৃ° ২২৬।

৯ Great Dialogues of Plato. [A Mentor Classic গ্রন্থমালা] অনুবাদ W. H. D. Rouse ; পৃ° ৯৭।

১০ তদেব, পৃ° ৯৭।

১১ তদেব, পৃ° ১০১।

১২ তদেব, পৃ° ১০২।

১৩ Five Dialogues, রাইটের পূর্ব-উল্লিখিত অনুবাদ ; পৃ° ২৩৮।

১৪ তদেব, পৃ° ২৪০।

১৫ তদেব, পৃ° ২৪৫-৪৬।

১৬ Plato : the man and his work, পৃ° ৩০৮-৩০৯।

১৭ তদেব, পৃ° ২১৯।

১৮ Great Dialogues of Plato [A Mentor Class], পৃ° ৯৮।

১৯ তদেব, পৃ° ১০১।

২০ তদেব, পৃ° ১০১-১০২।

২১ তদেব, পৃ° ১০৫-১০৬।

২২ দ্রষ্টব্য : তৎপ্রণীত 'মনঃসমীক্ষণ' গ্রন্থ, পৃ° ৸৴০।

২৩ দ্রষ্টব্য : The Basic Writings of Sigmund Freud গ্রন্থে মার্কিন মনঃসমীক্ষক ডক্টর ব্রিলের ভূমিকা, পৃ° ১৫।

২৪ Guide to Modern Thought : C. E. M. Joad, পৃ° ২৫০

২৫ তদেব, পৃ° ২৪৩।

২৬ দ্রষ্টব্য 'মনঃসমীক্ষণ', পৃ° ১৮-১৯।

২৭ The Basic Writings of Sigmund Freud, ভূমিকা, পৃ° ১২।

২৮ তদেব, পৃ° ১২-১৩।

২৯ তদেব, পৃ° ১৬।

৩০ দ্রষ্টব্য : 'স্বপ্ন', গিরীন্দ্রশেখর বসু ; পৃ° ১৯-২২, ৫৪-৫৫। আলোচনার এই অংশ উক্ত গ্রন্থ থেকেই সংকলিত।

৩১ তদেব, পৃ° ৩৭।

৩২ The Basic Writings of Sigmund Freud, পৃ° ১৮-১৯।

৩৩ তদেব, পৃ° ১৬-১৭।

৩৪ দ্রষ্টব্য : স্বপ্ন, অনুচ্ছেদ ৯১-৯৫। এই অংশ উক্ত গ্রন্থ থেকেই সংকলিত হয়েছে।

৩৫ A. M. Krich সম্পাদিত Women গ্রন্থে [A Dell First Edition] হ্যাভেলক এলিসের "The Sexual Impluse and the Art of Love"প্রবন্ধে উদ্ধৃত। দ্রষ্টব্য : উক্ত গ্রন্থের পৃ° ৩০।

৩৬ তদেব, পৃ° ৬১।

৩৭ তদেব, পৃ° ৬৮।

৩৮ তদেব, পৃ° ৬৮।

৩৯ তদেব, পৃ° ৬৯।

৪০ তদেব, পৃ° ৬৪।

৪১ 'Obscure Religious Cults', ১ম স°, পৃ° ১৩৪।

৪২ দ্রষ্টব্য : ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে।' প্রথম সংস্করণ। পৃ° ২৫১-২৫৩।

৪৩ দ্রষ্টব্য : নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত 'বিশ্বকোষ', একবিংশ ভাগ, পৃ° ৩৪৫-৩৪৯।

৪৪ দ্রষ্টব্য : 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ', পৃ° ২৫৩।

৪৫ দ্রষ্টব্য : 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', তৃতীয় অধ্যায়, পৃ° ২৯২, ৩২৩-৩২৪, ৩২৯-৩০, ৩৪০।

৪৬ Obscure Religious Cults, পৃ° ১৪২।

৪৭ দ্রষ্টব্য : শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, পৃ° ২৫৬-২৫৭।

৪৮ Obscure Religious Cults গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ° ১৫৭-৫৮।

৪৯ দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ° ১১১-১২১।

৫০ 'ছিন্নপত্রাবলী', পত্রসংখ্যা ৮, পৃ° ২৫।

৫১ Religion and Society, জর্জ অ্যালেন এণ্ড আনউইন, ১ম সং°, পৃ° ১৪৬।

৫২ Studies in the Psychology of Sex, vi, 129 ; রাধাকৃষ্ণনের 'রিলিজন অ্যাণ্ড সোসাইটি' গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ° ১৪৬।

৫৩ কবিমানসী-১, পৃ° ১৭।

৫৪ ম্যাকমিলন সংস্করণ, ১৯৫৯, পৃ° ৮।

৫৫ ম্যাকমিলন সংস্করণ, ১৯৫৯, পৃ° ১৭৮।

প্রেমচেতনা

কঠোর ব্রত সাধনা স্বরূপে প্রেম সাধনা করা চণ্ডীদাসের ভাব, সে ভাব তাঁহার সময়কার লোকের মনোভাব নহে, সে ভাব এখনকার সময়ের ভাবও নহে, সে ভাবের কাল ভবিষ্যতে আসিবে। যখন প্রেমের জগৎ হইবে, যখন প্রেম বিতরণ করাই জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে ; পূর্বে যেমন যে যত বলিষ্ঠ ছিল সে ততই গণ্য হইত, তেমনি এমন সময় যখন আসিবে, যখন যে যত প্রেমিক হইবে সে ততই আদর্শস্থল হইবে, যাহার হৃদয়ে অধিক স্থান থাকিবে, যে যত অধিক লোককে হৃদয়ে প্রেমের প্রজা করিয়া রাখিতে পারিবে সে ততই ধনী বলিয়া খ্যাত হইবে, যখন হৃদয়ের দ্বার দিবারাত্রি উদ্ঘাটিত থাকিবে ও কোন অতিথি রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া না যাইবে, তখন কবিরা গাহিবেন,

পিরীতি নগরে বসতি করিব,
পিরীতে বাঁধিব ঘর,
পিরীতি দেখিয়া পড়শি করিব,
তা বিনু সকলি পর।

[চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি, ফাল্গুন ১২৮৮]

প্রথম অধ্যায়

কৈশোর-যৌবনের সন্ধিলগ্নে প্রেমচিন্তা

১

রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বনফুলে' কবি চোদ্দ বৎসর বয়সে প্রেমের মন্দিরে এক ষোড়শী প্রতিমা রচনা করেছিলেন। বনবালা কমলা। হিমালয়ের অরণ্যশিখর থেকে এই পিতৃমাতৃহীনা বনবালিকাকে বিজয় মানুষের সংসারে নিয়ে এসেছিল। কমলা একাধারে রবীন্দ্রনাথের মিরাণ্ডা, শকুন্তলা ও কপালকুণ্ডলা। বিজয় তাকে বিবাহ করেছিল। কিন্তু বিজয়ের বন্ধু কবি নীরদ ভালবাসল কমলাকে। কমলাও ভালবাসল নীরদকে। অবশ্য উভয়তই সে ভালবাসা নীরব। কিন্তু সেই অপরাধে বিজয় বন্ধুকে চিরদিনের মত তার গৃহ ত্যাগ করে চলে যেতে বলল। বন্ধুকর্তৃক তিরস্কৃত নীরদ যখন সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হবার সংকল্প নিয়ে কমলার কাছে শেষ-বিদায় নিচ্ছে তখন কমলা দলিতা ফণিনীর মত উদ্যতফণা হয়ে বলছে, আমি তোমাকে ভালবাসি বলে নিষ্ঠুর বিজয় তোমাকে দূর করে দিয়েছে। এ প্রেম এ হৃদয় আমি বিস্মৃতি-সলিলে বিসর্জন দেব। কিন্তু তবু কি বিজয় আমার ভালবাসা পাবে ?—

> পদতলে পড়ি মোর, দেহ কর ক্ষয়—
> তবু কি পারিবি চিত্ত করিবারে জয় ?[১]

তেরো-চোদ্দ বৎসর বয়সের বালকের রচনা এটি। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে নারীকণ্ঠে উচ্চারিত বলিষ্ঠতম উক্তি কমলার মুখেই শোনা গেল। 'বনফুলে'র কাহিনীতে আছে, সন্ন্যাসব্রতধারী নীরদ একটু অগ্রসর হতে না হতেই বিজয়ের প্রতিহিংসাপ্রমত্ত ছোরার গুপ্ত আঘাতে সে নিহত হল। শ্মশানে নীরদের মৃত্যুশিয়রে দাঁড়িয়ে কমলা নিজেকে বলছে 'বিধবা'।—"আজিকে কমলা যে রে হয়েছে বিধবা"। অর্থাৎ, চোদ্দ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ প্রেমের মিলনকেই বলছেন বিবাহ। প্রেমহীন সামাজিক দাম্পত্য-বন্ধনকে তিনি স্বীকার করেন নি। বলাই বাহুল্য, এটি নিতান্তই একটি বালকের কল্পনা, কিন্তু কল্পনাটি যে বিস্ময়কর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কবিপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের যাত্রারম্ভে তাঁর কবিমানসের এই পরিচয়ও কম বিস্ময়কর নয় !

২

রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনা আজীবন মুক্তত্রিবেণীতে প্রবহমান। বস্তু বা বিষয়নিষ্ঠ প্রেম, আত্মনিষ্ঠ প্রেম এবং প্রেমনিষ্ঠ প্রেম। ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের ভাষায় বিষয়-রতি [object-love], স্বরতি বা আত্মরতি [Narcissism] এবং স্বতঃরতি [Auto-eroticism]। রবীন্দ্রকবিমানসে মন্দাকিনী ভাগীরথী ও ভোগবতীর মত এই ত্রিপথগা প্রেমপ্রবাহিণীর গতিপথ নির্ণয় সহজসাধ্য নয়। আমাদের আলোচনা মুখ্যত রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা এবং ক্বচিৎ-কখনো তাঁর গানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু গঙ্গোত্রীমুখে স্বর্গ ও মর্তের সংগমস্থলে সে প্রেমের স্বরূপ কি ছিল তা জানবার জন্যে একুশ বৎসর বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রেমচিন্তার সঙ্গে প্রথমে পরিচিত হওয়া অত্যাবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কবি; কিন্তু পদ্যবন্ধে নয়, গদ্যবন্ধেই তাঁর প্রথম সার্থক আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। কবিতারচনায় যখন 'কপিবুক যুগের চৌকাঠ' পেরোনো সম্ভব হয় নি, তখনকার গদ্যরচনায় কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বাক্ষর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাই সে যুগের গদ্যরচনার মধ্যেই কবিমানসের অস্খলিত পদচারণা পরিলক্ষণীয়।

সতেরো থেকে একুশ বৎসরের মধ্যে কবিচিত্তে প্রেমচেতনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বাহন হিসাবে নিম্নলিখিত রচনাগুলি অনুধাবনযোগ্য : 'বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য', 'পিত্রার্কা ও লরা' এবং 'গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ' যথাক্রমে ১২৮৫ সালের 'ভারতী'তে আশ্বিন, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' তাঁর অষ্টাদশ বৎসর বয়সের রচনা। 'অকারণ কষ্ট' বেরোয় ১২৮৭ সালের আশ্বিন মাসের ভারতীতে। 'যথার্থ দোসর' এবং 'গোলাম চোর' যথাক্রমে ১২৮৮ সালের 'ভারতী'র জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। শ্রাবণ থেকে পরবর্তী [১২৮৯] বৈশাখ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র কাব্যসুরভিত নিবন্ধগুলি। 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি'র প্রকাশ ১২৮৮ সালের ফাল্গুনে। এই রচনাপঞ্জী লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এর আদিতে রয়েছে দান্তের প্রেম আর অন্তিমে চণ্ডীদাসের। অর্থাৎ শুধু প্রেম নয়, আদর্শ প্রেমের অনুধ্যানেই অতিবাহিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিলগ্ন।

বলাই বাহুল্য, দান্তে ও পেত্রার্কার প্রেম ক্রবাতুর-প্রেমেরই পরাকাষ্ঠা। দান্তের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "ইতালির এই স্বপ্নময় কবির জীবনগ্রন্থের প্রথম অধ্যায় হইতে শেষ পর্যন্ত বিয়াত্রীচে। বিয়াত্রীচেই তাঁহার সমুদয় কাব্যের নায়িকা; বিয়াত্রীচেই তাঁহার জীবনকাব্যের নায়িকা।

"দান্তে তাঁহার নয় বৎসর হইতেই বিয়াত্রীচেকে ভালবাসিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহার প্রেম সাধারণ ভালবাসা নামে অভিহিত হইতে পারে না। বিয়াত্রীচের সহিত তাঁহার প্রেমের আদান প্রদান হয় নাই, নেত্রে নেত্রে নীরব প্রেমের উত্তর প্রত্যুত্তর হয় নাই। অতিদূর সাক্ষাৎ—দূর আলাপ ভিন্ন বিয়াত্রীচের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও আলাপ হয় নাই। অতিদূরস্থ দেবীর ন্যায় তিনি দূর হইতে সসম্ভ্রমে বিয়াত্রীচেকে দেখিতেন; অতিদূর হইতে তাঁহার গ্রীবানমিত নমস্কারে আপনাকে দেবানুগৃহীত মনে করিতেন।...

"ভিটানুওভা কাব্যে দান্তের প্রেমের কাহিনী পড়িলে মনে হয় না, দান্তে বাহিরের কোন বিষয়ে লিপ্ত ছিলেন—মনে হয় তাঁহার চক্ষে সমুদয় জগতের সমষ্টি বিয়াত্রীচে, সংসারে আর কিছু নাই কেবল বিয়াত্রীচে, এ সংসারে আর কিছু করিবার নাই—কেবল বিয়াত্রীচের আরাধনা।"[২]

বেয়াত্রিচের প্রতি দান্তের এই স্বপ্নোপম প্রেম, এই দেহাতীত মনোবৃত্তিময়ী রতিকে রবীন্দ্রনাথের এত ভাল লেগেছিল তার কারণ এই যে, রবীন্দ্রমানসের কৈশোরানুরাগও ছিল তারই সহোদর। শুধু কৈশোরলগ্নেই নয়, অপ্রাপণীয়া মানসসুন্দরীর জাগর-স্বপ্নে তাঁর সমস্ত জীবনই অতিবাহিত হয়েছে।

দান্তের সঙ্গে একই নিশ্বাসে রবীন্দ্রনাথ পেত্রার্কার নাম করেছেন। তিনি বলেছেন, "দান্তের যেমন বিয়াত্রীচে, পিত্রার্কার তেমনি লরা। দান্তের ন্যায় তাঁহার লরাও অপ্রাপ্য অনধিগম্য। দান্তের ন্যায় তিনি দূর হইতে লরাকে দেখিয়াই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। পিত্রার্কারও লরার সহিত তেমন ভাল কথাবার্তা আলাপ-পরিচয় হয় নাই। লরার ভবনে পিত্রার্কা কখনও যাইতে পান নাই, লরার নিকট হইতে তাঁহার প্রেমের বিন্দুমাত্র প্রত্যুপহার পান নাই। * * * লরার যৌবনের অবসান, লরার মৃত্যু, তাঁহার প্রতি লরার ঔদাসীন্য কিছুই তাঁহার মহান-প্রেমকে বিচলিত করিতে পারে নাই। বরঞ্চ লরার মৃত্যু তাঁহার প্রেমকে নূতন বল অর্পণ করে, কেন না এ পৃথিবীতে লরার সহিত তাঁহার সম্পর্ক অতি দূর ছিল, কিন্তু লরা যখন দেহের সহিত সমাজ-বন্ধন

পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তখন পিত্রার্কা অসংকোচে লরার আত্মার চরণে তাঁহার প্রেম উপহার দিতেন ও লরা তাহা অসংকোচে গ্রহণ করিতেছেন কল্পনা করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন।"[৩]

ইতালীয় রেনেসাঁসের অব্যবহিত পূর্বে খ্রীস্টভক্ত দান্তে 'ডিভাইন কমেডি'তে প্রেমের দিব্য-সংগীত রচনা করে গেছেন, আর ইতালীয় রেনেসাঁসের কবিপুরুষ পেত্রার্কা তাঁর মানসসুন্দরী লরার প্রেমে অভিষিক্ত সনেটরাজি উপহার দিয়াছেন নবজন্মোত্তর য়ুরোপকে। পেত্রার্কার সনেট-কলাকৃতির মধ্যে বিধৃত মর্ত্যপ্রেমই আধুনিক য়ুরোপীয় প্রেমমন্দাকিনীর আদি-গঙ্গোত্রী। রবীন্দ্র-মানসে দান্তে ও পেত্রার্কার এই মণিকাঞ্চনযোগে তাঁর প্রেমচেতনা স্বর্গমর্তের রাখীবন্ধনে বাঁধা পড়েছে।

জার্মানির মহাকবি গেটের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল অন্য জগতের। উভয়ের মধ্যে আত্মার আত্মীয়তা। পূর্ণমানবতার ধ্যানে উভয় কবিই সমপ্রাণ। একজন বিদগ্ধ সমালোচকের ভাষায় "Both he and Tagore worship at the shrine of the Universal Man,..."[৪] কিন্তু কৈশোর-যৌবনের সন্ধিলগ্নে রবীন্দ্রনাথ গেটের প্রেম-চেতনার প্রতি তেমন ভাবে আকৃষ্ট হন নি। দান্তে ও পেত্রার্কার তুলনায় গেটের নিষ্ঠাহীন চলচ্চিত্ততা কিশোর রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছে। তিনি বলেছেন, "দান্তে ও পিত্রার্কার প্রেম প্রেমের আদর্শ, আর গেটের প্রেম পার্থিব অর্থাৎ সাধারণ। শুদ্ধ যে গেটের দুর্বল প্রেম নিরাশা ও উপেক্ষা সহিয়াই স্থির থাকিতে পারে না এমন নহে, সে প্রেমের প্রধান স্বভাব এই যে, তাহার আশা পূর্ণ হইলেই সে আর থাকিতে পারে না। গেটের প্রেম এক দ্বারে নিরাশ হইলে অমনি আরেক দ্বারে যাইত, আবার আশা পূর্ণ হইলেও থাকিত না।··

"গেটে কহেন, বাল্যকালে তিনি ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া দেখিতেন তাহা কিরূপে সজ্জিত আছে, পাখির পালক ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া দেখিতেন তাহা ডানার উপরে কিরূপে গ্রথিত আছে। বেটিনা তাঁহার প্রণয়িনীদের মধ্যে একজন। তিনি বলেন রমণীর হৃদয় লইয়াও গেটে সেইরূপ করিয়া দেখিতেন। তিনি তাঁহাদের প্রেম উদ্রেক করিতেন এবং প্রেম-কাহিনী সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য কল্পনার সাহায্যে নিজেও কিয়ৎ-পরিমাণে প্রেম অনুভব করিতেন, কিন্তু সে প্রেম তাঁহার ইচ্ছাধীন, প্রয়োজন

অতীত হইলেই সে প্রেম দূর করিতে তাঁহার বড় একটা কষ্ট পাইতে হয় নাই।"[৫]

গেটে-মানসে বিলসিত প্রেমচেতনা সম্পর্কে কবি-কিশোর এখানে সুবিচার করেছেন বলে মনে হয় না। 'ব্রাদারস কারামাঝভে' ডস্টয়েভস্কি বলেছিলেন, "Beauty is the battlefield where God and the Devil contend with one another for the heart of man."[৬] গেটের মানসলোকে দেবতা ও শয়তানের এই দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত। শেলিকে বলা হয় 'আধুনিক প্রমিথিউস', গেটেকেও বলা যেতে পারে 'আধুনিক ফাউস্ট'। দুজনেই আজন্ম বিপ্লবী। গেটের ফাউস্টের মত তাঁর ব্যক্তিজীবনেও দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্ব কম বিস্ময়কর নয়। দেহ-কারাগারে বন্দী মানবাত্মা 'কত ছোট' অথচ 'কত বড়' ;—মানবজীবনের এই রহস্য শুধু ফাউস্টেরই আবিষ্কার নয়, গেটের ব্যক্তিজীবনেরও উপলব্ধি। গেটের দৃষ্টিতে মানবজীবনের এই রহস্য বিশ্লেষণ করে একজন সমালোচক বলেছেন :

"Man is a rebel...because, made in the likeness of God, he has godlike potentialities always at war with the confining body····. Man's spirit and intellect have consquently to be curtailed in the match-box standard, except in those few experiences of ecstasy that are possible in a life-time—for some through a mystical religious illumination ; for others, through physical love in its very rare moments of perfect communion. That man should be at once so great and so small is the root of the human tragedy.'[৭]

রবীন্দ্রনাথের কিশোর-মানসে দেহ ও আত্মার এই অনিঃশেষ সংগ্রামের ইতিহাস অপরিজ্ঞাত ছিল। তাই তিনি গেটের বিচিত্র প্রেমের কাহিনীগুলির প্রতি সুবিচার করতে পারেন নি। অথবা প্রেমচেতনায় রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই 'দেহের ক্ষুদ্রতা'র দ্বারা উৎপীড়িত হননি বলেই গেটের মানসলোকে সৌন্দর্য ও প্রেমকে নিয়ে দেবতা ও শয়তানের সংগ্রাম তাঁর কাছে চিরদিনই অজ্ঞাত রয়েছে।

৩

কবিকিশোরের প্রেমচেতনার আলোচনায় "যথার্থ দোসর" প্রবন্ধটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা কবিমানসীর প্রথম খণ্ডে ১৮০-১৮২ পৃষ্ঠায় এই প্রবন্ধ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি সংকলন করেছি। প্রেমের ক্ষেত্রে এই দোসরতত্ত্ব প্লেটোর 'ফিড্রাস' শীর্ষক 'ডায়লগে' এরিস্টোফেনিস-প্রোক্ত দোসরতত্ত্বেরই সহোদর। "যথার্থ দোসর" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "প্রেম একটি পাত্র অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে।...একটি হৃদয়ের জন্য একটি হৃদয় গঠিত হইয়া আছেই। তাহারা পরস্পরের জন্য। শতক্রোশ ব্যবধানে, এমন কি, জগৎ হইতে জগতান্তরের ব্যবধানেও তাহাদের মধ্যে একটা আকর্ষণ থাকে। তাহাদের মধ্যে দেখাশুনা হউক বা না হউক, জানাশুনা থাকুক বা না থাকুক, তাহাদের উভয়ের মধ্যে যেমন সম্বন্ধ, তেমন কোন দুই পরিচিত ব্যক্তির, কোন দুই বন্ধুর মধ্যে নাই। ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাহারা বিচ্ছিন্ন, কিন্তু তাহারা বিবাহিত। তাহাদের অনন্ত দাম্পত্য।....দুই একটি করিয়া হৃদয় আছে, প্রকৃতি নিজে পৌরোহিত্য করিয়া যাহাদের বিবাহ দিয়াছেন। তাহাদের বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। হৃদয় যে একটি প্রেমের পাত্র চায়, সে প্রেমের পাত্র আর কেহ নহে, সেই নির্দিষ্ট হৃদয়।"[৮]

এই 'নির্দিষ্ট হৃদয়', এই 'যথার্থ দোসরে'র সন্ধান মানুষকে করতেই হবে। যতক্ষণ না সেই দোসরের সন্ধান পাওয়া গেছে ততক্ষণ তার সঙ্গে যার কোন বিষয়ে মিল আছে, তার প্রতিই প্রেমিক আকৃষ্ট হয়। এই ভাবেই পাত্র থেকে পাত্রান্তরে চলে সেই সন্ধান। অবশেষে একদিন তার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। কেন না, "এ জগৎ মিত্রাক্ষরের কবিতা।" তাই যথার্থ দোসরের সঙ্গে একদিন মিলন হবেই। প্রেমিকের হৃদয়কে শুধু তার জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "হৃদয়ে সেই দোসরের একটি অশরীরী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকেই ভালবাস, তাহার সহিত কথোপকথন কর। তাহাকে বল, হে আমার প্রাণের দোসর, আমার হৃদয়ের হৃদয়, আমি সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, কবে তুমি আসিবে? এ সিংহাসনে যদি আর কাহাকেও বসাইয়া থাকি, তবে তাহা ভ্রমক্রমে হইয়াছে; কিছুতেই সন্তোষ হয় নাই, কিছুতেই তৃপ্তি হয় নাই, তাই তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি।"[৯]

যথার্থ দোসরের জন্তে হৃদয়ে সিংহাসন প্রস্তুত করে রাখার রূপকল্পটি বিশদীভূত হয়েছে 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র রচনামালায়। 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র শুরুতেই 'মনের বাগান-বাড়ি'তে কবি তাঁর একুশ বৎসর বয়সের প্রেমচেতনাকে বিশ্লেষণ করে বলেছেন, "ভালবাসা অর্থে আত্মসমর্পণ নহে। ভালবাসা অর্থে নিজের যাহা কিছু ভাল তাহাই সমর্পণ করা। হৃদয়ে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা নহে; হৃদয়ের যেখানে দেবত্রভূমি, যেখানে মন্দির, সেইখানে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা।"[১০]

তরুণ কবির এই উক্তি তাঁর মানসবিশ্লেষণের সময় বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে। হৃদয়ে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করাই যথেষ্ট নয়, হৃদয়ের যেখানে দেবত্রভূমি, যেখানে মন্দির, সেখানে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা চাই। তিনি 'মনের বাগান-বাড়ি'র কল্পনাটিকে স্ফুটতর করে বলেছেন, "এমন এক একজনকে আমার চোখের সামনে আমার মনের প্রতিবেশী করিয়া রাখা উচিত, যে আমার আদর্শ মনুষ্য। সে যে সত্যকার আদর্শ মনুষ্য এমন না হইতে পারে; তাহার মনের যতটুকু আদর্শ ভাব সেইটুকুই সে আমার কাছে প্রকাশ করিয়াছে।....আমি তাহার নিকট আদর্শ, সে আমার নিকট আদর্শ। আমার মনের বাগনবাড়ি তাহার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছি, সে তাহার বাগানটি আমার জন্য রাখিয়াছে।"[১১]

বাস্তব জগতে হয়তো সত্যকার আদর্শ মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু প্রেম আদর্শ মানুষকে সৃষ্টি করে। প্রেমের দৃষ্টিই সত্য দৃষ্টি, তাই রবীন্দ্রনাথ অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণের মত অনুরাগবীক্ষণ বলে একটি নূতন শব্দ রচনা করেছেন। অনুরাগের চোখে দেখার নামই অনুরাগবীক্ষণ। এই অনুরাগবীক্ষণে সামান্যও অসামান্য হয়ে ওঠে। সহজিয়া বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে যেমন রূপের মধ্যেই স্বরূপের আরোপ হয়, তেমনি অনুরাগের দৃষ্টিতে বাস্তব আদর্শান্বিত হয়ে দেখা দেয়। এই ভাবেই সংসারে প্রেমের রাজ্যে 'আদর্শ ভাবের চর্চা' হয়ে থাকে। ভালবাসা যে আদর্শ জীবনচর্যারই নামান্তর 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র লেখক তাই প্রতিষ্ঠা করলেন। এইভাবে কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিলগ্নে আদর্শ প্রেমের উচ্চগ্রামেই রবীন্দ্রহৃদয়ের সুর বাঁধা হয়েছে। সমকালীন কাব্য-কবিতায় তার প্রতিফলন কতখানি সার্থক হয়েছে এবার তা বিচার করে দেখতে হবে।

উল্লেখপঞ্জী

১ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ-১, পৃ° ৯৪।

২ কবিমানসী-১; পৃ° ১০২।

৩ তদেব, পৃ° ১০৩।

৪ 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: এ সেন্টিনারি ভল্যুম' গ্রন্থে অধ্যাপক তারকনাথ সেন, পৃ° ২৭৭।

৫ কবিমানসী-১, পৃ° ১০৫।

৬ জ্যাক্ মারিতাঁ লিখিত Creative Intuition in Art and Poetry গ্রন্থে উদ্ধৃত। দ্র°, উক্ত গ্রন্থ [মেরিডিয়ান বুকস স°], পৃ° ৩১৪।

৭ A. C. Ward, Landmarks in Western Literature, পৃ° ১৩৭।

৮ কবিমানসী-১; পৃ° ১৮১।

৯ তদেব, পৃ° ১৮২।

১০ তদেব, পৃ° ১৮৫।

১১ তদেব, পৃ° ১৮৫।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নলিনী : অস্ফুট কলিকা

১

আনা তরখড়কে আমরা বলেছি রবীন্দ্রজীবনের কৈশোরলগ্নের ক্ষণিকা মায়ানায়িকা।[১] বলেছি, কবিকিশোরের এই ঈষৎ-প্রগল্‌ভা নায়িকা কবির হাত ধরে তাঁকে কৈশোর-যৌবনের সন্ধিলগ্নের সিংহদ্বার উত্তীর্ণ করে দিয়েছিলেন। সতেরো বৎসর বয়স পেরিয়ে প্রথমবার বিলাত যাত্রার পথে বম্বেতে মাত্র দু মাসের জন্যে [১৮৭৮ সনের জুলাইয়ের শেষার্ধ থেকে সেপ্টেম্বরের বিশে পর্যন্ত] তরুণী আনার গৃহবিদ্যার্থী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে তিনি বলছেন, "সে মেয়েটিকে আমি ভুলি নি বা তার সে আকর্ষণকে কোন লঘু লেবেল মেরে খাটো করে দেখি নি কোনদিন।"[২] শুধু আনা সম্পর্কেই নয়, কবিজীবনের নানা পর্বে যে-সব মেয়েরা এসেছেন তাঁদের সবার কথাই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে কবি বলছেন, "আমার জীবনে তারপরে নানান অভিজ্ঞতার আলোছায়া খেলে গেছে—বিধাতা ঘটিয়েছেন কত যে অঘটন—কিন্তু আমি একটা কথা বলতে পারি গৌরব করে যে. কোনো মেয়ের ভালবাসাকে আমি কখনো ভুলেও অবজ্ঞার চোখে দেখি নি—তা সে ভালবাসা যে-রকমই হোক না কেন। প্রতি মেয়ের স্নেহ বল, প্রীতি বল, প্রেম বল, আমার মনে হয়েছে একটা প্রসাদ—Fabour : কারণ আমি এটা বারবারই উপলব্ধি করেছি যে প্রতি মেয়ের ভালবাসা, তা সে যে রকমের ভালবাসাই হোক্ না কেন—আমাদের মনের বনে কিছু-না-কিছু আফোটা ফুল ফুটিয়ে রেখে যায়—সে ফুল হয়তো পরে ঝরে যায় কিন্তু তার গন্ধ যায় না মিলিয়ে।"[৩] রবীন্দ্রমানসে প্রেমের বিচিত্র আলো-ছায়ার লীলা আস্বাদানের দিক দিয়ে কবির এই মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য বলে মনে করি।

আনা সম্পর্কে কবির অনুরাগ অনবদ্য ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে আশি বৎসর বয়সে লেখা 'ছেলেবেলা'র উপান্ত পরিচ্ছেদের শেষাংশে। 'বিদেশী পাখি' হয়েছে তার উপমান। কবি বলছেন, কোন কোন বছরে বিদেশী পাখিরা

এসে হঠাৎ বাসা বাঁধে বটগাছে। তাদের ডানার নাচ চিনে নিতে নিতেই তারা চলে যায়। তারা অজানা সুর নিয়ে আসে দূরের বন থেকে। কবিজীবনে আনাও ওই বিদেশী পাখির মতই হঠাৎ একদিন এসেছিলেন। জগতের অচেনা মহল থেকে আপন মানুষের দূতী তিনি। হৃদয়ের দখলের সীমানা বড় করে দিয়ে গিয়েছিলেন। বরাবরের মত দিনরাত্রির দাম দিয়েছিলেন বাড়িয়ে। না ডাকতেই এসেছিলেন তিনি, শেষকালে একদিন ডেকে আর তাঁকে পাওয়া গেল না।

২

'ছেলেবেলা'য় রবীন্দ্রনাথ আরও বলছেন, "কবির কাছ থেকে একটা ডাকনাম চাইলেন, দিলেম জুগিয়ে—সেটা ভালো লাগল তাঁর কানে। ইচ্ছে করেছিলেন সেই নামটি আমার কবিতার ছন্দে জড়িয়ে দিতে। বেঁধে দিলুম সেটাকে কাব্যের গাঁথুনিতে; শুনলেন সেটা ভোরবেলাকার ভৈরবী সুরে; বললেন, 'কবি, তোমার গান শুনলে আমি বোধ হয় আমার মরণ দিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি'।"[৪]

রবীন্দ্রনাথ আনার নাম দিয়েছিলেন নলিনী। আনা নলিনী-নামকেই তাঁর সারস্বত জীবনের নাম-পরিচয়-রূপে গ্রহণ করেছিলেন। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন ভাষায় তিনি যে-সব গদ্য ও কবিতা রচনা করে গিয়েছেন সেগুলি নলিনী-নামেই প্রকাশিত হয়েছে।

নলিনী ছিল রবীন্দ্রনাথের 'কবিকাহিনী'র নায়িকা। কবির ষোলো বৎসরের সেই স্বপ্নই যেন মূর্ত হয়ে উঠল আনার মধ্যে। তাই আনা হল রবীন্দ্র-জীবনের নলিনী। 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত কবিকাহিনীর সর্গ চারিটি রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রথমে অনুবাদ করে, পরে মূল বাংলাতেই, রবীন্দ্রনাথ কবিকাহিনী পড়ে শোনাতেন আনাকে। ধীরে ধীরে কবিকাহিনীর নলিনী আর আনার মধ্যে ব্যবধান ঘুচে গেল। নলিনীই হল আনা, আনা নলিনী। কবিস্বপ্নকে এভাবে বাস্তব সত্যে রূপান্তরিত হতে দেখা কবিজীবনের পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে।

'শৈশব-সংগীতে'র "প্রভাতী" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বপ্নাচ্ছন্ন নবানুরাগকে ভাষা দিয়ে বললেন :

শুন, নলিনী খোল গো আঁখি,
ঘুম এখনো ভাঙ্গিল না কি !
দেখ, তোমারি দুয়ার 'পরে
সখি এসেছে তোমারি রবি।

এই ঘুম-ভাঙানিয়া গানই রবীন্দ্রজীবনের প্রথম প্রেমসংগীত ; আর, বলাই বাহুল্য, এই ঘুম-ভাঙানিয়া গানই রবীন্দ্রনাথের জীবনসংগীত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রবি-নামটির তাৎপর্য ও মহিমা সম্পর্কে চিরদিনই সচেতন ছিলেন। "প্রভাতী"র তরুণ রবি বলছেন :

শুনি, প্রভাতের গাথা মোর
দেখ ভেঙেছে ঘুমের ঘোর,
দেখ জগৎ উঠেছে নয়ন মেলিয়া
নূতন জীবন লভি।

রবির প্রভাতী সংগীতে জগৎ নূতন জীবন লাভ করে নয়ন মেলেছে, এই চেতনা কবিপ্রেমিকের প্রেমকে বিশ্বজীবনের পটভূমিতে বিন্যস্ত করেছে। কবি বলছেন, তিনি "নবজীবনের গান" গাইবেন। সেই নবজীবনের গানের সুরে তাঁর নলিনীরও ঘুম ভাঙুক—এই তাঁর ঐকান্তিক কামনা। এই প্রেমময় নূতন জীবনের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতিও তার সুর মেলাবে—

প্রভাত জলদ, প্রভাত সমীর,
প্রভাত বিহগ, প্রভাত শিশির
সমস্বরে তারা সকলে মিলিয়া
মিশাবে মধুর তান !

এখানেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাতী প্রেম-সংগীতের বৈশিষ্ট্য। বিশ্বের ঐকতান-সংগীতের সঙ্গে তার সুর বাঁধা। শুধু তাই নয়, প্রেমের সেই নবজাগরণে যে সৌন্দর্যের জন্ম হয় বিশ্বপ্রকৃতির দর্পণেই চিনে নিতে হয় তাকে। তাই "প্রভাতী"র শেষ স্তবকে কবি বলছেন :

সখি, শিশিরে মুখানি মাজি,
সখি, লোহিত বসনে সাজি,
দেখ বিমল সরসী আরসীর 'পরে
অপরূপ রূপরাশি।
তবে, থেকে থেকে ধীরে নুইয়া পড়িয়া,
নিজ মুখছায়া আধেক হেরিয়া,
ললিত অধরে উঠিবে ফুটিয়া
সরমের মৃদু হাসি।

পূর্বরাগরঞ্জিত কবিদৃষ্টিতে প্রিয়ার ললিত অধরে সরমের মৃদু হাসিটি দেখেই কিশোরচিত্ত পরিতৃপ্ত হয়েছে।

'রবিচ্ছায়া'র "আমি স্বপনে রয়েছি ভোর" গানটি নলিনীর পক্ষ থেকে প্রভাতী আহ্বানেরই উত্তর বলে মনে হয়। নলিনী বলছে, সে তার ভোরের পাখির অপেক্ষায় আছে, কখন তার সাধের পাখিটি এসে তার নাম ধরে ডেকে তাকে জাগিয়ে যাবে।—

আমি স্বপনে রয়েছি ভোর,
সখী, আমারে জাগায়ো না।
আমার সাধের পাখি
যারে নয়নে নয়নে রাখি
তারি স্বপনে রয়েছি ভোর,
আমার স্বপন ভাঙায়ো না।

*   *   *

আমার কপোল ভরে
শিশির পড়িবে ঝরে—
নয়নেতে জল, অধরেতে হাসি,
মরমে রহিব মরে।
তাহারি স্বপনে আজি মুদিয়া রয়েছি আঁখি—
কখন আসিবে প্রাতে আমার সাধের পাখি,
কখন জাগাবে মোরে আমার নামটি ডাকি'॥

এই দুটি কবিতা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হয়ে কবিকিশোরের

প্রেমচেতনাকে পূর্ণতা দান করেছে। সে প্রেমের স্বরূপ হল রবির অলোয় চিৎশতদলের উন্মীলন ; এবং সেই উন্মীলনেরই অন্য নাম জাগরণ।

৩

পূর্বেই বলা হয়েছে, ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসের শেষার্ধ থেকে সেপ্টেম্বরের তিন সপ্তাহ,—এই দু মাস রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বম্বেতে তরখড়-পরিবারের অতিথি হয়ে। অর্থাৎ ১২৮৫ সালের শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহ থেকে আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত। এই সময় এবং তার অব্যবহিত পরে রবীন্দ্রনাথের যে-সকল কাব্যকবিতা প্রকাশিত হয়েছে তার সঙ্গে পরিচিত হলে কবিমানসে নলিনীর প্রভাবের খানিকটা আভাস পাওয়া যাবে। ১২৮৫ বঙ্গাব্দে কয়েক মাসের ব্যবধানে 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথের তিনটি গাথা-কাব্য প্রকাশিত হয়। আশ্বিনে 'লীলা', কার্তিকে 'ফুলবালা', এবং ফাল্গুনে 'অপ্সরা-প্রেম'। 'লীলা' গাথা-কাব্যে বিজয় রণধীর ও লীলার বিয়োগান্ত প্রেমের ত্রিভুজ-কাহিনী রচিত হয়েছে। 'ফুলবালা'য় আছে সাধারণভাবে ফুলবালাদের প্রেমের কাহিনী, এবং বিশেষভাবে অশোক-মালতীর প্রেমকথা। আনা তরখড় কবিমানসে যে কুসুমিত রাজ্যের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন তারই সার্থক কাব্যরূপ 'ফুলবালা'। 'অপ্সরা-প্রেম'ও প্রেমকাব্য। গাথা কবিতার তির্যক-ভাষণে নায়ক-নায়িকা ও অপ্সরার উক্তি ও গানের মধ্য দিয়ে যে প্রেম ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে তার মধ্যে তরুণ কবিচিত্তের কবোষ্ণ স্পর্শ পাওয়া যায়।

কিন্তু 'শৈশব-সংগীতে'র "ফুলের ধ্যান" কবিতাটিতে নলিনীর সঙ্গে প্রভাতরবির সম্পর্কটি ফুলের স্বগতোক্তিতে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। ফুল বলছে :

মুদিয়া আঁখির পাতা
কিশলয়ে ঢাকি মাথা,
উষার ধেয়ানে রয়েছি মগন
রবির প্রতিমা স্মরি,
এমনি করিয়া ধেয়ান ধরিয়া

কাটাইব বিভাবরী !
দেখিতেছি শুধু ঊষার স্বপন,
তরুণ রবির তরুণ কিরণ,
তরুণ রবির অরুণ চরণ
জাগিছে হৃদয় 'পরি,
তাহাই স্মরিয়া ধেয়ান ধরিয়া
কাটাইব বিভাবরী।

তারপর ভোরবেলা রবির চুম্বনে ফুলের ভাঙবে ঘুম। তখন

ঊষা-রূপসীর কপোলের চেয়ে
কপোল হইবে রাঙ্গা।
তখন আসিবে বায়,
ফিরিতে হবে না তায়,
হৃদয় ঢালিয়া দিব বিলাইয়া,
যত পরিমল চায়।
ভ্রমর আসিবে দ্বারে,
কাঁদিতে হবে না তারে,
পাশে বসাইয়া আশা পূরাইয়া
মধু দিব ভারে ভারে।

অর্থাৎ পুষ্পজীবনে অরুণ রবির আহ্বান তার আত্মবিকাশেরই আহ্বান। সেই আত্মবিকাশের আনন্দে তার মর্মকোষে যে সুরভি ও মধু সঞ্চিত হবে, সৌরভচয়নকারী সমীরণ আর মধুলোভী ভ্রমরকে তা অকাতরে বিলিয়ে দিয়েই সে পাবে তার পরম সার্থকতা।

৪

আমরা বলেছি আনা কবিমানসের কুসুমিত রাজ্যের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। সেই মুক্তদ্বার পথে আমরা নলিনীর অমলিন সৌন্দর্য লক্ষ্য করেছি। কিন্তু কবিমানসের কুসুমকাননে শুধু নলিনীরই একাধিপত্য নেই। সেখানে গোলাপেরও একটি বড় আসন রয়েছে। 'ফুলবালা' গাথায় অশোকের একটি

গান রয়েছে। সে গানটি 'কৈশোরকে' এবং 'রবিচ্ছায়া'য় স্থান পেয়েছে। গানটি এখানে উদ্ধারযোগ্য :

গোলাপ ফুল—ফুটিয়ে আছে
মধুপ হোথা যাস্ নে—
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে
কাঁটার ঘা খাস্ নে!
হেথায় বেলা, হোথায় চাঁপা,
শেফালী হোথা ফুটিয়ে—
ওদের কাছে মনের ব্যথা
বল্‌রে মুখ ফুটিয়ে!
ভ্রমর কহে "হোথায় বেলা
হোথায় আছে নলিনী—
ওদের কাছে বলিব নাকো
আজিও যাহা বলি নি!
মরমে যাহা গোপন আছে
গোলাপে তাহা বলিব,
বলিতে যদি জ্বলিতে হয়
কাঁটারি ঘায়ে জ্বলিব!"

এই গানেরই ভাব স্ফুটতর হল 'শৈশব-সংগীতে'র "গোলাপ-বালা" গীতি-কবিতায়। কবিতাটি অবশ্য 'ভারতী'তে 'ফুলবালা'র ছাব্বিশ মাস পরে প্রকাশিত হয়েছে [অগ্রহায়ণ ১২৮৭]। ফুল ও পাখির রূপক আশ্রয় করেই কবি এখানে তাঁর মনের ভাবটি ব্যক্ত করেছেন। তাই 'গোলাপ-বালা'র দ্বিতীয় শিরোনামা 'গোলাপের প্রতি বুল্‌বুল্'। গানের সুরটি বেহাগ রাগিণীতে বিধৃত।

বলি, ও আমার গোলাপ-বালা,
বলি, ও আমার গোলাপ-বালা,
তোল মুখানি, তোল মুখানি,
কুসুমকুঞ্জ কর আলা।

প্রেমের রহস্যালাপ এবং একটি সুকুমার বাসনাই এই কবিতায় ভাষা

পেয়েছে। সলজ্জ গোলাপ-বালা পাতার আড়ালে নিজের মুখখানি ঢেকে রেখেছে। তাই দেখে বুল্‌বুল্‌ বলছে :

বালা, ঘুমায়ে পড়েছে ধরা,
সখি, ঘুমায় চাঁদিমা তারা,
প্রিয়ে, ঘুমায় দিক্‌বালারা,
প্রিয়ে, ঘুমায় জগৎ যত।
সখি, বলিতে মনের কথা
বল এমন সময় কোথা ?

* * *

আমি এমন সুধীর স্বরে
সখি, কহিব তোমার কানে,
প্রিয়ে, স্বপনের মত সে কথা আসিয়ে
পশিবে তোমার প্রাণে।

বুল্‌বুল্‌ গোলাপকে বলছে, আমি তোমারই বিহগ। সারা রাত ধরে তোমারই প্রণয় পান করে সারাদিন ধরে সেই প্রণয়েরই গান গাই। বুল্‌বুল্‌ বলছে :

সখি, এমন মধুর স্বরে
আমি গাহিব সে সব গান,
দূরে মেঘের মাঝারে আবরি তনু
ঢালিব প্রেমের তান—
তবে— মজিয়া সে প্রেম-গানে,
সবে চাহিবে আকাশ পানে,
তারা ভাবিবে গাইছে অপ্সর কবি
প্রেয়সীর গুণ-গান॥

মেঘলোকে প্রেয়সীর গুণগান-গাওয়া অপ্সর-কবির দিব্যসংগীত সারাদিন ধরে কণ্ঠে ফুটিয়ে তুলতে হবে, তাই প্রেমিক-কবি বুল্‌বুল্‌ বলছে, সেই গান গাওয়ার প্রেরণা আমাকে দাও,—

তবে মুখানি তুলিয়া চাও !
সুধীরে মুখানি তুলিয়া চাও !

নীরবে একটি চুম্বন দাও,
গোপনে একটি চুম্বন দাও।

এই নীরবে গোপনে একটি চুম্বনের প্রার্থনাই প্রেমকে রূপক ও রূপকথার কুসুমিত রাজ্য থেকে মানুষের বাসনাময় মনোভূমিতে সত্যতর ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

৫

আনা তরখড়ের জীবনীতে আমরা জেনেছি, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন তাঁর পরিচয় হয় তার পূর্ব থেকেই তিনি অধ্যাপক লিটলডেলের প্রতি অনুরাগিণী। শুধু প্রেমেই প্রতিবদ্ধচিত্তা নন, পরিণয়-সম্পর্কেও বাগ্‌দত্তা। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই নবেম্বর বম্বেতে লিটলডেলের সঙ্গে আনার পরিণয় সম্পন্ন হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন বিলাতে। এই বিবাহ তরুণ কবিচিত্তে কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে 'শৈশব-সংগীতে'র "প্রেমমরীচিকা" শীর্ষক গানটিতে। আনার বিবাহ ১৮৭৯ সনের ১৮ই নবেম্বর অর্থাৎ ১২৮৬ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণের পয়লা-দোসরা-তেসরার কোন একটি দিন। "প্রেম-মরীচিকা" গানটি ১২৮৬ সালের ফাল্গুন মাসের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ বিবাহের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গানটি লেখা। ঝিঁঝিট খাম্বাজ রাগিণীতে বিরচিত এই গানে কবি বলছেন :

ও কথা বোল না তারে, কভু সে কপট না রে,
আমার কপাল-দোষে চপল সে জন!
অধীর হৃদয় বুঝি শান্তি নাহি পায় খুঁজি,
সদাই মনের মত করে অন্বেষণ।
ভাল সে বাসিত যবে করে নি ছলনা।
মনে মনে জানিত সে, সত্য বুঝি ভালবাসে,
বুঝিতে পারে নি তাহা যৌবন-কল্পনা।
হরষে হাসিত যবে হেরিয়ে আমায়
সে হাসি কি সত্য নয়?— সে যদি কপট হয়
তবে সত্য ব'লে কিছু নাহি এ ধরায়!

স্বচ্ছ দর্পণের মত বিমল সে হাস
হৃদয়ের প্রতি ছায়া করিত প্রকাশ।
তাহা কপটতাময় ?— কখনো কখনো নয়,
কে আছে সে হাসি তার করে অবিশ্বাস।
ও কথা বোল না তারে, কভু সে কপট না রে,
আমার কপাল-দোষে চপল সে জন,
প্রেম-মরীচিকা হেরি, ধায় সত্য মনে করি
চিনিতে পারে নি সে যে আপনার মন।

বিবাহিতা আনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব তাঁর উদার সুন্দর ও নির্মল হৃদয়েরই পরিচয়বাহী। এই বিশ্বাস ও ক্ষমা, এই সহানুভূতিপূর্ণ করুণা মহাকবি-হৃদয়েরই উপযুক্ত।

৬

আনার অচিরস্থায়ী জীবন বিবাহের বারো বৎসরের মধ্যেই মৃত্যুর দ্বারা খণ্ডিত হল। ১৮৯১ সনের ৫ জুলাই, ৩৬ বৎসর বয়সে, এডিনবরাতে আনার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দু' বৎসর পূর্বে সেকেন্দারাবাদে একটি শকট দুর্ঘটনায় তিনি বিশেষ আঘাত পান, তারই ফলে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। মৃত্যুর মাস তিনেক পূর্বে [?] তিনি বিলাত যাত্রা করেন, এবং সেখানেই তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ তখন পৈতৃক জমিদারি পরিদর্শনে বাংলার সুদূর পল্লীপ্রান্তে কর্মব্যস্ত। আনার মৃত্যুসংবাদ তাঁর কাছে আদৌ পৌঁছেছিল কিনা, অথবা পৌঁছে থাকলে কখন পৌঁছেছিল—সে কথা জানবার মত কোন উপকরণ আমরা খুঁজে পাই নি। এর কিছুদিন পূর্বেকার একটি ঘটনা রবীন্দ্রজীবনে প্রহেলিকাচ্ছন্ন হয়ে আছে। ১৮৯০ সনের আগস্ট মাসে রবীন্দ্রনাথ অকস্মাৎ তাঁর মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিলাত যাত্রা করেন। ২২ আগস্ট বম্বে থেকে জাহাজ ছাড়ে, ১০ সেপ্টেম্বর তাঁরা লণ্ডনে পৌঁছন। ঠিক এক মাস ইংলণ্ডে থেকে ৯ অক্টোবর লণ্ডন থেকে দেশে ফেরার জাহাজে ওঠেন, ৩রা নভেম্বর জাহাজ এসে পৌঁছয় বম্বেতে। রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ কেন বিলাত গিয়েছিলেন

তার কোন উত্তর রবীন্দ্রজীবনীতে নেই। 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'তেও বিলাত যাবার কোন সন্তোষজনক কারণ কোথাও উল্লিখিত হয় নি।

আনার যেদিন মৃত্যু হয় তার পূর্বদিন [৪ জুলাই ১৮৯১] কবি সাজাদপুর থেকে ইন্দিরা দেবীকে যে পত্র লেখেন তাতে দেখা যাচ্ছে মৃত্যুচিন্তা কবি-মানসকে আচ্ছন্ন করে আছে। কবি তাঁর বোটে রয়েছেন। সেখান থেকে নদীর ঘাটে একটি বধূ-বিদায়ের দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ল। বালিকাবধূ বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

"সকাল বেলাকার রৌদ্র এবং নদীতীর এবং সমস্ত এমন গভীর বিষাদে পূর্ণ বোধ হতে লাগল। সকাল বেলাকার একটা অত্যন্ত হতাশ্বাস করুণ রাগিণীর মত মনে হল সমস্ত পৃথিবীটা এমন সুন্দর অথচ এমন বেদনায় পরিপূর্ণ।...এই অজ্ঞাত ছোটো মেয়েটির ইতিহাস আমার যেন অনেকটা পরিচিত হয়ে গেল। বিদায়কালে এই নৌকো করে নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়ার মধ্যে যেন আরও একটু বেশি করুণা আছে। অনেকটা যেন মৃত্যুর মতো—তীর থেকে প্রবাহে ভেসে যাওয়া—যারা দাঁড়িয়ে থাকে তারা আবার চোখ মুছে ফিরে যায়, যে ভেসে গেল সে অদৃশ্য হয়ে গেল। জানি, এই গভীর বেদনাটুকু, যারা রইল এবং যে গেল উভয়েই ভুলে যাবে, হয়তো এতক্ষণে অনেকটা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। বেদনাটুকু ক্ষণিক এবং বিস্মৃতিই চিরস্থায়ী। কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে—এই বেদনাটুকুই বাস্তবিক সত্যি, বিস্মৃতি সত্যি নয়। এক-একটা বিচ্ছেদ এবং এক-একটা মৃত্যুর সময় মানুষ সহসা জানতে পারে এই ব্যথাটা কি ভয়ংকর সত্যি। জানতে পারে যে, মানুষ কেবল ভ্রমক্রমেই নিশ্চিন্ত থাকে, আশঙ্কা এবং শোকই জগতের ভিতরকার সত্য। কেউ থাকে না, কিছুই থাকে না, সেটা এমনি সত্য যে স্মরণও থাকে না, শোকও থাকে না—এবং সেইটা মনে করলে মানুষ আরও ব্যাকুল হয়ে ওঠে যে, কেবল যে থাকব না তা নয়, কারও মনেও থাকব না। একেবারে জগতের অন্তর বাহির থেকে লোপ।"[৫]

আনার মৃত্যুর পূর্বদিন বহু সহস্র যোজনের ব্যবধান সত্ত্বেও রবীন্দ্রমানসে তাঁর অজ্ঞাতসারে যে অবোধপূর্ব মৃত্যুচিন্তা উদিত হয়েছে তার সঙ্গে আনার মৃত্যুর কোন প্রত্যক্ষযোগ পরিদৃশ্যমান হবে না। কিন্তু মানুষের মনোজগতের সব কথাই মানুষ জেনে ফেলেছে এ কথা কেউ কি জোর করে বলতে পারবে?

'বামাবোধিনী' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় [১২৯৮] আনার মৃত্যুসংবাদ

প্রকাশিত হয়। সেই সময়কার রচিত রবীন্দ্রনাথের কবিতা সংকলিত হয়েছে 'মানসী' ও 'সোনার তরী'তে। কিন্তু এই দুখানি কাব্যগ্রন্থের কোন কবিতার ওপর আনার মৃত্যুশোকের ছায়া পড়েছে বলে মনে হয় না।

৭

কবির পরিণত জীবনের কবিতায় আনার পুনরাবির্ভাব হয়েছে 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থে। 'পূরবী'র "ক্ষণিকা" ও "কিশোর প্রেম" কবিতা দুটির আলম্বন নলিনীর প্রেম। "ক্ষণিকা" কবিতাটি লেখা হয় দক্ষিণ-আমেরিকা যাত্রার পথে হারুনা-মারু জাহাজে, ১৯২৪ সনের ৬ অক্টোবর তারিখে। তার আগের দিন 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'তে কবি লিখছেন, "কিশোর বয়সে যারা আমাকে কাঁদিয়েছিল হাসিয়েছিল, আমার কাছ থেকে আমার গান লুঠ করে নিয়ে ছড়িয়ে ফেলেছিল, আমার মনের কৃতজ্ঞতা তাদের দিকে ছুটল। * * * তারা চলতে চলতে দুটো কথা বলেছে, সব কথা বলার সময় পায়নি ; ··তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললুম, 'আমার জীবনে যারা সত্যিকার ফসল ফলিয়েছে সেই আলোর সেই উত্তাপের দূত তোমরাই। প্রণাম তোমাদের। তোমাদের অনেকেই এসেছিল ক্ষণকালের জন্য। আধো-স্বপ্ন, আধো-জাগার ভোরবেলায় শুকতারার মতো, প্রভাত না হতেই অস্ত গেল'।"[৬]

কবিজীবনের কৈশোরলগ্নে "আধো-স্বপ্ন, আধো-জাগার ভোরবেলায় শুকতারার মতো" যারা এসেছিল তাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য নামটি হল নলিনী। নলিনীর একটি বিশেষ দিনের বিশেষ মুহূর্তই "ক্ষণিকা" কবিতায় কাব্যরূপ লাভ করেছে। গোধূলি-লগ্নের পান্থ বলছেন, তাঁর হৃদয়ে যুগান্তরে একদিন যে ক্ষণিকা তার "ভীরু দীপশিখা" নিয়ে দেখা দিয়েছিল আজ সে দিগন্তের কোন্ পারে রয়েছে, কবি আকাশের নীল যবনিকা উন্মোচন করে তারই সন্ধান করছেন।— "দিগন্তের কোন্ পারে চ'লে গেল আমার ক্ষণিকা।" তৃতীয় স্তবকে কবি বলছেন, বিরহের দূতী এসে তার সেই স্তিমিত দীপখানি চিত্তের অজানা কক্ষে সংগোপনে রেখে দিয়ে গিয়েছিল। সেখানে যে বীণা আছে অকস্মাৎ একটি আঘাতে তা উঠেছিল বেজে। কবি বলছেন, আজ বেদনাপদ্মের বীণাপাণি সেই অন্ধকারে-থেমে-যাওয়া বাণীকেই সন্ধান করে ফিরছেন।

বলাই বাহুল্য, নলিনীর হৃদয়বাসনা একটি নিবিড় মিলনের মুহূর্ত রচনা

করেছিল। কিন্তু তার প্রেমচেতনা ছিল দ্বিধাবিভক্ত। অন্যের কাছে বাগ্‌দত্তা নারীর নবানুরাগের মধ্যে যে দ্বিধা যে দ্বন্দ্ব থাকে, সেই দ্বিধা সেই দ্বন্দ্বই নলিনীর পরম লগ্নটিকে করেছে ব্যর্থতায় বিড়ম্বিত। সেই ব্যর্থ রহঃকথাই ভাষা পেয়েছে কবিতাটির চতুর্থ ও পঞ্চম স্তবকে। কবি বলছেন :

সেদিন ঢেকেছে তারে কী এক ছায়ার সংকোচন,
নিজের অধৈর্য দিয়ে পারে নি তা করিতে মোচন।
তার সেই ত্রস্ত আঁখি, সুনিবিড় তিমিরের তলে
যে-রহস্য নিয়ে চলে গেল, নিত্য তাই পলে পলে
মনে মনে করি যে লুণ্ঠন।
চিরকাল স্বপ্নে মোর খুলি তার সে অবগুণ্ঠন॥

হে আত্মবিস্মৃত, যদি দ্রুত তুমি না যেতে চমকি,
বারেক ফিরায়ে মুখ পথমাঝে দাঁড়াতে থমকি,
তাহলে পড়িত ধরা রোমাঞ্চিত নিঃশব্দ নিশায়
দুজনের জীবনের ছিল যা চরম অভিপ্রায়।
তাহলে পরমলগ্নে, সখী
সে-ক্ষণকালের দীপে চিরকাল উঠিত আলোকি॥

এই শেষের স্বীকৃতিটি নলিনীর সঙ্গে কবির হৃদয়-সম্পর্কের নিগূঢ়তার পরিচয় বহন করছে। দুজনের জীবনের একটি চরম অভিপ্রায় যে গড়ে উঠেছিল সে কথা কবি অকপটেই স্বীকার করছেন। এবং যদি সেই রোমাঞ্চিত নিঃশব্দনিশার আত্মনিবেদন দ্বিধামুক্ত হতে পারত তাহলে সেই পরমলগ্নে ক্ষণকালের দীপের আলোয় চিরকাল আলোকিত হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু কবির আক্ষেপ, 'গেল না ছায়ার বাধা', তাই না-বোঝার প্রদোষ-আলোকে স্বপ্নের চঞ্চল মূর্তি তাঁর দীপ্ত চোখে সংশয়-মোহের নেশা জাগায়। তাই "অচেনার মরীচিকা আকুলিছে ক্ষণিকার শোকে।" উপান্ত স্তবকের এই অন্তিম বাক্যটির দিকে একটু দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। আনার বিবাহের পর কবি যে গানটি লিখেছিলেন তার শিরোনামা ছিল "প্রেম-মরীচিকা"। পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরে আনার স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত হবার সঙ্গে সঙ্গে 'মরীচিকা'-রূপকল্পটিও পুনরায় কবিমানসে ভেসে উঠেছে। এই রূপকল্পের সরণি বেয়েই 'ক্ষণিকা'র উৎস-সন্ধানে নিঃসংশয় হতে হবে।

৮

'পূরবী'র "কিশোর প্রেম" কবিতার আলম্বন-বিভাবরূপে নলিনীরই প্রেমমূর্তি যে ক্রিয়াশীল হয়েছে, তারও উৎস-সন্ধানে সংশয়মুক্ত হতে হবে আরেকটি রূপকল্পের সাহায্যে। আমরা পূর্বে বলেছি নলিনী কবিমানসের কুসুমিত রাজ্যের দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছিল। কিন্তু নলিনী নিজে ছিল একটি 'অস্ফুট কলিকা'। এই 'অস্ফুট কলিকা'র সংকেত দিয়েই তাকে চিনতে হবে। "কিশোর প্রেম" কবিতায় কবি বলছেন :

এই জীবনে সেই তো আমার প্রথম ফাগুন মাস।
ফুটল না তার মুকুলগুলি,
শুধু তারা হাওয়ায় ঢুলি
অবেলাতে ফেলে গেছে চরম দীর্ঘশ্বাস,
আমার প্রথম ফাগুন মাস।

বলাই বাহুল্য, নলিনী রবীন্দ্র-কবিমানসে 'কিশোর প্রেমে'র আলোকেই উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। নলিনী-প্রেমের কাব্যরূপায়ণে 'কিশোর প্রেমে'র তুলনা নেই। দ্বিতীয় স্তবকে কবি বলছেন :

আজকে মনে পড়েছে সেই নির্জন অঙ্গন।
সেই প্রদোষের অন্ধকারে
এল আমার অধর-পারে
ক্লান্ত ভীরু পাখির মতো কম্পিত চুম্বন।
সেদিন নির্জন অঙ্গন।

এ চিত্রটি সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের প্রাক্‌লগ্ন অধরসুধা-পানের লীলাবিলাস নয়। সূক্ষ্ম সুকুমার স্পর্শচেতনার প্রথম রোমাঞ্চ দিয়ে গড়া 'ক্লান্ত ভীরু পাখির মতো কম্পিত চুম্বন।' প্রদোষের অন্ধকারে ক্লান্ত ভীরু পাখির কুলায়-প্রত্যাবর্তনের এই দুর্লভ উপমানটির জন্ম যে-অনুরাগের ফলে সম্ভব হয়েছে তার সৌকুমার্যের তুলনা নেই। সেই 'কিশোর প্রেম'কে স্মরণ করে কবি বলছেন :

পারে যাওয়ার উধাও পাখি সেই কিশোরের ভাষা,
প্রাণের পারের কুলায় ছাড়ি
শূন্য আকাশ দিল পাড়ি,

আজ এসে মোর স্বপন মাঝে পেয়েছে তার বাসা,
আমার সেই কিশোরের ভাষা॥

যে-প্রেমের মুকুলগুলি কোনদিনই ফোটবার অবকাশ পেল না তার 'অস্ফুট কলিকা'ই 'প্রান্তিকে'র সপ্তম কবিতায় নূতন মহিমা নিয়ে দেখা দিয়েছে। কবি বলছেন:

অনভিজ্ঞ নবকৈশোরের
কম্পমান হাত হতে স্খলিত প্রথম বরমালা
কণ্ঠে ওঠে নাই, তাই আজিও অক্লিষ্ট অমলিন
আছে তার অস্ফুট কলিকা। সমস্ত জীবন মোর
তাই দিয়ে পুষ্পমুকুটিত।

অনভিজ্ঞ নবকৈশোরের আধো-জানা আধো-পাওয়া প্রথম প্রেমের এর চেয়ে বড় স্বীকৃতি আর কিছু হতে পারে না। কবি বলছেন, সেই অক্লিষ্ট অমলিন অস্ফুট কলিকা দিয়েই তাঁর সমস্ত জীবন পুষ্পমুকুটিত। কৈশোরলগ্নে প্রেম হয়েছিল ফুল, গোধূলি-লগ্নে তাই হল পুষ্পমুকুট। প্রেমের রাজ্যে কবি যে সম্রাটের মহিমা পেয়েছিলেন এই পুষ্পমুকুটই তার শীর্ষাভরণ।

উল্লেখপঞ্জী

১। দ্রষ্টব্য: কবিমানসী-১, 'বিদেশী পাখি' শীর্ষক পঞ্চম অধ্যায়: পৃ° ৯৭-১২৮।
২। কবিমানসী-১, পৃ° ১৯৫।
৩। তদেব।
৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী-২৬, পৃ° ৬২৮।
৫। ছিন্নপত্রাবলী, পত্র-সংখ্যা ২৬; পৃ° ৬৫-৬৬।
৬। দ্রষ্টব্য, কবিমানসী-১, পৃ° ১৩।

তৃতীয় অধ্যায়

মৃণালিনী ঃ মঙ্গল-মুরতি

১

রবীন্দ্রনাথের দাম্পত্য-জীবনের কথা আমরা কবিমানসীর প্রথম খণ্ডে 'স্বর্ণমৃণালিনী' শীর্ষক দশম অধ্যায়ে বলেছি। এখানে তার পুনরুল্লেখ বাহুল্য-মাত্র। বিবাহের সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল বাইশ বৎসর সাত মাস ; কবিজায়া মৃণালিনী ছিলেন একাদশবর্ষীয়া বালিকা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দশ-এগারো বৎসরের ব্যবধান সেকালোপযোগীই হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে কাদম্বরী দেবীরও বয়সের ব্যবধান ছিল দশ বৎসরের। বরং রবীন্দ্রনাথের বিবাহ ঈষৎ-বিলম্বিত হয়েছিল বলেই দাদা ও বৌঠানেরা সেকালের তুলনায় একটু বয়স্থা পাত্রীই নিবাচন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মায়ের প্রথম সন্তান হয়েছে তাঁর বারো বৎসর বয়সে। রবীন্দ্রনাথের বিবাহের প্রায় দু বৎসর পরে যখন তাঁদের প্রথম সন্তান হল তখন মৃণালিনী দেবী ত্রয়োদশী কিশোরী। এই বয়ঃসীমাই ছিল সেযুগের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

রবীন্দ্র-কবিমানসে কবিজায়ার স্থান কতটুকু ছিল, এবং স্বকীয়া প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কবি কখন কি কবিতা রচনা করেছিলেন, সে সম্পর্কে রবীন্দ্ররসিকসমাজ সম্পূর্ণ সচেতন নন। এবং এ বিষয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্যে 'রবীন্দ্র-জীবনী'কারের দায়িত্বও কম নয়।

কবিজায়ার মৃত্যুর প্রসঙ্গে জীবনীকার বলেছেন, "স্ত্রীর মৃত্যুর পর শোকাশ্রু কাব্যধারায় উছলিয়া উঠিল। যে কাব্য প্রেরণা ক্ষীণ স্রোতে বহিতেছিল, বিচ্ছেদের বেদনায় ক্ষণকালের জন্য তাহা বন্যার ন্যায় দুকূলপ্লাবী হইল, কিন্তু কর্তব্যের দৃঢ় বন্ধন কোথাও শিথিল হইল না ; অত্যন্ত সংযত সংহত ভাবে তাহা বহিয়া গেল। কয়েকটি সনেটের মধ্যে 'স্মরণ' করিলেন কবি-প্রিয়াকে। (১)। স্ত্রীর মৃত্যুতে যে রবীন্দ্রনাথ আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহার একমাত্র প্রকাশ এই 'স্মরণ' কবিতাগুচ্ছ। (২)। কবির সুবিস্তৃত সাহিত্যে তাঁহার স্ত্রী সম্বন্ধে বিশেষ কোনো উল্লেখ পাই না। (৩)। ** রবীন্দ্রনাথ পত্নীর বিয়োগে যে কাতরতা

অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা এই কবিতাগুচ্ছের বাহিরে আর কোথায়ও প্রকাশ করেন নাই।" (৪)।[১]

বলাই বাহুল্য, এই উক্তি-চতুষ্টয়ের একটিও যথার্থ নয়। কিন্তু এ বিচার যথাস্থানে করা হবে। আমরা রবীন্দ্র-প্রেমকাব্যে মৃণালিনী-প্রসঙ্গকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করব। মৃত্যুর পূর্বে ও মৃত্যুর পরে। মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হল ১৩০৯ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ।

মৃত্যুর পূর্বপর্যায়ে রয়েছে উনিশ বৎসরের মিলিত জীবন। বিয়াল্লিশ বৎসর থেকে কবিজীবনের দ্বিতীয়ার্ধ 'মৃত্যুর পরে'র এলাকাভুক্ত।

আমরা বলেছি, রবীন্দ্রনাথের দাম্পত্য-জীবনের শুরুতেই মৃত্যুর ছায়াপাত হয়েছে। কবির বিবাহের চার মাস পরে কাদম্বরী দেবী দেহত্যাগ করেন। "সেদিন মহাকাল-নিক্ষিপ্ত সেই মৃত্যুশেল কবির মর্মস্থলে আমূল বিদ্ধ হয়েছিল। শেলবিদ্ধ বক্ষের রক্তক্ষরা বেদনা নিয়ে এসেছে কবিজীবনে নিদ্রাহীন রাত। সদ্যোবিবাহিত তরুণ কবি জীবনের কাছে চেয়েছিলেন অমৃতের অধিকার, কিন্তু মৃত্যু তাঁর হাতে তুলে দিলে বিষের পাত্র। নীলকণ্ঠ কবি সেই বিষই শোধন করে অমৃতে রূপান্তরিত করলেন।"[২]

আমরা আরও বলেছি, "মৃত্যু-প্রত্যক্ষ-করা এই 'বিশ্লেষধিয়ার্তি'—এই হারাই-হারাই ভাব থেকেই তরুণ কবির দাম্পত্যচেতনার প্রথম স্তর রচিত হয়েছে।" একজনকে হারিয়েছি—এ বেদনা যেমন সত্য তেমনি আরেকজন যে বুকের কাছে এসেছে সেও এমনি করে একদিন চলে যেতে পারে, এ আশংকাও সমানভাবে সত্য—এই চেতনা নিয়েই তরুণ কবি বালিকাবধূর মুখের দিকে তাকিয়েছেন।

১২৯১ সালের ভাদ্রের 'ভারতী'তে 'উ' ছদ্মনামে "নীরব নিশীথে" এবং "তোমাকে" শীর্ষক দুটি দীর্ঘত্রিপদী-বন্ধের কবিতা প্রকাশিত হয়। সজনীকান্ত দাস সিদ্ধান্ত করেছেন যে ওই "তোমাকে" কবিতাটিই 'রবীন্দ্রকাব্যে প্রথম প্রিয়াসম্ভাষণ'।[৩] 'কড়ি ও কোমলে' সংকলিত "পুরাতন"ও "নূতন" কবিতাযুগলের প্রাক্‌রূপ হল "নীরব নিশীথে" ও "তোমাকে"। প্রথম কবিতাটির চতুর্থ স্তবকে কবি বলেছেন:

শ্মশানের মহামায়া, প্রাণেতে ফেলেছে ছায়া;
আবরি রেখেছে প্রাণ মোর—

কবিতাটির উপসংহারে কবির বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

এ মায়া কাহার মায়া, বুঝিতে না পারে হিয়া,
প্রাণ বলে—"এ যে কারাগার"।

শ্মশানের এই কারাগার থেকে মুক্তির প্রার্থনাই ফুটে উঠেছে "তোমাকে" কবিতার মধ্যে। বালিকাবধুকে উদ্দেশ করে কবির প্রথম মুদ্রিত রচনার মর্যাদা বহন করছে বলে কবিতাটি এখানে সমগ্রভাবে উদ্ধারযোগ্য :

১

নীরব তটিনী বুকে, মৃদু বায়ু মনসুখে
ধীরি ধীরি করে বিচরণ ;
চম্পক চামেলি বেলা, ফুটেছে মালতী মেলা
সৌরভে পুলকে ত্রিভুবন !

২

ওই বুকে রাখি মাথা, ওই মুখ পানে চেয়ে,
প্রাণ মোর ঘুমাইতে চায় ;
দূরে দূরে হাসে ফুল, দূরে দূরে নাচে লতা,
দূরে দূরে পাখী গান গায়।

৩

তটিনী জ্যোৎস্না মাখা, আকাশ তারকাময়
দশদিশি হাসিছে কেমন !
এহেন সময় প্রিয়ে কেন লো কিসের দুখে
ম্লান মুখ, নত দুনয়ন !

৪

অয়ি সোহাগিনী লতা কে বল দিয়েছে ব্যথা,
কেন বল এত অভিমান !
সে মধুর হাসিখানি, দেখাও আমায় রাণি,
কেন হেরি বিরস বয়ান !

৫

আমরা দুটিতে মিলি, আছি হেথা নিরিবিলি,
এস সখি মন কথা কই ;

গেছে চলে কত কাল, আরো বল কত কাল,
দুজনে দুজন মোরা রই !

৬

জগতের প্রান্তদেশে, ওই আকাশের শেষে,
যেথায় তারারা চেয়ে আছে ;
সুধামুখী মেয়েগুলি, কাননে কুসুম তুলি
বেড়ায় মন্দার গাছে গাছে !

৭

ওই দেখ হাত তুলে, হেসে হেসে দুলে দুলে,
ওই এরা ডাকিছে তোমায় ;
আকাশ খুলেছে দ্বার, কোন বাধা নাহি আর
আয় সখি আয় তবে আয় !

এই কবিতার সঙ্গে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'যোগিয়া' [কার্তিক ১২৯১], 'শরতের শুকতারা' [অগ্রহায়ণ], 'কোথায়' [পৌষ], 'বিদায়' ['কড়ি ও কোমলে' নাম 'পুরাতন', চৈত্র] এবং 'নূতন' [বৈশাখ ১২৯২] প্রভৃতি সমকালীন কবিতাগুলি মিলিয়ে পড়লেই বুঝতে পারা যাবে 'পুরাতন' ও 'নূতনে'র দ্বন্দ্বে সেদিন কবিমানস কিভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। দাম্পত্য-জীবনের শুরুতেই তরুণ কবিচিত্তের এই সংকটলগ্নের বিশ্লেষণ করেই আমরা অন্যত্র বলেছি, "কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুশোক কবিকে কিভাবে তাঁর বালিকাবধূর প্রতি আকৃষ্ট করেছে, কিভাবে বিচ্ছেদের অনুক্ষণ-আশঙ্কা নবমিলনকে অশ্রুমধুর করে রেখেছে এই রচনাগুলি তারই চিরন্তন সাক্ষী"।[৪]

২

বালিকাবধূর সঙ্গে পরিণতমনস্ক তরুণ স্বামীর প্রেমালাপের মধ্যে যে হাস্যকরতা আছে বিবাহের সাড়ে চার বছর পরে লেখা 'নব-বঙ্গদম্পতীর প্রেমালাপ' কবিতায় [২৩ আষাঢ়, ১৮৮৮] তারই কৌতুক-মধুর চিত্রটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বলাই বাহুল্য এ কবিতা রচনার পশ্চাতে যে প্রেরণা কাজ

করেছে তা নিতান্তই কবিকল্পনা নয়, কবির ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা—প্রাপ্তবয়স্ক যুবকের পক্ষে অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাকে বিবাহ করে তার প্রতি প্রেমনিবেদনের মধ্যে যে হাস্যকরতা রয়েছে—তাই কবিতাটিকে লঘু-হাস্যরসে অথচ প্রচ্ছন্ন কারুণ্যে মণ্ডিত করেছে।

কিন্তু বালিকাবধূর প্রতি কবির সহানুভূতিও যে নিত্য বিরাজমান ছিল তার সার্থক প্রমাণ 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের "বধূ" কবিতাটি [রচনা ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৮]। পল্লীবালিকা নগরের শ্বশুরগৃহে এসে যে বিড়ম্বনা ভোগ করে, কবি তার করুণ আলেখ্য রচনা করেছেন এই কবিতায়। পাষাণকায়া রাজধানী তার বিরাট মুঠিতলে ব্যাকুল বালিকাকে নির্মমভাবে দলিত পিষ্ট করে ফেলতে উদ্যত। এখানে

ইটের পরে ইট, মাঝে মানুষ-কীট,
নাইকো ভালোবাসা, নাইকো খেলা।

এই হৃদয়হীন পরিবেশে

কেহ বা দেখে মুখ কেহ বা দেহ ;
কেহ বা ভালো বলে, বলে না কেহ।
ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি,
পরখ করে সবে, করে না স্নেহ।

অসহায়া বালিকা তাই শ্বশুরগৃহে এসে পদে পদে মৃত্যুকামনা করছে। সপ্তমাত্রিক ধ্বনিপ্রধান ছন্দে রচিত কবিতাটির উপসংহার অতীব করুণ। বালিকা-বধূ বলছে :

দেবে না ভালবাসা, দেবে না আলো।
সদাই মনে হয় আঁধার ছায়াময়
দিঘির সেই জল শীতল কালো,
তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভালো!
ডাক্ লো ডাক্ তোরা, বল্ লো বল্—
"বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল্!"
কবে পড়িবে বেলা ফুরাবে সব খেলা,
নিবাবে সব জ্বালা শীতল জল,
জানিস্ যদি কেহ আমায় বল্!

এই কবিতাটি নিজের দাম্পত্য জীবনের প্রতিবিম্বে রচিত তরুণ কবির সার্থকতম গীতিকবিতা। দরিদ্র পল্লীগৃহস্থের কন্যা ছিলেন মৃণালিনী। বহু-আত্মীয়পরিজন-পরিবৃত মহর্ষি-পরিবারের প্রাসাদমালায় এসে তাঁর অস্বস্তিপূর্ণ নিঃসহায় মৌনবেদনাকেই কবি এ-কবিতায় ভাষা দিয়েছেন। কবিজায়ার প্রতি কবির এই সমবেদনার রসেই অভিসিঞ্চিত হয়েছে তাঁর দাম্পত্যচেতনার তরুণ সুর।

৩

রবীন্দ্রনাথের দাম্পত্য-প্রণয়ের কাব্য প্রথম পরমোৎকর্ষ লাভ করেছে 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুচ্ছে। দাম্পত্য-মিলন-কুঞ্জে সম্ভোগ-প্রেমের এমন অপূর্ব-সুন্দর চিত্র, দেহের পাত্রে মর্ত্যজীবনের পরম পিপাসার এমন মধুর আস্বাদন বৈষ্ণব পদাবলীর পরে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। দেহরতি পুষ্পসুকুমার সৌন্দর্যস্বপ্নে রূপান্তরিত হয়ে কী অসামান্য কাব্যলাবণ্য লাভ করতে পারে, এ কবিতাগুলি যেন তারই চূড়ান্ত নিদর্শন।[৫]

আমরা 'সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে এই সনেটগুচ্ছের আলোচনায় দেখিয়েছি যে, 'কড়ি ও কোমলে'র কবির মানসমন্দিরে দুই নারীর অধিষ্ঠান। একদিকে সদ্য-লোকান্তরিতা কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশে বিরহ-বিপ্রলম্ভের সুর করুণ নিখাদে ঝংকৃত হচ্ছে, অন্যদিকে বাল্য-কৈশোরের বয়ঃসন্ধিলগ্নে উপনীতা কিশোরী-বধূর প্রতি আকর্ষণ মধুক্ষরা বাসনানুরাগে গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে। বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতাগুলিরই আলোচনা করব। বলাই বাহুল্য এই পর্যায়ের সনেটগুচ্ছে প্রেমের পুষ্প প্রেয়সীর তনুবল্লরীতেই বিকশিত হয়ে উঠেছে। কবি বলছেন ঃ

> ওই দেহখানি বুকে তুলে নেব বালা,
> পঞ্চদশ বসন্তের একগাছি মালা।
>
> [তনু]

এই মালাগাছি প্রথমে ছিল ত্রয়োদশ বসন্তের, ক্রমে চতুর্দশ থেকে পঞ্চদশ বসন্তে উপনীত হয়েছে। ওই মালাগাছি বুকে তুলে নিয়ে কবির যে দেহারতি তার নিবিড়তম প্রকাশ ঘটেছে "দেহের মিলন" কবিতায় ঃ

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ 'পরে।
তোমার নয়ন পানে ধাইছে নয়ন,
অধর মরিতে চায় তোমার অধরে।
তৃষিত পরান আজি কাঁদিছে কাতরে
তোমারে সর্বাঙ্গ দিয়ে করিতে দর্শন।

বলাই বাহুল্য, এই সনেটের প্রথম পঙক্তিটি জ্ঞানদাসের বিখ্যাত পদটিকেই স্মরণ করিয়ে দেয় : 'প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।' রবীন্দ্রনাথের এই সনেটগুচ্ছে সংস্কৃত ও বৈষ্ণব সাহিত্যের সম্ভোগাখ্য দেহরতিরই জয়ধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। 'ছিন্নপত্রাবলী'র একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ইংরেজ কবিদের মধ্যে কীট্‌সের সঙ্গেই তাঁর আত্মীয়তা তিনি সবচেয়ে বেশি করে অনুভব করেন।[৬] কীট্‌সের মতই রবীন্দ্রনাথও পঞ্চেন্দ্রিয়-সচেতন কবি দেহদেবতার দেউলে পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়েই তিনি প্রেমের পূজা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেমকাব্যের বিরুদ্ধে তরুণ রসিকসমাজের প্রধান অভিযোগ এই যে, তাতে দেহের তপ্তস্বাদ বড় একটা নেই। তাঁদের মতে রবীন্দ্রনাথের প্রেম নৈর্ব্যক্তিক, এবং নৈর্ব্যক্তিক বলেই দেহাতিক্রান্ত। এই অভিযোগ উত্থাপনের সময় নিশ্চয়ই তাঁরা 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুচ্ছের কথা ভুলে যান। রচনাবলী সংস্করণে 'কড়ি ও কোমলে'র ভূমিকায় 'কবির মন্তব্যে' কবি বলেছেন, এই কবিতাগুলিতে আছে 'যৌবনের রসোচ্ছ্বাস'। 'আত্মবিস্মৃত বেআইনী প্রমত্ততা' ওতে অবাধে প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুত সেদিন এই কবিতাগুলি বাংলার প্রেমকাব্যে বিপ্লবাত্মক বলেই মনে হয়েছিল। পঁচিশ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথও সেই প্রথম তাঁর কৈশোর ও প্রথম-যৌবনের দেহসম্পর্কিত কুণ্ঠা ও সংকোচকে পাশ কাটিয়ে প্রিয়ার পুষ্পিত তনুবল্লরীর দিকে বিমুগ্ধ-বিস্ময়ে তাকিয়েছেন। আর সে দেখা, তাঁরই ভাষায়, সর্বাঙ্গ দিয়ে দেখা। বলাই বাহুল্য, উনিশ শতকীয় ব্রাহ্মনীতিবোধ-শাসিত সমাজে এই পেগান-দৃষ্টি রক্ষণশীল সামাজিকের চিত্তে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। কাব্যবিশারদেরা কটুভাষী ভৎর্সনায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন।

কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি বিশুদ্ধ পেগান-দৃষ্টিও নয়, তার মধ্যে দেহের পবিত্রতা-রক্ষার্থী খ্রীষ্টীয় নীতিবোধেরও সংমিশ্রণ ঘটেছিল। আর এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ জয়দেবপন্থ কবি নন, সৌন্দর্যের কবি কালিদাসই তাঁর দীক্ষাগুরু। কালিদাসের দেহচেতনা এবং দেহান্তর্গত সৌন্দর্যচেতনার তিনটি উদাহরণ দিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে। অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে রাজা দুষ্মন্ত আশ্রমকন্যা শকুন্তলাকে দেখে বলছেন :

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিশলয়মলূনং কররুহৈ
রনাবিদ্ধং রত্নং মধুনবমনাস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিবচ তদ্রূপমনঘং
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ ॥২।১৭

অর্থাৎ, শকুন্তলা যেন একটি অনাঘ্রাত পুষ্প, নখে অচ্ছিন্ন একটি কিশলয়; যেন সে অনাবিদ্ধ রত্ন, অনাস্বাদিতরস নতুন মধু। অথবা সে যেন কোন অক্ষয় পুণ্যরাশির অখণ্ড অর্থাৎ সম্পূর্ণ ফলের মতো। দুষ্মন্ত বলছেন, জানি না এর ভোক্তারূপে বিধাতা কাকে উপস্থিত করবেন। বলাই বাহুল্য, তৃষিত চিত্তের রূপানুরাগ দিয়েই শ্লোকটির অঙ্গসজ্জা রচিত হয়েছে। দৃষ্টিটি পূর্বরাগের প্রথম দশার। রতি মনোময়ী। সম্ভোগেচ্ছা ব্যঞ্জনাশ্রয়ী বলেই কাব্যসুরভিত। এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে বিরহী যক্ষের দৃষ্টিতে অলকালোকনিবাসিনী যক্ষপ্রিয়ার দেহবর্ণনার। সেখানে কালিদাস বলছেন :

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিত-হরিণী-প্রেক্ষণা নিম্ন-নাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ ॥ উত্তরমেঘ।২১

শকুন্তলার সৌন্দর্য-বর্ণনায় দ্রষ্টা এবং ভোক্তার দৃষ্টি এক সঙ্গে মিলেছিল। এখানে শুধু ভোক্তার দৃষ্টিই প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যক্ষের বিরহী চিত্ত সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের স্মৃতিদীপ জ্বালিয়ে প্রিয়ার নগ্নকান্তি দেহসৌন্দর্যকে কামমোহিতদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছে। সংস্কৃত বাক্‌ছন্দের যে সূক্ষ্ম আবরণটি যক্ষপ্রিয়ার দেহকে ঘিরে আছে তাকে সরিয়ে নিলেই যেন এর নগ্নতা দর্শকের চোখের সামনে লজ্জায় সংকুচিত হয়ে পড়বে।

কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গে বসন্তপ্রয়াত বনভূমিতে উমার বর্ণনায় বিশুদ্ধ সৌন্দর্যমুগ্ধ দ্রষ্টার দৃষ্টিই নয়নমণিদীপে ভাস্বর হয়ে উঠেছে :

আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব ॥৩।৫৪॥

পীনোন্নত পয়োধরভারে ঈষৎ আনত,—এইটুকুমাত্রই এখানে নারীত্বের অভিব্যঞ্জনার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তা হয়ে উঠেছে পর্যাপ্ত-পুষ্পস্তবকাবনম্রা একটি বিশুদ্ধ বনলতিকা। পুষ্পিতা লতার উপমানে যে অনুপম তনুলাবণ্যের সৃষ্টি হয়েছে তাতে সৌন্দর্যের পুষ্পসৌকুমার্যই পরিলক্ষণীয়। বাসনা এখানে বিশুদ্ধীভূতা। সৌন্দর্যের অমরাবতীতে তার উন্নয়ন সার্থক। 'কড়ি ও কোমলে'র কবির দৃষ্টিতেও ভোক্তা ও দ্রষ্টার সম্মিলন ঘটেছে। তাই সেখানে প্রেমিক ও সৌন্দর্যরসিকের প্রেমচেতনা ও সৌন্দর্যচেতনার মণিকাঞ্চনযোগে দেহের পাত্রে শুধু রতিরসই নয়, সৌন্দর্যের পদ্মমধুও আস্বাদিত।

৪

প্রেমচেতনা ও সৌন্দর্যচেতনার রাখীবন্ধনে রচিত কবির এই দৃষ্টিভঙ্গির কথা স্মরণ রেখে 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুলিকে আস্বাদন করা যেতে পারে। 'স্তন', 'চুম্বন', 'বিবসনা', 'বাহু' ও 'চরণ',—মুখ্যত এই সনেটগুলিতে কবিজায়ার বরতনু বন্দিত হয়েছে।

'স্তন' শীর্ষক কবিতাযুগলে যৌবনের বসন্তসমীরে বিকশিত উরজ-পুষ্পের সৌরভসুধায় কবির 'পরান পাগল' হয়েছে। এই বর্ণনায় সম্ভোগবাসনা নিঃশেষে অনাবৃত। কিন্তু কবিতাটির দ্বিতীয়ার্ধে বাসনার নির্বাণপ্রাপ্তি ঘটেছে। কবি বলছেন :

কি যেন বাঁশির ডাকে জগতের প্রেমে
বাহিরিয়া আসিতেছে সলাজ হৃদয়,
সহসা আলোতে এসে গেছে যেন থেমে
শরমে মরিতে চায় অঞ্চল-আড়ালে!

প্রেমের সংগীত যেন বিকশিয়া রয়,
উঠিছে পড়িছে ধীরে হৃদয়ের তালে।
হেরো গো কমলাসন জননী লক্ষ্মীর—
হেরো নারী-হৃদয়ের পবিত্র মন্দির॥

বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে প্রথমার্ধের সৌরভ-সুধা দ্বিতীয়ার্ধে হয়ে উঠেছে প্রেমের সংগীত। এবং অন্তিম পঙক্তিমিথুনে নারীহৃদয়ের পবিত্র মন্দির হয়েছে জননী-লক্ষ্মীর কমলাসন।

'স্তন' শীর্ষক দ্বিতীয় কবিতায় এই জননী লক্ষ্মীর কমলাসনই দেবশিশু মানবের মাতৃভূমি হয়ে উঠেছে। কবি বলছেন:

পবিত্র সুমেরু বটে এই সে হেথায়,
দেবতা-বিহারভূমি কনক-অচল।
উন্নত সতীর স্তন স্বরগ-প্রভায়
মানবের মর্ত্যভূমি করেছে উজ্জ্বল।
শিশু-রবি হোথা হতে ওঠে সুপ্রভাতে,
শ্রান্ত-রবি সন্ধ্যাবেলা হোথা অস্ত যায়।

এখানে শিশু-রবি ও শ্রান্ত-রবির ব্যঞ্জনাটি দূরপ্রসারী হলেও নবম ও দশম পঙক্তিতে আদিরস বাৎসল্যরসকেই হাত ধরে ডেকে এনেছে:

চিরস্নেহ-উৎসধারে অমৃত-নির্ঝরে
সিক্ত করি তুলিতেছে বিশ্বের অধর।

আপাতদৃষ্টিতে কবিতাটিতে রসাভাস ঘটেছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু মোহিতলালের অনুরূপ একটি কবিতার ভাষায়, এখানে 'রাধা ও ম্যাডোনা একাকার।'[৭]

'চুম্বন' কবিতায় অধরসুধাপানের অমৃতস্বাদ অক্ষুণ্ণ রেখেও কবিকল্পনা তুঙ্গশিখরী হয়েছে। কবি বলছেন:

অধরের কানে যেন অধরের ভাষা
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে।
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালোবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর-সংগমে।

এখানে কবিচেতনা তীর্থযাত্রী বটে, কিন্তু দেহদেবতার দেউলেই সে যাত্রা

সাঙ্গ হয়েছে। কবিতাটির অন্তিম যুগ্মকটিতে তারই সার্থক ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে :

দুটি অধরের এই মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাঙা বাসর-শয়ন ॥

চুম্বনের এই অন্তিম কবিকৃতির তুলনা বিশ্বসাহিত্যেও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। 'বিবসনা' কবিতায় তরুণ কবি তাঁর গৃহবধূকে সৌন্দর্যের নগ্ন নিরাবরণ রূপেই দেখতে চেয়েছেন। কবি বলছেন :

অতনু ঢাকুক মুখ বসনের কোণে,
তনুর বিকাশ হেরি লাজে শির নত।
আসুক বিমল উষা মানব-ভবনে,
লাজহীনা পবিত্রতা—শুভ্র বিবসনে ॥

মেঘদূতের বিরহী যক্ষের দৃষ্টির সঙ্গে এই দৃষ্টির প্রভেদ বিস্তর। লাজহীনা পবিত্রতা এখানে মানব-ভবনে বিমল উষার আবির্ভাবের সঙ্গে উপমিত হয়েছে। 'চিত্রা'র "বিজয়িনী" কবিতায় এই বিবসনাই বিশ্ববাসনাকে বিশুদ্ধীভূত করে সৌন্দর্যের অনিন্দ্যকান্তি লাভ করেছে।

বৈষ্ণব পদাবলীতে কবি শ্রীরাধার অলক্তকরাগরঞ্জিত চরণের গতিভঙ্গে স্থলকমলের পাপড়ি খসে খসে পড়তে দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'চরণ' কবিতায় 'দুখানি অলস রাঙা কোমল চরণে'র স্পর্শে ধরার বুকে শতবসন্তের স্মৃতি জেগে-ওঠার কল্পনা করেছেন। কবিজায়ার চরণস্পর্শে পৃথিবী 'শত লক্ষ কুসুমের পরশ-স্বপনে' বিভোর হয়ে আছে। কবিতার শেষ তিনটি পঙক্তি মমতাময় মধুর বাসনায় অবিস্মরণীয় :

হোথা যে নিঠুর মাটি, শুষ্ক ধরাতল,—
এস গো হৃদয়ে এস, ঝুরিছে হেথায়
লাজ-রক্ত লালসার রাঙা শতদল ॥

৫

'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুচ্ছে প্রেয়সীর বরতনু এমনি করেই কবিহৃদয়ের বাসনার বৃন্তে বিকশিত হয়ে অনবদ্য কাব্যলাবণ্য লাভ করেছে। কবিজায়ার জীবদ্দশায় মুখ্যত 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী', 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'য় দাম্পত্য জীবনের ভাবপুষ্পগুলি সঞ্চয়িত হয়েছে। 'কড়ি ও কোমলে'র বিরহীর পত্র, স্তন [১, ২], চুম্বন, বিবসনা, বাহু, চরণ, অঞ্চলের বাতাস, দেহের মিলন, তনু, স্মৃতি, হৃদয়-আসন, কল্পনার সাথী, হাসি, নিদ্রিতার চিত্র, কল্পনামধুপ, পূর্ণমিলন, শ্রান্তি, বন্দী, কেন, মোহ, মরীচিকা প্রভৃতি কবিতায় মৃণালিনীই আলম্বন-বিভাব-রূপিণী। 'মাসনী'র নিষ্ফল প্রয়াস, হৃদয়ের ধন, বধূ, অপেক্ষা, নববঙ্গদম্পতীর প্রেমালাপেও তাঁকে চিনতে পারা যাবে। 'সোনার তরী'র সোনার বাঁধন এবং যেতে নাহি দিব কবিতায়ও তাঁর পদধ্বনি শোনা যায়। 'যেতে নাহি দিব' কবিতার অন্তরঙ্গ ঘরোয়া জীবনের পরিবেশে যে নারীলক্ষ্মীটি আবির্ভূত হয়েছেন তিনি কবিরই গৃহলক্ষ্মী। 'চিত্রা'র "রাত্রে ও প্রভাতে" কবিতায় তাঁরই দুই রূপ পরিস্ফুট। মধুযামিনীতে জ্যোৎস্নানিশীথে কুঞ্জকাননে কবি তাঁর মুখে ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা তুলে ধরেছিলেন। তিনি চুম্বনভরা সরস-বিম্বাধরে তা আকণ্ঠ পান করেছেন। প্রভাতে তিনিই স্নান-অবসানে শুভ্রবসনা হয়ে জাহ্নবীতীরে দেবালয়তলে দেখা দিয়েছেন। রাতে কবির প্রাণেশ্বরী এসেছিলেন প্রেয়সীর রূপ ধরে। প্রভাতে তিনিই এলেন দেবীর বেশে। প্রেয়সীর এই মঙ্গলময়ী মুরতির ধ্যানে বিভোর কবি বলছেন :

> দেবী, তব সিঁথিমূলে লেখা
> নব অরুণ সিঁদুররেখা,
> তব বামবাহু বেড়ি শঙ্খবলয় তরুণ ইন্দুলেখা।
> একি মঙ্গলময়ী মুরতি বিকাশি প্রভাতে দিয়েছ দেখা!

প্রেয়সীর এই মঙ্গলময়ী মূর্তির ধ্যানে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় কালিদাসকেই অনুসরন করেছেন। কুমারসম্ভবের সপ্তম সর্গে মঙ্গলস্নানে বিশুদ্ধগাত্রী পার্বতীর বর্ণনায় কালিদাস বলছেন :

> সা মঙ্গলস্নানবিশুদ্ধগাত্রী
> গৃহীতপ্রত্যুদ্গমনীয়বস্ত্রা।

নিবৃত্তপর্জন্যজলাভিষেকা
প্রফুল্লকাশা বসুধেব রেজে ॥

অর্থাৎ, মঙ্গলস্নানের পর নির্মলকলেবরা পার্বতী যখন পতিসমীপে গমনের উপযোগী ধৌত বস্ত্রযুগল ধারণ করলেন তখন বর্ষাপগমে প্রফুল্ল কাশপুষ্প পরিশোভিত বসুধার ন্যায় তাঁর অপূর্ব শ্রীর উদ্ভব হল। কালিদাসের এই ভাবগর্ভ শ্লোকটিই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে 'রাত্রে ও প্রভাতে'র স্তবকযুগলে সম্প্রসারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের দাম্পত্যপ্রেম-কল্পনায় মিলনের দুটি রূপ দেখেছিলেন—পূর্ব-মিলন আর উত্তর-মিলন। রবীন্দ্রনাথের নিজের দাম্পত্য-প্রেমচেতনায়ও এই পূর্ব-মিলন ও উত্তর-মিলনের লীলা পরিদৃশ্যমান। 'কড়ি ও কোমলে' পূর্ব-মিলনের অনুভূতিগুলি সংহতিবদ্ধ হয়ে সনেটের মুক্তারাশি রূপে ঝরে পড়েছে ; আর 'চিত্রা' কাব্যে উত্তর-মিলনের স্বপ্ন "রাত্রে ও প্রভাতে" কবিতায় গীতচ্ছন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

৬

মৃণালিনী দেবী পরলোক গমন করলেন ১৩০৯ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ। বিয়ে হয়েছিল ১২৯০ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ। সুতরাং দাম্পত্য জীবন অপূর্ণ ১৯ বৎসর। মৃত্যুকালে মৃণালিনী দেবীর বয়স ত্রিশ বৎসরও পূর্ণ হয় নি। রবীন্দ্রনাথের বয়স সাড়ে একচল্লিশ। কবিজায়ার এই অকাল-প্রয়াণে 'অশ্রুসাগরে' যে 'জোয়ার' এসেছিল কবির কাব্যলোকে তা কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সে বিষয়ে রবীন্দ্ররসিকসমাজ আজও সম্পূর্ণ অবহিত নন। বরং গত ষাট বছর ধরে তাঁরা এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে রয়েছেন যে, পত্নীবিয়োগে রবীন্দ্রনাথ 'স্মরণে'র প্রায়-অনুল্লেখযোগ্য সাতাশটি ছোট ছোট কবিতাই মাত্র লিখেছেন। এই অধ্যায়ের প্রথমেই আমরা জীবনীকারের উক্তিচতুষ্টয় উদ্ধার করেছি। তাতে দেখা গেছে যে, প্রভাতকুমার বলেছেন, স্ত্রীর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ যে আঘাত পেয়েছিলেন তার "একমাত্র প্রকাশ" 'স্মরণ' কবিতাগুচ্ছ।

জীবনীকারের এই সব উক্তিরই অনুসরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যসমালোচকগণ। 'রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা'য় নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, "কবির স্পর্শ-কাতর চিত্তে স্ত্রীর মৃত্যু নিশ্চয়ই খুব গভীর হইয়া বাজিয়াছিল,

কিন্তু সুবিস্তৃত রবীন্দ্র-সাহিত্যে এক 'স্মরণ'-গ্রন্থের কবিতাগুলি ছাড়া আর কোথাও স্ত্রী-সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নাই, একান্ত নিবিড় ব্যক্তিগত বিরহজনিত দুঃখ এই কবিতাগুলি ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না, জীবনেও আর কোথাও কোনও প্রকাশ নাই।"[৮]

নীহাররঞ্জন কবির এই মিতভাষণের কারণ নির্ণয় করে বলেছেন, "যে-শোক, যে-দুঃখ একান্ত ব্যক্তিগত, একান্ত অন্তরগত তাহা চিরকাল তাঁহার অন্তরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেই তিনি অভ্যস্ত ;"[৯]

'রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা'-কার উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণায় আরেক পদ অগ্রসর হয়েছেন। তিনি বলছেন ঃ

'স্মরণের এই কয়টি কবিতা ছাড়া স্ত্রীবিয়োগের শোক তাঁহার আর কোনও সাহিত্য-সৃষ্টিতে ব্যক্ত হয় নাই।

"বিশ্ব-সাহিত্যে শোককাব্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি, 'স্মরণ'কে সে পর্যায়ে ফেলা যায় না। শোককাব্যে বিচ্ছিন্ন ও বিলাপীর যে ব্যক্তিগত অংশ থাকে, তাহাকেই সার্বজনীন অনুভূতির মধ্য দিয়া একটা রসরূপ দেওয়াতেই উহার প্রধান সৌন্দর্য। কিন্তু এই কাব্যে ব্যক্তিগত অংশ অতি সামান্য, তিন চারিটি কবিতার বেশি নয়। * * *

"রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যে শোকের প্রকাশ অপেক্ষা সান্ত্বনার অংশই বেশি। অবশ্য অধিকাংশ শোককাব্যে সান্ত্বনার অংশ সর্বশেষে আসে, কিন্তু এই কাব্যে শোককে উপলক্ষ্য করিয়া কবি মৃত্যুর দানকে গ্রহণ করিয়া বৃহত্তর সান্ত্বনার আনন্দ লাভ করিতেছেন। যে বৃহত্তর লাভের আনন্দে কবি শোক ভুলিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা একান্তই কবির মনোমত লাভ, উহা বিশ্বের সাধারণ নরনারীচিত্তে বেশি প্রতিধ্বনি জাগাইতে পারে না। মানুষ-কবি রবীন্দ্রনাথ এখানে দার্শনিক ও অধ্যাত্ম-রসিক রবীন্দ্রনাথের নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছেন।

"অবশ্য অন্যান্য কবিদের নিকট শোক কাব্যের উত্তম বিষয়বস্তু হইলেও রবীন্দ্রনাথের মতো কবির নিকট আমরা শোকের কোনো কাব্যবিলাস আশা করিতে পারি না। প্রথম কারণ, তাঁহার ব্যক্তিগত শোককে তিনি নিভৃত অন্তরে চাপিয়া রাখিতে ভালোবাসেন, কোনো দিন প্রকাশ করিতে চাহেন চাহেন নাই। দ্বিতীয় কারণ, তাঁহার নিকট দুঃখ-শোকের কোনো স্থায়ী অস্তিত্ব নাই, এবং জন্ম-মৃত্যু একই সত্যের এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। * * * তৃতীয়

কারণ, নৈবেদ্য-যুগের পরিবর্তিত মানসিক অবস্থা। জগৎ ও জীবনের রূপলোক ও রসলোক হইতে বিদায় লইয়া, এবং চিত্তকে শান্ত, সংযত ও ত্যাগমুখী করিয়া কবি অধ্যাত্ম-সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছেন।"[১০]

অন্যে পরে কা কথা! রবীন্দ্রনাথের পরমাত্মীয় কৃষ্ণ কৃপালনি ১৯৬২খ্রীস্টাব্দে অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত তাঁর ইংরেজি রবীন্দ্রজীবনী গ্রন্থে 'স্মরণে'র কবিতাগুলির উচ্ছ্বাসহীনতার একটি মনস্তাত্ত্বিক হেতু নির্ণয় করে বলেছেন, কুড়ি বছর দাম্পত্য জীবন যাপনের পর উদ্দাম ভাবাবেগের প্রকাশ প্রত্যাশা করা স্বাভাবিক নয়। তিনি বলছেন, "Some critics have noted with regret a lack of adequate passion in these elegies, but they must be very naive indeed who imagine that a man's feeling for his wife, after twenty years of living together, should still palpitate with unrestrained passion."[১১]

"naive indeed"!—কৃপালনি তাঁর দাদাশ্বশুরের চিঠিপত্রগুলি যদি ভাল করে উলটেপালটে দেখতেন তাহলে এই বক্রোক্তি-প্রয়োগের পূর্বে অন্তত একটু সময়ের জন্যেও চুপ করে চিন্তা করতেন। কবিজায়ার তিরোধানের মাত্র এক বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ আঠারো বছর দাম্পত্য জীবন যাপনের পরও কবি তাঁকে লিখছেন, "ভাই ছুটি, বড় হোক্ ছোট হোক্ ভালো হোক্ মন্দ হোক্ একটা করে চিঠি আমাকে রোজ লেখ না কেন? ডাকের সময় চিঠি না পেলে ভারি খালি ঠেকে!"[১]

এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করে আমরা প্রথম খণ্ডে বলেছিলাম, "বিবাহের কুড়ি বৎসর পরেও যে-স্বামী তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে 'রোজ একটা করে চিঠি' পাবার জন্যে আকুল হয়ে থাকেন, স্ত্রীর প্রতি তাঁর অনুরাগ ও আকর্ষণ সম্পর্কে অন্য কোন প্রমাণ-পঞ্জী খুঁজে দেখা নিতান্ত অনাবশ্যক।"

৭

বস্তুত রবীন্দ্রজীবনীকার ও রবীন্দ্রকাব্যসমালোচকগণের প্রাসঙ্গিক উক্তিগুলির মূলে একটিমাত্র ধারণাই কাজ করে চলেছে যে, কবিজায়ার তিরোধানের পরে রবীন্দ্রনাথ 'স্মরণে'র ওই সাতাশটি কবিতামাত্রই লিখেছেন। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই চরিতকার ও সমালোচকগণ নিজ নিজ মনঃপ্রকর্ষ

অনুসারে নানা যুক্তির ইন্দ্রজাল রচনা করে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথ স্বভাবসংযত কবি হতে পারেন, কিন্তু পত্নীবিয়োগে তাঁর হৃদয় শোকাঘাতে অভিভূত হয় নি, এ অনুমান সত্যের বিপরীত। 'স্মরণে'রই ২৫-সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন, 'জোয়ার এসেছে অশ্রুসাগরে।' এবং তা বাঁধ ভেঙে কূল ছাপিয়ে উঠেছে।—

জাগো রে জাগো রে চিত্ত জাগো রে
জোয়ার এসেছে অশ্রুসাগরে।
কূল তার নাহি জানে,
বাঁধ তার নাহি মানে,
তাহারি গর্জনগানে জাগো রে।
তরী তোর নাচে অশ্রুসাগরে।

মানুষ যতই সংযত ও ধীর প্রকৃতির হোক না কেন, জীবনসঙ্গিনীর মৃত্যুতে তার অশ্রুসাগর কূল ছাপিয়ে বাঁধ ভেঙে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে—এই তো স্বাভাবিক! মহাকবি কালিদাস তাঁর রঘুবংশে ইন্দুমতীবিয়োগে ধীর-চিত্ত মহারাজ অজের শোককাতরতার বর্ণনায় বলেছেন:

বিললাপ স বাষ্পগদ্‌গদং
সহজামপ্যপহায় ধীরতাম্।
অভিতপ্তময়োঽপি মার্দবং ভজতে
কৈব কথা শরীরিষু॥ ৮।৪৩॥

অর্থাৎ, 'গতপ্রাণা প্রিয়তমার দেহ অঙ্কে স্থাপন করে মহারাজ অজ স্বকীয় প্রকৃতিসিদ্ধ ধৈর্য পরিহার করে বাষ্প-বিজড়িত কণ্ঠে বিলাপ করতে লাগলেন। অতি কঠিন লৌহও যখন অনল-সন্তাপে বিগলিত হয় তখন দেহধারী মানুষের আর কথা কি?' পত্নীবিয়োগে রবীন্দ্রনাথ শোকোচ্ছ্বাসে অভিভূত হন নি, অথবা নিজের ব্যক্তিগত শোককে তিনি বাইরে জনসমক্ষে প্রকাশ করেন নি, এ কথা একেবারেই সত্য নয়। মৃণালিনী দেবীর তিরোধানের সময় রবীন্দ্রনাথ নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক। তখন বঙ্গদর্শন মাসের শেষভাগে প্রকাশিত হত। ৭ই অগ্রহায়ণ সম্পাদকের স্ত্রীবিয়োগ হয়। অগ্রহায়ণ-সংখ্যা বঙ্গদর্শনকে বলা যেতে পারে সম্পাদকের স্ত্রীবিয়োগ-সংখ্যা। ওতে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ গল্প কবিতায় সবশুদ্ধ ষোলটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। তন্মধ্যে নয়টি রবীন্দ্রনাথের লেখা তাঁর পত্নীবিয়োগজনিত শোককাব্য। যখন পত্নীবিয়ো

হয় তখন তাঁর পিতৃদেব বেঁচে আছেন। অগ্রজগণ রয়েছেন চোখের সামনে। কিন্তু কাব্যে এই শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে কবি বিন্দুমাত্র লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হন নি। বঙ্গদর্শনে এই শোককাব্য রচনা অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে পরবর্তী ভাদ্রমাস পর্যন্ত। এই কয় মাসে রবীন্দ্রনাথ সবশুদ্ধ আটত্রিশটি শোক-কবিতা রচনা করেন। তন্মধ্যে মাঘের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় দশটি, ফাল্গুনে নয়টি। কিন্তু পত্নীবিয়োগজনিত কবির বেদনা এখানেই স্তব্ধ হয়ে থাকে নি। মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর তৃতীয় বৎসর-শেষে কবি কালিদাসের অজবিলাপের নয়টি শ্লোকের অনুদাদ করে যেন পত্নীতর্পনযজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিয়ে গেছেন।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত এই কবিতাগুলি থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, কবির বাঁধভাঙা অশ্রুচ্ছ্বাস কূল ছাপিয়ে উঠেছিল। বস্তুত, পত্নীবিয়োগজনিত শোককাব্যরচনায় রবীন্দ্রনাথ দেশী-বিদেশী কোনও কবিরই পশ্চাতে নন। বরং সকলের না হলেও, অনেকেরই পুরোভাগে তাঁর স্থান।

৮

কবির পত্নীবিয়োগজনিত যে কবিতাগুলি বঙ্গদর্শনে ১৩০৯ অগ্রহায়ণ থেকে ১৩১০ ভাদ্র মাসের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে নিম্নে তার সংখ্যানুক্রমিক তালিকা সংকলিত হল।

বঙ্গদর্শন অগ্রহায়ণ ১৩০৯ :

১ মুক্ত পাখীর প্রতি, ২ দুর্ভাগা, ৩ প্রতীক্ষা, ৪ পথিক, ৫ শেষ কথা, ৬ প্রার্থনা, ৭ আহ্বান, ৮ পরিচয়, ৯ মিলন।

পৌষ ১৩০৯ :

১০ নারী, ১১ বিশ্বদোল।

মাঘ ১৩০৯ :

১২ লক্ষ্মী-সরস্বতী, ১৩ কথা, ১৪ নবপরিচয়, ১৫ পূর্ণতা, ১৬ সার্থকতা, ১৭ সঞ্চয়, ১৮ রচনা, ১৯ সন্ধান, ২০ অশোক, ২১ জীবনলক্ষ্মী।

ফাল্গুন ১৩০৯ :

২২ জাগরণ, ২৩ বসন্ত, ২৪ উৎসব, ২৫ প্রেম, ২৬ পূজা, ২৭ সন্ধ্যাদীপ, ২৮ গোধুলি, ২৯ সম্ভোগ, ৩০ দ্বৈত-রহস্য।

চৈত্র ১৩০৯ :

৩১ ঝরণাতলা।

বৈশাখ ১৩১০ :

৩২ ভোরের পাখী, ৩৩ চৈত্রের গান।

জ্যৈষ্ঠ ১৩১০ :

৩৪ সন্ধ্যা, ৩৫ যাত্রিণী।

আষাঢ় ১৩১০ :

৩৬ গ্রাম, ৩৭ মেঘোদয়ে।

ভাদ্র ১৩১০ :

৩৮ চিঠি।

এই আটত্রিশটি কবিতার পঁচিশটি 'স্মরণ' গ্রন্থে এবং তেরোটি 'উৎসর্গ' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ১৩১০ বঙ্গাব্দে মোহিতচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাব্যসংকলন 'কাব্যগ্রন্থ' প্রকাশিত হয়। বর্তমানে প্রচলিত 'স্মরণ' গ্রন্থের প্রথম তিনটি কবিতা 'কাব্যগ্রন্থে'র 'মরণ' বিভাগে এবং বাকিগুলি 'স্মরণ' বিভাগে সংকলিত হয়েছিল। 'উৎসর্গে' সংকলিত বঙ্গদর্শনের ১৩টি কবিতার কয়েকটি 'কাব্যগ্রন্থে'র 'রূপক' বিভাগে মুদ্রিত হয়। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত কবির পত্নীবিয়োগের প্রথম কবিতা "মুক্ত পাখির প্রতি"। ওটিও 'রূপক' বিভাগে মুদ্রিত হরেছিল। বিভ্রান্তি সৃষ্টির এও একটি প্রধান কারণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মোহিতলাল মজুমদার "মুক্তপাখির প্রতি" কবিতাটিকে স্বদেশপ্রেমের কবিতারূপে ব্যাখ্যা করেছেন। অথচ 'রূপক' বিভাগের অর্থবিশ্লেষণ করে "প্রবেশক" কবিতায় কবি লিখেছেন :

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।

অর্থাৎ, সেই সব কবিতাই "রূপক" পর্যায়ে সংকলিত হয়েছে যেগুলিতে ভাব এমন রূপ পরিগ্রহ করেছে যাতে "সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা" সার্থক হয়ে উঠেছে। কাজেই, 'রূপক' নামকরণ ভাব বা বিষয়বস্তুগত বিন্যাসের ফল নয়, তা প্রকরণগত বিন্যাসেরই পরিণাম। সেইজন্যেই "মুক্ত

পাখির প্রতি", "ভোরের পাখি" এবং "ঝরণাতলা"র মত কবিতাও এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত আটত্রিশটি কবিতা 'স্মরণ এবং 'উৎসর্গে' কিভাবে বিন্যস্ত হয়েছে তা জানা অত্যাবশ্যক। বঙ্গদর্শনে প্রকাশের ক্রমিক সংখ্যারই এখানে অনুসরণ করা হল :

বঙ্গদর্শনের ক্রমিক সংখ্যা	শিরোনামা	গ্রন্থের ক্রমিক সংখ্যা	
১	মুক্ত পাখির প্রতি	উৎসর্গ	৩১
২	দুর্ভাগা	উৎসর্গ	৪১
৩	প্রতীক্ষা	স্মরণ	৩
৪	পথিক	উৎসর্গ	৪২
৫	শেষ কথা	স্মরণ	৪
৬	প্রার্থনা	স্মরণ	৫
৭	আহ্বান	স্মরণ	৬
৮	পরিচয়	স্মরণ	৭
৯	মিলন	স্মরণ	৮
১০	নারী	উৎসর্গ	৪৩
১১	বিশ্বদোল	উৎসর্গ	৩৮
১২	লক্ষ্মীসরস্বতী	স্মরণ	৯
১৩	কথা	স্মরণ	১০
১৪	নবপরিচয়	স্মরণ	১১
১৫	পূর্ণতা	স্মরণ	১২
১৬	সার্থকতা	স্মরণ	১৩
১৭	সঞ্চয়	স্মরণ	১৪
১৮	রচনা	স্মরণ	১৫
১৯	সন্ধান	স্মরণ	১৬
২০	অশোক	স্মরণ	১৭
২১	জীবনলক্ষ্মী	স্মরণ	১৮
২২	জাগরণ	স্মরণ	২৫

বঙ্গদর্শনের ক্রমিক সংখ্যা	শিরোনামা	গ্রন্থের ক্রমিক সংখ্যা	
২৩	বসন্ত	স্মরণ	১৯
২৪	উৎসব	স্মরণ	২০
২৫	প্রেম	স্মরণ	২১
২৬	পূজা	স্মরণ	২৬
২৭	সন্ধ্যাদীপ	স্মরণ	২৩
২৮	গোধূলি	স্মরণ	২৪
২৯	সম্ভোগ	স্মরণ	২৭
৩০	দ্বৈতরহস্য	স্মরণ	২২
৩১	ঝরণাতলা	উৎসর্গ	৪৪
৩২	ভোরের পাখি	উৎসর্গ	১
৩৩	চৈত্রের গান	উৎসর্গ	৩৩
৩৪	সন্ধ্যা	উৎসর্গ	৩৬
৩৫	যাত্রিণী	উৎসর্গ	৪০
৩৬	গ্রাম	উৎসর্গ	৩৪
৩৭	মেঘোদয়ে	উৎসর্গ	৩৩
৩৮	চিঠি	উৎসর্গ	১১

৯

'স্মরণ' ও 'উৎসর্গে'র এই কবিতাগুলির আপেক্ষিক বিচারে দেখা যাবে যে, আয়তনের দিক দিয়ে স্মরণের সাতাশটি কবিতার চেয়ে উৎসর্গের তেরোটি কবিতা অনেক বড়। স্মরণের সাতাশটি কবিতার পঙ্‌ক্তিসংখ্যা অবশুদ্ধ ৪৮০, আর উৎসর্গের তেরোটি কবিতার পঙ্‌ক্তিসংখ্যা ৬৯৩। পত্নী-বিয়োগে রবীন্দ্রনাথ এই ১১৭৩ পঙ্‌ক্তি কবিতা রচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে যুক্ত হবে 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের "শেষ খেয়া," "গোধূলি লগ্ন", "প্রভাতে"—এই তিনটি কবিতা। তাদের মোট পঙ্‌ক্তিসংখ্যা ১২৩। তাহলে সবশুদ্ধ দাঁড়াল স্মরণের ৪৮০, উৎসর্গের ৬৯৩, এবং খেয়ার ১২৩,—অর্থাৎ ১২৯৬ পঙ্‌ক্তি।

এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত 'শিশু'র কয়েকটি কবিতা। যেখানে মাতাপুত্রের

কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বাৎসল্য-রস উৎসারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "শিশুকে উপলক্ষ্য করে ছলনাপূর্বক শিশুর মার সঙ্গ পেয়েছিলেম।"[১৩] আর "খোকা এবং খোকার মার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠমধুর সম্বন্ধ সেইটি আমার গৃহস্মৃতির শেষ মাধুরী—তখন খুকী ছিল না—মাতৃশয্যার সিংহাসনে খোকাই তখন চক্রবর্তী সম্রাট ছিল। সেইজন্যে লিখতে গেলেই খোকা এবং খোকার মার ভাবটুকুই সূর্যাস্তের পরবর্তী মেঘের মত নানা রঙে রাঙিয়ে ওঠে—সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ ও বর্ণ আকর্ষণ করে আমার অশ্রুবাষ্প এই রকম খেলা খেলবে—তাকে নিবারণ করতে পারি নে।"[১৪]

অবশ্য 'শিশু'র কবিতাগুলিতে করুণ-রস নয়, বাৎসল্য-রসেরই প্রকাশ ঘটেছে। তাই শিশুর কবিতাগুলিকে পত্নীবিয়োগজনিত প্রত্যক্ষ শোককাব্যের অন্তর্ভুক্ত আমরা করতে চাই নে। কিন্তু খেয়ার প্রথম আট-দশটি কবিতা, বিশেষ করে "শেষ খেয়া" ও "গোধূলি লগ্ন"—শোককাতর কবিচিত্তের আকাশে সূর্যাস্তের পরবর্তী মেঘের মত নানা রঙে রাঙিয়ে উঠেছে—সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ ও বর্ণ আকর্ষণ করে কবির অশ্রুবাষ্প যে বিহ্বল বেদনাকে প্রকাশ করেছে তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে স্মরণ ও উৎসর্গের কবিতাগুলির। খেয়ার "প্রভাতে" কবিতাটিও কবির 'দুখযামিনীর বুকচেরা ধন'।

শিল্পরূপের দিক দিয়ে স্মরণের চেয়ে উৎসর্গ ও খেয়ার কবিতাগুলি নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্টতর। স্মরণের সাতাশটি কবিতার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ আঠারোটি সনেট, এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ নটি ভিন্নতর স্তবকবন্ধে গ্রথিত। তন্মধ্যে চারটি ষণ্মাত্রিক ও একটি পঞ্চমাত্রিক ধ্বনিপ্রধান রীতির কবিতা। উৎসর্গের "ভোরের পাখী," "মেঘোদয়ে," "গ্রাম," "সন্ধ্যা" ও "ঝরণাতলা" এবং খেয়ার "শেষ খেয়া" কবিতাটি শ্বাসাঘাতপ্রধান রীতির বিচিত্র স্তবকবন্ধে রচিত। তন্মধ্যে 'গ্রামে'র স্তবক ছয় পঙ্‌ক্তির, কিন্তু 'মেঘোদয়ে'র স্তবক আঠারো পঙ্‌ক্তির। চৈত্রের গান ও সন্ধ্যা কবিতাযুগল শ্বাসাঘাতপ্রধান রীতির ত্রিপদীবন্ধে বিরচিত। পঞ্চমাত্রিক ধ্বনিপ্রধান রীতিতে লেখা হয়েছে উৎসর্গের "চিঠি" কবিতাটি। ষণ্মাত্রিক ধ্বনিপ্রধান রীতির কবিতা হল উৎসর্গের 'মুক্তপাখির প্রতি', 'বিশ্বদোল দুর্ভাগা', 'পথিক', 'নারী' এবং খেয়ার 'প্রভাতে' ও 'গোধূলি' লগ্ন। সপ্তমাত্রিক ধ্বনিপ্রধান রীতিটিকে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনে অল্পই ব্যবহার করেছেন। তন্মধ্যে দুটি মৃণালিনী দেবীকে নিয়ে

লেখা। প্রথম কবিতাটি হল 'মানসী'র "বধূ"; দ্বিতীয় কবিতাটি 'উৎসর্গে'র "যাত্রিণী"। পত্নীবিয়োগে শোককাতর কবিচিত্তের সার্থকতম প্রকাশ এই কবিতাটি। রবীন্দ্রকাব্যলোকে অনাদৃত এই কবিতাটি এই প্রসঙ্গে সমগ্রভাবেই উদ্ধারযোগ্য :

যাত্রিণী

মন্ত্রে সে যে পূত
রাখির রাঙা সুতো,
বাঁধন দিয়েছিনু হাতে
আজ কি আছে সেটি হাতে ?
বিদায়-বেলা এলো মেঘের মতো ব্যেপে,
গ্রন্থি বেঁধে দিতে দুহাত গেল কেঁপে,
সেদিন থেকে থেকে চক্ষু দুটি ছেপে
ভরে যে এল জলধারা।
আজকে বসে আছি পথের এক পাশে,
আমের ঘন বোলে বিভোল মধুমাসে,
তুচ্ছ কথাটুকু কেবল মনে আসে
ভ্রমর যেন পথহারা ;—
সেই যে বামহাতে একটি সরু রাখি
আধেক রাঙা, সোনা আধা
আজো কি আছে সেটি বাঁধা ?

পথ যে কতখানি
কিছুই নাহি জানি,
মাঠের গেছে কোন্ শেষে
চৈত্র ফসলের দেশে।
যখন গেলে চলে তোমার গ্রীবামূলে
দীর্ঘ বেণী তব এলিয়ে ছিল খুলে,
মাল্যখানি গাঁথা সাঁজের কোন্ ফুলে

লুটিয়ে পড়েছিল পায়ে।
একটুখানি তুমি দাঁড়ায়ে যদি যেতে।
নতুন ফুলে দেখো কানন ওঠে মেতে,
দিতেম ত্বরা করে নবীন মালা গেঁথে
কনকচাঁপা-বনছায়ে।
মাঠের পথে যেতে তোমার মালাখানি
প'ল কি বেণী হতে খসে ?
আজকে ভাবি তাই বসে।

নূপুর ছিল ঘরে
গিয়েছ পায়ে পরে,
নিয়েছ হেথা হতে তাই,
আকুল কলতানে শতেক রসনায়
চরণ ঘেরি তব কাঁদিছে করুণায়,
তাহারা হেথাকার বিরহ বেদনায়
মুখর করে তব পথ।
জানি না কী এত যে তোমার ছিল ত্বরা,
কিছুতে হল না যে মাথার ভূষা পরা,
দিতেম খুঁজে এনে সিঁথিটী মনোহরা
রহিল মনে মনোরথ।
হেলায় বাঁধা সেই নূপুর দুটি পায়ে
আছে কি পথে গেছে খুলে,
সে-কথা ভাবি তরুমূলে।

অনেক গীত গান
করেছি অবসান
অনেক সকালে ও সাঁজে
অনেক অবসরে কাজে।
তাহারি শেষ গান আধেক লয়ে কানে

দীর্ঘপথ দিয়ে গেছ সুদূর পানে,
গেয়েছ গুনগুন স্বরে।
কেন না গেলে শুনি একটি গান আরো,
সে গান শুধু তব, সে নহে আর কারো,
তুমিও গেলে চলে সময় হল তারো,
ফুটল তব পূজা-তরে।
মাঠের কোন্‌খানে হারাল শেষ সুর
যে গান নিয়ে গেলে শেষে,
ভাবি যে তাই অনিমেষে।

সপ্তমাত্রিক ধ্বনিপ্রধান ছন্দকে বলা যেতে পারে বাংলা মন্দাক্রান্তা ছন্দ। তিন-চারের অক্ষর দিয়ে গড়া দুটি পর্বাঙ্গে ওর প্রতিটি পর্ব বেদনার বিহ্বলতাকে যেন বিমথিত ও আলোড়িত করে তোলে। বিলাপচারী শোককাতরতার এর চেয়ে যোগ্যতর পর্বপর্বাঙ্গ আর নেই। বস্তুত, যাত্রিণী কবিতার স্তবকচতুষ্টয় অশ্রুক্ষরা বেদনায় বিহ্বল। শোকের নিবিড়-ঘনতায় ঐকান্তিক, অথচ আন্তরিকতায় অকৃত্রিম। 'রাখির রাঙা সুতো'র প্রতীকটি দাম্পত্যচেতনার পবিত্রতম ঘনিষ্ঠতম বন্ধনসংকেত।

১০

পত্নীবিয়োগে রচিত রবীন্দ্রনাথের যে তেতাল্লিশটি কবিতার কথা [স্মরণ ২৭, উৎসর্গ ১৩. খেয়া ৩] আমরা বলেছি, তার প্রথমতম কবিতা হল 'মুক্ত পাখির প্রতি'। মুক্ত পাখি ও খাঁচার পাখির রূপকে এর ভাবসত্যের উন্মেষ হয়েছে বলে কবিতাটি 'কাব্যগ্রন্থে' 'রূপক' পর্যায়ে সংকলিত হয়েছিল। কবিতাটি শোকার্ত রবীন্দ্রচিত্তে আকাশের প্রথম দান। পত্নীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ চলে গিয়েছিলেন একলা নির্জন অন্ধকার ছাদে। শোকের ঘনীভূত কালিমায় তাঁর মানস-আকাশ আর মহাবিশ্বের আকাশ এক হয়ে গিয়েছিল। দেহমুক্ত প্রাণ মুক্ত-পাখি হয়ে সেই তমসাচ্ছন্ন আকাশে মৃত্যুর অন্ধকার পেরিয়ে অমৃতলোকের আলোক-তীর্থের যাত্রী হয়েছে। দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ কবিপ্রাণ হয়েছে খাঁচার পাখি। মুক্ত পাখিকে ডেকে খাঁচার পাখি বলছে :

আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে, ওগো,
দিক্-দিগন্ত ঢাকি।—
আজিকে আমরা কাঁদিয়া সুধাই সঘনে ওগো,
আমরা খাঁচার পাখি,—
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
আজি কি আসিল প্রলয়রাত্রি ঘোর ?
চিরদিবসের আলোক গেল কি মুছিয়া ?
চিরদিবসের আশ্বাস গেল ঘুচিয়া ?
দেবতার কৃপা আকাশের তলে
কোথা কিছু নাহি বাকি ?—
তোমা পানে চাই, কাঁদিয়া সুধাই
আমরা খাঁচার পাখি।

পত্নীর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ যদি শুধু ওই একটি কবিতাই লিখতেন তাহলেও অনায়াসে বলা যেত পত্নীবিয়োগ-বেদনায় তিনি কী গভীর ভাবে অভিভূত হয়েছিলেন। কিন্তু শুধু একটি নয়, তেতাল্লিশটি কবিতার ওটি একটি মাত্র। ১২৯৬ পঙ্‌ক্তির মাত্র ৪৮টি পঙ্‌ক্তি।

শোকের প্রথম আঘাতের বিহ্বলতা স্মরণের ১, ৪; উৎসর্গের ৩৩ (মেঘোদয়ে), ৪০ (যাত্রিণী), ৪১ (দুর্ভাগা) ও ৪২ (পথিক) সংখ্যক কবিতায়; এবং খেয়ার 'শেষ খেয়া'য় প্রকাশিত হয়েছে। স্মরণের প্রথম কবিতায় কবি তাঁর উপাস্যদেবতাকে সম্বোধন করে বলছেন :

আজি মোর কাছে প্রভাত তোমার
কর গো আড়াল করো।
এ খেলা এ মেলা এ আলো এ গীত
আজি হতে হেথা হরো।
প্রভাত জগৎ হতে মোরে ছিঁড়ি
করুণ আঁধারে লহো মোরে ঘিরি,
উদাস হিয়ারে তুলিয়া বাঁধুক
তব স্নেহবাহুডোর।

স্মরণের চতুর্থ কবিতায় কবি বলছেন :

তখন নিশীথ রাত্রি ; গেলে ঘর হতে
যে পথে চলনি কভু সে অজানা পথে।
যাবার বেলায় কোনো বলিলে না কথা,
লইয়া গেলে না কারো বিদায়-বারতা।
সুপ্তিমগ্ন বিশ্বমাঝে বাহিরিলে একা,
অন্ধকারে খুঁজিলাম, না পেলাম দেখা।
মঙ্গল-মুরতি সেই চিরপরিচিত
অগণ্য তারার মাঝে কোথা অন্তর্হিত।

অষ্টচরণে গড়া তিনটি স্তবকে রচিত এই কবিতার শেষ স্তবকের অন্তিম চতুষ্কে কবি বলছেন :

আজ শুধু এক প্রশ্ন মোর মনে জাগে—
হে কল্যাণী, গেলে যদি, গেলে মোর আগে,
মোর লাগি কোথাও কি দুটি স্নিগ্ধ করে
রাখিবে পাতিয়া শয্যা চিরসন্ধ্যা তরে ?

তীব্র বিচ্ছেদবেদনার মধ্যেও এই পুনর্মিলনের আকাঙ্ক্ষাই কবিচিত্তে বেদনাকে অনতিদুঃসহ করেছে। উৎসর্গের ৩৩-সংখ্যক কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত। কাব্যটির নাম 'মেঘোদয়ে', বেরিয়েছিল বঙ্গদর্শনে, ১৩১০ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ে। পত্নীবিয়োগের পরে সেই প্রথম আষাঢ় এল কবিজীবনে। কবি বলছেন :

দেখো চেয়ে গিরির শিরে
মেঘ করেছে গগন ঘিরে,
আর করো না দেরি।
ওগো আমার মনোহরণ,
ওগো স্নিগ্ধ ঘনবরণ,
দাঁড়াও তোমায় হেরি।
দাঁড়াও গো ওই আকাশ কোলে,
দাঁড়াও আমার হৃদয় দোলে,
দাঁড়াও গো ওই শ্যামলতৃণ 'পরে,
আকুল চোখের বারি বেয়ে

দাঁড়াও আমার নয়ন ছেয়ে,
জন্মে জন্মে যুগে যুগান্তরে।
অমনি করে ঘনিয়ে তুমি এসো,
অমনি করে তড়িৎ-হাসি হেসো,
অমনি করে উড়িয়ে দিয়ো কেশ।
অমনি করে নিবিড় ধারাজলে
অমনি করে ঘন তিমিরতলে
আমায় তুমি কর নিরুদ্দেশ॥

উৎসর্গের ৪১-সংখ্যক কবিতাটির রচনায় গানের ঢং এসে গেছে। পত্নী-বিয়োগে কবি যে-সব গান রচনা করেছিলেন তার নিশ্চিত ও নিঃসংশয় সন্ধান সম্ভব কিনা রবীন্দ্র-সংগীত-বিশেষজ্ঞগণ বলতে পারেন। কিন্তু সে অনুসন্ধিৎসা যে একান্ত-বাঞ্ছনীয় তা বলাই বাহুল্য। আমাদের ধারণা সেই শোক-গীতাঞ্জলির প্রথম রচনা উৎসর্গের এই কবিতাটি। "দুর্ভাগা" নামে বেরিয়েছিল বিরহের প্রথম মাসে, অগ্রহায়ণের (১৩০৯) বঙ্গদর্শনে।

পথের পথিক করেছ আমায়
সেই ভালো, ওগো সেই ভালো।

কবি বলছেন :

ঝড়ের মুখে যে ফেলেছ আমায়
সেই ভালো, ওগো সেই ভালো।
সব সুখজালে বজ্র জ্বালালে
সেই আলো মোর সেই আলো।
সাথি যে আছিল নিলে কাড়ি,
কী ভয় লাগালে, গেল ছাড়ি।
একাকীর পথে চলিব জগতে
সেই ভালো মোর সেই ভালো।

এই একাকীর পথে চলার কথাই প্রকাশিত হয়েছে উৎসর্গের ৪২-সংখ্যক কবিতায়। এই কবিতাটিও "পথিক" শিরোনামায় ১৩০৯ সালের অগ্রহায়ণের বঙ্গদর্শনে বেরিয়েছিল। কবিতাটির প্রথম পঙ্ক্তি—'আলো নাই, দিন শেষ

হল, ওরে পান্থ, বিদেশী পান্থ।' কবিতাটির তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকে কবিমানসের পথক্লান্ত অসহায় করুণ অবস্থাটি ফুটে উঠেছে :

রজনী আঁধার হয়ে আসে, ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ।
ওই যে গ্রামের 'পরে
দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে,
দীপহীন পথে কী করিবি একা
হায় রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ।

এত বোঝা লয়ে কোথা যাস, ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ।
নামাবি এমন ঠাঁই
পাড়ায় কোথা কি নাই ?
কেহ কি শয়ন রাখে নাই পাতি
হায় রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ।

এই মনোভাবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা "শেষ খেয়া"র অর্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পথক্লান্ত পথিক দিনশেষে বসে আছে খেয়াপারের ঘাটে। অন্ধকার নদীস্রোতে একটি-দুটি করে নৌকা ভেসে যাচ্ছে। কবি বলছেন :

দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ঐ ছায়া
ভুলাল রে ভুলাল মোর প্রাণ।
ওপারেতে সোনার কূলে আঁধারমূলে কোন্ মায়া
গেয়ে গেল কাজ-ভাঙানো গান।

পথক্লান্ত কবিচিত্ত দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ছায়ার মায়ায় আবিষ্ট হয়েছে। 'ঘোমটা-পরা' কথাটি বিশেষ ভাবব্যঞ্জক। আজ কবির চিত্তে 'কাজ-ভাঙানো গান' বেজে উঠেছে। তিনি বলছেন, 'ওপারেতে সোনার কূলে

আঁধারমূলে কোন্ মায়া গেল কাজ-ভাঙানো গান।' এই চিত্রকল্পটি 'স্মরণে'র ২১-সংখ্যক কবিতাকে মনে করিয়ে দেয়—

আমার দিনান্ত-মাঝে কঙ্কণের কনক কিরণ
নিদ্রার আঁধারপটে আঁকি দিবে সোনার স্বপন।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় উৎসর্গের "মেঘোদয়ে" কবিতার দুটি পঙ্‌ক্তি—

ওগো তোমার আনো খেয়ার তরী,
তোমার সাথে যাব অকূল 'পরি।

মনে পড়ে উৎসর্গের ৩৪-সংখ্যক "গ্রাম" কবিতাটিকে। কবি বলছেন :

পালের তরি কত যে যায় বহি দখিন বায়ে,
দূর প্রবাসের পথিক এসে বসে বকুলছায়ে ;
পারের যাত্রিদলে
খেয়ার ঘাটে চলে,

মনে পড়ে উৎসর্গের ৪১-সংখ্যক "দুর্ভাগা" কবিতার অনুরূপ একটি চিত্রকল্প—

ঘাটে বাঁধা ছিল খেয়া-তরি,
তাও কি ডুবালে ছল করি ?

এর পর আর "শেষ খেয়া"র অর্থ আমাদের কাছে অস্পষ্ট থাকে না। দিনান্তে ক্লান্ত নিঃসঙ্গ এবং লক্ষ্যহারা কবিচিত্তের হাহাকার ওই কবিতায় পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। কবি বলছেন :

ঘরেই যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘর পানে
পারে যারা যাবার গেছে পারে ;
ঘরেও নহে, পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে !
ফুলের বার নাইকো আর ফসল যার ফলল না,
চোখের জল ফেলতে হাসি পায়,
দিনের আলো যার ফুরালো সাঁঝের আলো জ্বলল না
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।

পত্নীবিয়োগের ফলে রবীন্দ্র-কবিচিত্তে একদিন এমন নিঃসহায় নিঃসম্বল মুহূর্তটি এসেছিল একথা ভাবতেও বিস্ময় লাগে। 'দিনের আলো যার ফুরালো সাঁঝের আলো জ্বলল না'—এই রূপকল্পটির ব্যঞ্জনা বহুদূরপ্রসারিত। যে-গৃহলক্ষ্মী একদিন

সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়ে কবির প্রতীক্ষায় বসে থাকতেন আজ তিনি নেই। তাঁর অভাবে কবিগৃহ অন্ধকার। স্মরণের ২৩-সংখ্যক "সন্ধ্যাদীপ" কবিতায় কবি বলছেন :

বুঝিয়াছি আজি
বহুকর্মকীর্তিখ্যাতি আয়োজনরাজি
শুষ্ক বোঝা হয়ে থাকে, সব হয় মিছে
যদি সেই স্তূপাকার উদ্‌যোগের পিছে
না থাকে একটি হাসি ; নানা দিক হতে
নানা দর্প নানা চেষ্টা সন্ধ্যার আলোতে
এক গৃহে ফিরে যদি নাহি রাখে স্থির
একটি প্রেমের পায়ে শ্রান্ত নতশির।

বলাই বাহুল্য, এসব কবিতায় কবিচিত্তে পত্নীবিয়োগজনিত নিঃসহায় রিক্ততার আর্তিই নিঃসঙ্কোচে নির্বারিত হয়েছে। কবির এই চেতনায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে ইন্দুমতীর বিয়োগে অজের বিলাপচারী কাতরতা। অজ বলছেন, তুমি কি জান না যে, আমি শুধু নামমাত্রই পৃথিবীপতি, আমার যতকিছু আকর্ষণ, যতকিছু অনুরাগ, সে সমস্তই তোমাতে কেন্দ্রীভূত। নন্থু শব্দপতিঃ ক্ষিতেরহং ত্বয়ি মে ভাবনিবন্ধনা রতিঃ ॥ ৮।৫২ ॥

যার মধ্যে পুরুষের ভাবনিবন্ধনারতি সেই সুখদুঃখের অংশভাগিনীর তিরোধানে দুর্বিষহ বেদনার একটি আনুষঙ্গিক চেতনা হল মৃত্যুকামনা। কবি "প্রতীক্ষা" কবিতায় [স্মরণ-৩] বলছেন :

প্রেম এসেছিল, চলে গেল সে যে খুলি দ্বার
আর কভু আসিবে না।
বাকি আছে শুধু আরেক অতিথি আসিবার
তারি সাথে শেষ চেনা।
সে আসি প্রদীপ নিবাইয়া দিবে একদিন,
তুলি লবে মোরে রথে,
নিয়ে যাবে মোরে গৃহ হতে কোন্ গৃহহীন
গ্রহতারকার পথে।

১১

বিলাপচারী শোক স্বভাবতঃই অতীত-স্মৃতিচারী। উৎসর্গের ৩৪-সংখ্যক "গ্রাম" কবিতাটিতে কবির শোকার্ত চিত্তপটে স্মরণের তুলি নানা চিত্র রচনা করেছে। 'আমি যারে ভালোবাসি সে ছিল এই গাঁয়ে।'

এই দিঘি, ঐ আমের বাগান, ঐ যে শিবালয়,
এই আঙিনা ডাকনামে তার জানে পরিচয়।
এই পুকুরে তারি
সাঁতার-কাটা বারি ;
ঘাটের পথ-রেখা তারি চরণ-লেখাময়।

এই চিত্রটি পুনরায় 'মানসী'র "বধূ" কবিতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দুটিরই ভাবানুষঙ্গ প্রায় এক।

'জীবনস্মৃতি' রচনার প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না।" বলেছেন, "জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে—তাহা কোন্ এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় নানা রঙ পড়িয়াছে, তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে,—সে-রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের, সে-রঙ তাহাকে নিজের রসে গুলিয়া লইতে হইয়াছে—সুতরাং, পটের উপর যে-ছাপ পড়িয়াছে তাহা আদালতে সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবে না।"[১৫] শোকাভিহত চিত্তের স্মরণ-সরণি অতিক্রমণের সময় কবির এই উক্তির কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে।

স্মরণের ১৬-সংখ্যক কবিতায় কবি বলছেন :

সূর্যাস্তের স্বর্ণমেঘস্তরে
চেয়ে দেখি একদৃষ্টে,—সেথা কোন্ করুণ অক্ষরে
লিখিয়াছ সে-জন্মের সায়াহ্নের হারানো কাহিনী।
আজি এই দ্বিপ্রহরে পল্লবের মর্মর-রাগিণী
তোমার সে কবেকার দীর্ঘশ্বাস করিছে প্রচার।
আতপ্ত শীতের রৌদ্রে নিজহস্তে করিছ বিস্তার
কত শীতমধ্যাহ্নের সুনিবিড় সুখের স্তব্ধতা।
আপনার পানে চেয়ে বসে বসে ভাবি এই কথা—

কত তব রাত্রিদিন কত সাধ মোরে ঘিরে আছে,
তাদের ক্রন্দন শুনি ফিরে ফিরে ফিরিতেছে কাছে।

কত রাত্রিদিনের কত সাধ—কবিজায়ার কত অপূর্ণ বাসনা কবিকে ঘিরে আজ গুঞ্জরণ করে ফিরছে। তাঁর সকল কথা তিনি মুখ ফুটে বলতে পারেন নি। নিজেকে অজ্ঞাতবাসে রেখে সংসারকে প্রকাশ করে ধরেছিলেন। নিজের অধিকারের দাবি রেখেছিলেন সবার পশ্চাতে। কবি বলছেন :

নতনেত্রে বলো তব জীবনের অসমাপ্ত কথা
ভাষাবাধাহীন বাক্যে। দেহমুক্ত তব বাহুলতা
জড়াইয়া দাও মোর মর্মের মাঝারে একবার—
আমার অন্তরে রাখো তোমার অন্তিম অধিকার।

[স্মরণ-১০।

জীবনে যিনি নিজেকে বঞ্চিত করে রেখেছিলেন তাঁর সকল পাওনা এখন থেকে কবিকে প্রতিদিন প্রতিশোধ করে দিতে হবে। আঁখি-সলিলে হবে তাঁর তর্পণ। কবি বলছেন :

আজিকে তুমি ঘুমাও আমি জাগিয়া রব দুয়ারে,
রাখিব জ্বালি আলো।
তুমি তো ভালো বেসেছ আজি একাকী শুধু আমারে
বাসিতে হবে ভালো।
আমার লাগি তোমার আর হবে না কভু সাজিতে,
তোমার লাগি আমি
এখন হতে হৃদয়খানি সাজায়ে ফুলরাজিতে
রাখিব দিনযামী।

[স্মরণ-২৬।

কবি তাঁর দেবতার চরণে নিজের দোষত্রুটির জন্যে ক্ষমা চেয়ে বলছেন :

তারে যাহা কিছু দেওয়া হয় নাই,
তারে যাহা কিছু সঁপিবারে চাই,
তোমারি পূজার থালায় ধরিনু
আজি সে-প্রেমের হার।

[স্মরণ-২।

১২

মানুষের সংসারে শোকদুঃখ যাই থাক না কেন, প্রকৃতির সংসারে ষড়-ঋতুর লীলা অব্যাহত গতিতেই চলতে থাকে। অগ্রহায়ণে কবিজায়ার তিরোধান। দু-তিন মাস না যেতেই এসেছে বসন্ত। কবি "বসন্ত-যাপন" প্রবন্ধে তাঁর সেদিনকার মনোভাব—শোকার্তচিত্তে বসন্তাগমের প্রভাবের কথা বললেন। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্গদর্শনের ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে। কবি বলেছেন ঃ

"দীর্ঘ শীতের পর আজ মধ্যাহ্নে প্রান্তরের মধ্যে নববসন্ত নিশ্বসিত হইয়া উঠিতেই নিজের মধ্যে মনুষ্যজীবনের ভারি একটা অসামঞ্জস্য অনুভব করিতেছি।...

"বাহিরে চারিদিকেই যখন হাওয়া-বদল, পাতা-বদল, রং-বদল, আমরা তখনো গোরুর গাড়ির বাহনটার মতো পশ্চাতে পুরাতনের ভারাক্রান্ত জের সমানভাবে টানিয়া লইয়া একটানা রাস্তায় ধুলা উড়াইয়া চলিয়াছি। বাহক তখনো যে লড়ি লইয়া পাঁজরে ঠেলিতেছিল,—এখনো সেই লড়ি।...

"বসন্তের দিনে-যে বিবহিণীর প্রাণ হা হা করে, একথা আমরা প্রাচীন কাব্যেই পড়িয়াছি—এখন একথা লিখিতে আমাদের সংকোচ বোধ হয়, পাছে লোকে হাসে। * * * আমরা কি বসন্তের নিগূঢ় রসসঞ্চার-বিকশিত তরুলতাপুষ্পপল্লবের কেহই নই? তাহারা যে আমাদের ঘরের আঙিনাকে ছায়ায় ঢাকিয়া, গন্ধে ভরিয়া, বাহু দিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারা কি আমাদের এতই পর যে, তাহারা যখন ফুলে ফুটিয়া উঠিবে আমরা তখন চাপকান পরিয়া আপিসে যাইব—কোনো অনির্বচনীয় বেদনায় আমাদের হৃৎপিণ্ড তরুপল্লবের মতো কাঁপিয়া উঠিবে না?...

"হায়রে সমাজ-দাঁড়ের পাখি! আকাশের নীল আজ বিরহিণীর চোখ-দুটির মতো স্বপ্নাবিষ্ট, পাতার সবুজ আজ তরুণীর কপোলের মতো নবীন, বসন্তের বাতাস আজ মিলনের আগ্রহের মতো চঞ্চল—তবু তোর পাখাদুটা আজ বদ্ধ, তবু তোর পায়ে আজ কর্মের শিকল ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া বাজিতেছে—এই কি মানবজন্ম।"[১৬]

প্রসঙ্গত, এই উদ্ধৃতিতে "হায়রে সমাজ-দাঁড়ের পাখি"—এই রূপকল্পটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার একটু প্রয়োজন আছে। "মুক্ত পাখির প্রতি" কবিতায় কবি নিজেকে বলেছেন 'খাঁচার পাখি'। এখানে খাঁচার পাখিই হয়েছে 'সমাজ-দাঁড়ের পাখি'। পাখির রূপকল্পটিই আবার ফিরে এসেছে উৎসর্গের প্রথম কবিতা "ভোরের পাখি"র পরিকল্পনায়। কিন্তু সে প্রসঙ্গে আমাদের আবার ফিরে আসতে হবে।

"বসন্তযাপন" প্রবন্ধের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে 'স্মরণে'র ১৯ ও ২০-সংখ্যক কবিতা এবং 'উৎসর্গে'র ৩৫-সংখ্যক "চৈত্রের গান" কবিতাটি। স্মরণের ১৯-সংখ্যক কবিতাটির শিরোনামা "বসন্ত"। কবি বলছেন, পাগল বসন্ত-দিন কতবার তাঁদের দুজনের ডাকে বীণাহাতে অতিথির বেশে এসেছে। কবি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন, কবিজায়াও তার ডাকে সাড়া দেন নি। আজ কবির পাশে কবিজায়া নেই। আজ আবার এসেছে বসন্ত।—

> আজ তুমি চলে গেছ, সে এল দক্ষিণ-বায়ু বাহি,
> আজ তারে ক্ষণকাল ভুলে থাকি হেন সাধ্য নাহি।
> আনিছে সে দৃষ্টি তব, তোমার প্রকাশহীন বাণী,
> মর্মরি তুলিছে কুঞ্জে তোমার আকুল চিত্তখানি।
> মিলনের দিনে যারে কতবার দিয়েছিনু ফাঁকি,
> তোমার বিচ্ছেদ তারে শূন্যঘরে আনে ডাকি ডাকি।
>
> [স্মরণ-১৯।

স্মরণের ২০-সংখ্যক কবিতার নাম "উৎসব"। কবি নিজেই বসন্তকে ডেকে বলছেন, 'এসো বসন্ত, এস আজ তুমি আমার দুয়ারে এস।' 'বেদনা আমার ধ্বনিত করিয়া কর তব উৎসব।'

> সেই কলরবে অন্তর মাঝে
> পাব, পাব আমি সাড়া
> দ্যুলোকে ভূলোকে বাঁধি এক দল
> তোমরা করিবে যবে কোলাহল,
> হাসিতে হাসিতে মরণের দ্বারে,
> বারে বারে দিবে নাড়া—

সেই কলরবে অন্তর মাঝে
পাব, পাব আমি সাড়া।

উৎসর্গের "চৈত্রের গান" কবিতায় কবি তাঁর কর্মহারা সৃষ্টিছাড়া মনকে সম্বোধন করে বলছেন:

আজকে নবীন চৈত্র মাসে
পুরাতনের বাতাস আসে,
খুলে গেছে যুগান্তরের সেতু।
মিথ্যা আজি কাজের কথা,
আজ জেগেছে যে-সব ব্যথা
এই জীবনে নাইকো তাহার হেতু।

কবি বলছেন

সোনার তুলি দিয়া লিখা
চৈত্রমাসের মরীচিকা
কাঁদায় হিয়া অপূর্বধন-তরে।

গাছের পাতা যেমন কাঁপে
দখিন-বায়ে মধুর তাপে
তেমনি মম কাঁপছে সারা প্রাণ।
কাঁপছে দেহে কাঁপছে মনে
হাওয়ার সাথে আলোর সনে,
মর্মরিয়া উঠছে কলতান।

দূর আকাশের ঘুম-পাড়ানি
মৌমাছিদের মন-হারানি
জুঁই-ফোটানো ঘাস-দোলানো গান,
জলের গায়ে পুলক-দেওয়া
ফুলের গন্ধ কুড়িয়ে নেওয়া
চোখের পাতে ঘুম-বোলানো তান।

এই 'জুঁই-ফোটানো ঘাস-দোলানো গান', আর 'চোখের পাতে ঘুম-বোলানো

তান' খেয়া কাব্যগ্রন্থের "শেষ খেয়া"র 'ওপারেতে সোনার কূলে আঁধারমূলে কোন্ মায়া গেয়ে গেল কাজ-ভাঙানো গানে'র সুরটির সঙ্গেই একসূত্রে বাঁধা।

১৩

বিরহের দিনে প্রেমিকের চিত্ত যেমন অতীত-স্মৃতিচারী হয় তেমনি গভীর অনুধ্যানের মুহূর্তে সে-চিত্তে তত্ত্ব চিন্তারও উদয় হয়। মৃত্যুতত্ত্ব, মিলনতত্ত্ব। উৎসর্গের ৩৮ সংখ্যক "বিশ্বদোল" কবিতায় কবি মৃত্যুতত্ত্বের কথা বলছেন। মৃত্যু তো মহাকালের চিরকালের লীলা।—

ডান হাত হতে বাম হাতে লও,
বাম হাত হতে ডানে।
নিজধন তুমি নিজেই হরিয়া
কী যে কর কে বা জানে।

এই তত্ত্বদৃষ্টিতে মৃত্যু তো বিলুপ্তি নয়। এই পরম বিশ্বাসেই কবি বলেন:

আছে তো যেমন যা ছিল।
হারায় নি কিছু ফুরায় নি কিছু
যে মরিল যে বা বাঁচিল।

* * *

আছে সেই আলো, আছে সেই গান,
আছে সেই ভালোবাসা।
এইমতো চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া, শুধু আসা।

'আছে সেই আলো, আছে সেই গান, আছে সেই ভালোবাসা।' পরম নাস্তিচেতনায় দাঁড়িয়ে এই অস্তিবাদ-ঘোষণার মধ্যেই প্রেমতত্ত্ব ও মিলনতত্ত্বের মূল কথাটি বলা হয়ে গেছে। কবিজায়া একদিন বধূবেশে তাঁর সংসারে এসেছিলেন। 'সে কি অদৃষ্টের খেলা, সে কি অকস্মাৎ'? কবি বলেছেন, না, তা নয়,—

শুধু এক মুহূর্তের এ নহে ঘটনা,
অনাদি কালের এই আছিল মন্ত্রণা।

দোঁহার মিলনে মোরা পূর্ণ হব দোঁহে,
বহু যুগ আসিয়াছি এই আশা বহে।
[স্মরণ-১৫]

দাম্পত্যমিলনের মধ্যে এই যুগলতত্ত্বই বিশ্বতত্ত্ব। স্মরণের "দ্বৈতরহস্য" কবিতায় এই তত্ত্বই অবিস্মরণীয় কাব্যরূপ পেয়েছে :

যে ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী
আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি ;
* * *
যে-ভাবে পরম-এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ,
দুয়ের মিলনঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণ-গন্ধ-গীত করিছে রচনা,
হে রমণী, ক্ষণকাল আসি মোর পাশে
চিত্ত ভরি দিলে সেই রহস্য-আভাসে।

১৪

দ্বৈতমিলনের সেই রহস্য-আভাস মিলনের চেয়ে বিরহের মধ্যেই স্ফুটতর হয়ে ওঠে। বিরহরসিক কবি বলেছেন, সঙ্গম ও বিরহের মধ্যে বিরহই অধিকতর কাম্য, কেন না মিলনে সেই একলা থাকে, বিরহে ত্রিভুবন সে-ময় হয়ে যায়। 'সঙ্গে সৈব তথৈকা, ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।' এই ত্রিভুবন-তন্ময়-হয়ে-যাওয়া চেতনাকেই কবি অনুভব করেছেন স্মরণের ৬-সংখ্যক "আহ্বান" কবিতায় :

আজি বিশ্বদেবতার চরণ-আশ্রয়ে
গৃহলক্ষ্মী দেখা দাও বিশ্বলক্ষ্মী হয়ে।
নিখিল নক্ষত্র হতে কিরণের রেখা
সীমন্তে আঁকিয়া দিক্‌ সিন্দুরের লেখা।
একান্তে বসিয়া আজি করিতেছি ধ্যান
সবার কল্যাণে হ'ক তোমার কল্যাণ

[illegible]-সংখ্যক "লক্ষ্মী-সরস্বতী" কবিতায় পাই :

হে লক্ষ্মী, তোমার আজি নাই অন্তঃপুর।
সরস্বতী-রূপ আজি ধরেছ মধুর,
দাঁড়ায়েছ সংগীতের শতদল-দলে।
মানস-সরসী আজি তব পদতলে
নিখিলের প্রতিবিম্বে রচিছে তোমায়।

*　　　*

সেই বিশ্বমূর্তি তব আমারি অন্তরে
লক্ষ্মী-সরস্বতী-রূপে পূর্ণরূপ ধরে।

কিন্তু এতেই কবি তৃপ্ত নন। গৃহলক্ষ্মীকে বিশ্বলক্ষ্মীরূপে পাওয়ার মধ্যে কল্পনার প্রসার যতই থাক্, দেহধারী মানুষ তাতে পরিপূর্ণ সান্ত্বনা পেতে পারে না। সে দেহরূপের মধ্যেই পুনর্মিলনের জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মৃত্যুত্তীর্ণ এই পুনর্মিলনের চেতনাতেই কবির শোককাব্য একটি সার্থক পরিসমাপ্তি রচনা করেছে। তারই উপলব্ধি স্মরণের নানা কবিতায় ছড়িয়ে আছে। ৮-সংখ্যক "মিলন" কবিতায় কবি বলছেন :

মিলন সম্পূর্ণ আজি হল তোমা সনে
এ বিচ্ছেদ-বেদনার নিবিড় বন্ধনে।
এসেছ একান্ত কাছে, ছাড়ি দেশকাল
হৃদয়ে মিশায়ে গেছ ভাঙি অন্তরাল।

১১-সংখ্যক "নবপরিচয়" কবিতায় কবি বলছেন :

মৃত্যুর নেপথ্য হতে আরবার এলে তুমি ফিরে
নূতন বধূর সাজে হৃদয়ের বিবাহ-মন্দিরে
নিঃশব্দ চরণপাতে। *　　*　　*
　　　　　　মরণের সিংহদ্বার দিয়া
সংসার হইতে তুমি অন্তরে পশিলে আসি, প্রিয়া।

১৭-সংখ্যক "অশোক" কবিতায় পাই :

বজ্র যথা বর্ষণেরে আনে অগ্রসরি
কে জানিত তব শোক সেইমতো করি

আনি দিবে অকস্মাৎ জীবনে আমার
বাধাহীন মিলনের নিবিড় সঞ্চার।

১৮-সংখ্যক কবিতায় তাই দেখি বিশ্বলক্ষ্মী আবার জীবনলক্ষ্মী হয়ে কবিজীবনে ফিরে এসেছেন।—

সংসার সাজায়ে তুমি আছিলে রমণী ;
আমার জীবন আজি সাজাও তেমনি
নির্মল সুন্দর করে। * * *
* * *
যেথা মোর পূজাগৃহ নিভৃত মন্দিরে
সেথায় নীরবে এস দ্বার খুলি ধীরে—
* * *
সেথা দুইজনে
দেবতার সম্মুখেতে বসি একাসনে।

নিভৃত মন্দিরের পূজাগৃহে জীবনসঙ্গিনীকে নূতন করে আহ্বান করার এই বাসনাই ভাষা পেয়েছে উৎসর্গের ৪৩-সংখ্যক "নারী" কবিতায় :

সাঙ্গ হয়েছে রণ।
অনেক যুঝিয়া অনেক খুঁজিয়া
শেষ হল আয়োজন।
* * *
স্নিগ্ধ-হসিত বদন-ইন্দু
সিঁথায় আঁকিয়া সিঁদুর-বিন্দু,
মঙ্গল করো, সার্থক করো
শূন্য এ মোর গেহ।
এসো কল্যাণী নারী
বহিয়া তীর্থবারি।
* * *
অবারিত করি ব্যথিত বক্ষ
খোলো হৃদয়ের গোপন কক্ষ,
এলো-কেশপাশে শুভ্র-বসনে

জ্বালাও পূজার বাতি।
এসো তাপসিনী নারী,
আনো তর্পণবারি।

এই নব-মিলনাভিলাষই নানা রহস্যানুভূতির মধ্য দিয়ে পুনর্মিলনের নব নব চেতনার স্তর রচনা করেছে। উৎসর্গের ১১-সংখ্যক কবিতায় কবি বলছেন:

না জানি কারে দেখিয়াছি,
দেখেছি কার মুখ।
প্রভাতে আজ পেয়েছি তার চিঠি।

উৎসর্গের ৪৪-সংখ্যক "ঝরনাতলা" কবিতায় এই নবমিলন-রহস্যটি অতীন্দ্রিয় অনুভবের রূপকে প্রকাশিত হয়েছে। 'আমাদের এই পল্লীখানি পাহাড় দিয়ে ঘেরা।' সেখানে দেবদারুর কুঞ্জে রাখালেরা ধেনু চরায়। এই মায়াপল্লীতে ওই বনের ধারে ভুট্টাক্ষেতের পাশে ছায়াতলে যেখানে ঝরনার জল ঝরে সেখানে ছিল কবিজায়ার নিবাস। কবি আজ আকাশে চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করছেন:

ওগো তুমি কেমন আছ, আছ মনের সুখে?
খোলা আকাশতলে হেথা ঘর কোথা কোন্ মুখে?
নাইকো পাহাড়, কোনোখানে ঝরনা নাহি ঝরে,
তৃষ্ণা পেলে কোথায় যাবে বারিপানের তরে?

কবিজায়া বলছেন, সেই পল্লী, সেই পাহাড়, সেই ঝরনা—সবই আছে। তখন কেঁদে কবি বলছেন, 'সবই আছে, আমরা তো নেই।'—কবির এই কাতরোক্তির উত্তর এল:

সে কহিল করুণ হেসে, "আছ হৃদয়-মূলে।"
স্বপন ভেঙে চেয়ে দেখি আছি ঝরনাকূলে।

কবিজায়ার সঙ্গে কবির এই নবমিলনের লগ্ন হল গোধূলি ও সন্ধ্যা। উৎসর্গের ৩৬-সংখ্যক "সন্ধ্যা" কবিতায় এই নব-মিলনের কথা কবি আমাদের শুনিয়েছেন। কবি পশ্চিমেতে দুটি নয়ন মেলে অস্তলোকের কাছাকাছি বসেছিলেন। তখন তাঁর মনে এলো সন্ধ্যামিলনের স্বপ্ন। কবি বলছেন:

মোর ভালে ঐ কোমল হস্ত
এনে দেয় গো সূর্য-অস্ত,

এনে দেয় গো কাজের অবসান,
সত্য মিথ্যা ভালোমন্দ
সকল সমাপনের ছন্দ
সন্ধ্যানদীর নিঃশেষিত তান।

* * *

যেমনি তব দখিন-পাণি
তুলে নিল প্রদীপখানি
রেখে দিল আমার গৃহকোণে।
গৃহ আমার একনিমেষে
ব্যাপ্ত হল তারার দেশে
তিমিরতটে আলোর উপবনে।
আজি আমার ঘরের পাশে
গগনপারের কারা আসে
অঙ্গ তাদের নীলাম্বরে ঢাকি।
আজি আমার দ্বারের কাছে
অনাদি রাত স্তব্ধ আছে
তোমার পানে মেলি তাহার আঁখি।

স্মরণের ২৩ ও ২৪-সংখ্যক "সন্ধ্যাদীপ" ও "গোধূলি" শীর্ষক কবিতায়ও একই চেতনা ভাষা পেয়েছে। এই চেতনাই অপূর্ব কাব্যরূপ লাভ করেছে খেয়ার "গোধূলি লগ্ন" কবিতায়। গোধূলির আবির্ভাবে কবি বলছেন :

আমার গোধূলি-লগন এল বুঝি কাছে
গোধূলি-লগন রে।
বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে আসে
সোনার গগন রে।

বলাই বাহুল্য, স্মরণের ১১-সংখ্যক কবিতায় কবি মরণের সিংহদ্বার দিয়ে যাঁর আবির্ভাবের কথা বলেছেন, যিনি কবিজীবনে "নূতন বধুর সাজে হৃদয়ের বিবাহ-মন্দিরে নিঃশব্দ চরণপাতে" এসেছেন, তাঁর সঙ্গেই মিলনের জন্যে গোধূলি-লগ্ন বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে উঠেছে।

এই নবমিলনের আশ্বাসেই প্রিয়ার মৃত্যুজনিত বিরহ-বেদনা এক অভিনব

আনন্দের প্রতিশ্রুতি বহন করে এনেছে। খেয়ার "প্রভাতে" কবিতাটি কবিহৃদয়ের সেই অশ্রুসরোবরে আনন্দ-পদ্ম-বিকাশেরই রহস্য-কাহিনী। কবিজায়ার তিরোভাবে কবির প্রথম কবিতা ছিল "মুক্ত পাখির প্রতি"। সেদিন দিগ্‌দিগন্ত জুড়ে আকাশভুবন গহন কালিমায় ছিল অবলুপ্ত। মৃত্যুর সেই তমসাতীরে দাঁড়িয়ে মুক্ত পাখির প্রতি কবির প্রার্থনা ছিল—

হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
তোমার চরণে নাহি তো লৌহডোর।
সকল মেঘের ঊর্ধ্বে যাও গো উড়িয়া,
সেথা ঢালো তান বিমল শূন্য জুড়িয়া,—
"নেবে নি, নেবে নি প্রভাতের রবি"
কহ আমাদের ডাকি,
মুদিয়া নয়ান শুনি সেই গান
আমরা খাঁচার পাখি।

বঙ্গদর্শনের ১৩১০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত 'উৎসর্গে'র প্রথম কবিতা— "ভোরের পাখি"তে কবি বলছেন :

এত আঁধারমাঝে তোমার
এতই অসংশয়!
বিশ্বজনে কেহই তোরে
করে না প্রত্যয়।
তুমি ডাক, "দাঁড়াও পথে,
সূর্য আসেন স্বর্ণরথে,
রাত্রি নয়, রাত্রি নয়,
রাত্রি নয় নয়।"
এত আঁধার মাঝে তোমার
এতই অসংশয়।

ভোরের পাখির এই অসংশয় আলোকের আহ্বানসংগীতেই বিরহবিদীর্ণ কবিহৃদয় সাড়া দিয়েছে। এই অনুভূতির কথাই খেয়ার "প্রভাতে" কবিতায় পরিস্ফুট। জীবনে আঁধার সত্য নয়, আলোই সত্য। 'জীবনস্মৃতি'র

"মৃত্যুশোক" অধ্যায়ে পরম বেদনার মধ্যে দাঁড়িয়েই কবি এই সত্য ঘোষণা করেছেন। "প্রভাতে" কবিতায় কবি বলছেন :

এক রজনীর বরষণে শুধু
কেমন করে
আমার ঘরের সরোবর আজি
উঠেছে ভরে।

হেরো হেরো মোর অকূল অশ্রু-
সলিলমাঝে
আজি এ অমল কমলকান্তি
কেমনে রাজে।
একটিমাত্র শ্বেতশতদল
আলোক-পুলকে করে ঢলঢল
কখন ফুটিল বল্ মোরে বল্
এমন সাজে
আমার অতল অশ্রু-সাগর-
সলিলমাঝে !

কবিজায়ার মৃত্যুতে শোকের অতল অশ্রুসিন্ধুতে নিমজ্জিত কবি অবশেষে পেলেন আলোক-পুলকে ঢলঢল-করা একটি মাত্র শ্বেতশতদল। মৃত্যুর অন্ধকার বিরহ-রজনী পেরিয়ে চিরমিলনের প্রভাতে এই পরম প্রাপ্তিতেই কবিহৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠল। কবি বলছেন :

আজি একা বসে ভাবিতেছি মনে
ইহারে দেখি,
দুখ-যামিনীর বুকচেরা ধন
হেরিনু এ কী।
ইহারই লাগিয়া হৃদ্‌বিদারণ,
এত ক্রন্দন, এত জাগরণ,
ছুটেছিল ঝড় ইহারই বদন
বক্ষে লেখি।

দুখ-যামিনীর বুকচেরা ধন
হেরিনু এ কী।

এই হৃদ্‌বিদারণ, 'এত ক্রন্দন' 'এত জাগরণ', পেরিয়ে অবশেষে জীবনরসিক কবি খুঁজে পেলেন অশ্রুসাগর-সলিলে উদ্ভাসিত অমলকান্তি হৃদয়ের আনন্দ-কমলটিকে। কবিজায়ার মৃত্যুর তমসাচ্ছন্ন অমানিশার অবসানে কবিজীবনে ফুটে উঠল প্রভাত-আলোর শুভ্র শতদল-পদ্ম।

উল্লেখপঞ্জী

১ রবীন্দ্রজীবনী-২, তৃতীয় সং°, পৃ° ৪৯।

২ কবিমানসী-১, পৃ° ২৭২।

৩ শনিবারের চিঠি, আষাঢ়, ১৩৬৭।

৪ কবিমানসী-১, পৃ° ৩০৫।

৫ দ্রষ্টব্য, 'সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ', পৃ° ২১৯-২৪৯।

৬ ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ২৫১, পৃ° ৫১৩।

৭ "বাঁধন", 'বিস্মরণী'।

৮ দ্রষ্টব্য, উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৫১), প্রথম খণ্ড, পৃ° ২২৪।

৯ তদেব।

১০ প্রথম ওরিয়েণ্ট সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৬০, পৃ° ৩৫৬-৩৫৭।

১১ Rabindranath Tagore: A Biography, সং° ১৯৬২, পৃ° ১৯৭-৯৮।

১২ দ্রষ্টব্য, কবিমানসী-১, পৃ° ২৪৮।

১৩ মোহিতচন্দ্র সেনকে লেখা পত্র। দ্রষ্টব্য, কবি-মানসী-১, পৃ° ২৬৪।

১৪ তদেব। পৃ° ২৬৫।

১৫ জীবনস্মৃতি, দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্ররচনাবলী-১৭, পৃ° ২৬৩।

১৬ বিচিত্রপ্রবন্ধ, পৃ° ৮৫-৯০।

চতুর্থ অধ্যায়

ভিক্টোরিয়া : বিদেশী ফুল

১

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে "বিজয়া" শীর্ষক ত্রয়োদশ অধ্যায়ে কবিজীবনে মাদাম ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। ভিক্টোরিয়া জন্মসূত্রে দক্ষিণ-আমেরিকার অধিবাসিনী। কিন্তু দীক্ষাসূত্রে ভারতকন্যা। তাঁর দুই গুরু—মহাত্মা গান্ধী আর মহাকবি রবীন্দ্রনাথ। তিনি অকুণ্ঠ ভাষায় তাঁর গুরু-ঋণ স্বীকার করে বলেছেন :

"This wisdom, which in my case is not wisdom but rather feeling and intuition, I owe in great part to two men born in a distant land, belonging to a civilization and a race apparently different from mine (if not in their roots at least in their branches): Gandhiji and Gurudev. The former, I saw and heard only once, in 1931. As to the latter, to my lasting happiness, our paths were to cross and intermingle."[১]

ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যখন দেখা হয় তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স চৌষট্টি। ভিক্টোরিয়া উত্তর তিরিশ। রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভিক্টোরিয়ার মনোভাবকে আমাদের অলংকারকৌস্তুভের ভাষায় বলা যেতে পারে ভাবরতি।

১৯২৪-এর নভেম্বর-ডিসেম্বরে দক্ষিণ-আমেরিকার সান-ইসিড্রোতে বসন্ত ছিল অজস্র গোলাপের সৌরভে আমোদিত। এই অপূর্ব-সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে ভিক্টোরিয়া তাঁর প্রাণের প্রিয় কবির জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি বলেছেন :

"That spring was, in San Isidro, limpid and warm, with an extraordinary abundance of roses. I used to spend the mornings in my room, with all the windows open, smelling them, reading Tagore, thinking of Tagore, writing to Tagore, waiting for Tagore."[২]

রবীন্দ্রনাথ ভিক্টোরিয়ার প্রিয় কবি, কেন না রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'

তাঁর এক আধ্যাত্মিক সংকটে তাঁর মনকে সান্ত্বনা ও আশ্রয় দিয়েছিল। যে-কবির কাব্য তাঁর মানস-সংকটে দ্বিগুণিত আশীর্বাদ হয়ে এসেছিল তাঁকে দেখবার পরম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বসেছিলেন ভিক্টোরিয়া। 'গীতাঞ্জলি'র কবিতাই তিনি বার বার আবৃত্তি করছিলেন :

"If it is not my portion to meet thee in this my life then let me ever feel that I have missed thy sight—let me not forget for a moment, let me carry the pangs of this sorrow in my dreams and in my wakeful hours."

মূল বাংলা কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু
এবার এ জীবনে,
তবে তোমায় আমি পাই নি যেন
সে-কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই,
শয়নে স্বপনে।

ভিক্টোরিয়া বলছেন, এই পঙ্‌ক্তিগুলি কণ্ঠে নিয়ে, আমি স্পষ্ট বলতে পারব না, আমি কার প্রতীক্ষায় বসেছিলাম—রবীন্দ্রনাথের, না রবীন্দ্রনাথের দেবতার। কবির প্রতি অনুরাগিণী ভক্তের এই প্রতীক্ষাই পূর্ণ হল রবীন্দ্রনাথের আগমনে।

কিন্তু স্বভাব-কর্ত্রীত্বশালিনী ভিক্টোরিয়া তাঁর প্রিয় কবির সাক্ষাৎ-দর্শনে সমস্ত মুখরতা হারিয়ে ফেললেন। তিনি লিখছেন :

"I felt frozen by the sudden and real presence of this distant man with whom my dreams had made me so familiar and who had been so close to my heart when all I had known of him were his poems. This is the usual reaction of shy people when faced by those whom they are eager to meet."[৩]

একলা কবির সামনে বসলে তাঁর আত্মপ্রকাশের সমস্ত ক্ষমতা হারিয়ে যেত। **"When we were alone together, shyness deprived me of all means of expression."[৪]** অনুরাগিণীর এই সলজ্জ মধুর নীরবতাই "বিদেশী ফুল" কবিতার জন্ম দিয়েছে। আমরা প্রথম খণ্ডে তার উল্লেখ করেছি।

২

রবীন্দ্রনাথের নিজের দিক থেকে তাঁর সারা জীবনের কাব্যসাধনার এ এক দুর্লভ পুরস্কার। প্রাচীন কালের কবির ভাগ্যকে আধুনিক কালের কবি ঈর্ষার চোখে দেখেছেন। কবি বলছেন :

জন্মেছি ছাপার কালিদাস হয়ে।
তোমরা আধুনিক মালবিকা,
কিনে পড় কবিতা
আরামকেদারায় বসে।
চোখ বুজে কান পেতে শোন না ;
শোনা হলে
কবিকে পরিয়ে দাও না বেলফুলের মালা ;
দোকানে পাঁচসিকে দিয়েই খালাস।[৫]

শুধু বেলফুলের মালা নয়, কবির কণ্ঠে অনুরাগের মালা পরিয়ে দিলেন ভিক্টোরিয়া—তাঁর সাগরপারের মালবিকা। একটি গানে কবি তাঁকে বলেছেন তুলনাহীনা। "সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে।" শুধু কবিরই ভাবতন্ময় দৃষ্টিতে নয়, পৃথিবী-পরিব্রাজক দার্শনিক কাইজারলিংও তাঁকে একই বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। বলেছেন, ভিক্টোরিয়া এমন এক নারী যাঁর সর্বাতিশায়ী গরিমা প্রশ্নের অতীত। ভিক্টোরিয়া সারস্বতকন্যা। এমন ভক্ত-পাঠিকার অনুরাগ যে-কোন কবির পক্ষেই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধের ধন। বলাই বাহুল্য কবিচিত্ত অনুরঞ্জিত হল।

এই ভ্রমণে কবির একমাত্র সঙ্গী ছিলেন লিওনার্ড এল্‌মহার্স্ট। পাঁচ বছর পরে কবি সেই-দিনগুলির কথা স্মরণ করে এল্‌মহার্স্টকে লিখছেন :

"The picture appeared to me so distant and yet so vividly near. The whole scene was exotic in character offering no associations with which we were familiar. The vision of it broughr to me a happiness that made me feel almost sad, for it was of a kind that could no longer be

repeated to-day. We two were unequal in age, but I was not aware of the difference for a moment, and our companionship was so utterly simple and intimate. I think you were the only one who closely came to know me when I was young and old at the same time."[৬]

কবি যখন একই সঙ্গে তরুণ ও প্রবীণ ছিলেন তখনকার কবিচিত্তের কথাই ধরা পড়েছে বুয়েনোস-এয়ারিস, সান-ইসিড্রো, চাপাড-মালালে লেখা কবিতাগুচ্ছে। একই সঙ্গে তরুণ ও প্রবীণ! দক্ষিণ-আমেরিকা যাত্রার সমুদ্রপথে হারুনা-মারু জাহাজে বসে কবি ১৯২৪ সনের ৫ই অক্টোবর যে ডায়ারি লেখেন তাতে একটা দশ-বারো বছরের ছেলের কথা আছে যে-ছেলেটি খোলা ছাদে খালি গায়ে যা-খুশি করে বেড়ায়। কবি বলছেন আকাশের আলিঙ্গনে-বাঁধা ওই ভোলামন ছেলেটিতে একটি নিত্যকালের কথা আছে। কবির মনে হচ্ছে, ওই ছেলেটার কথা তাঁরই খুব ভিতরের কথা, গেলমালে অনেককাল তার দিকে চোখ পড়ে নি।[৭]

বস্তুত, বুয়েনোস-এয়ারিসে পৌঁছে কবির দ্বিতীয় কবিতার নাম "কিশোর প্রেম"। তার শেষ অনুচ্ছেদটি সেদিনকার কবিমানসের বাণীরূপ। কবি বলছেন ঃ

পারে যাওয়ার উধাও পাখি সেই কিশোরের ভাষা,
প্রাণের পারের কুলায় ছাড়ি
শূন্য আকাশ দিল পাড়ি,
আজ এসে মোর স্বপন মাঝে পেয়েছে তার বাসা,
আমার সেই কিশোরের ভাষা।

সেই কিশোরের ভাষাতেই পরবর্তী কবিতাগুলি বিরচিত। ভিক্টোরিয়াও তাঁর প্রিয়-কবির মধ্যে একটি শিশু-সত্তাকে আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি বলছেন, কোন কোন দিক দিয়ে কবি ছিলেন একেবারে শিশুর মত। "In some ways Tagore was like a child." শুধু তাই নয়, বয়সে তাঁর পিতার সমান এই বিদেশী কবির প্রতি তিনি মাতৃসুলভ কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ হতেন এবং তাঁকে কখনও কখনও শিশুর মতই গ্রহণ করতেন। কবি তখন ইনফ্লুয়েঞ্জায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। বস্তুত, জাহাজে থাকতেই তাঁর

অসুস্থতা শুরু হয়। তাতে তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের ওপরও চাপ পড়েছিল। ডাক্তারেরা তাঁকে এক-সপ্তাহ সম্পূর্ণ বিশ্রাম করতে বলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর আর পেরু যাওয়া হল না, সান-ইসিড্রোয় এক সপ্তাহের বদলে তিনি থাকলেন এক মাস কুড়ি দিন। এই এক মাস কুড়ি দিন ভিক্টোরিয়ার জীবনে পরম আশীর্বাদ হয়ে এল। তিনি তাঁর মনোভাব প্রকাশ করে বলছেন, "To say I did not bless the 'flu', in spite of the concern it caused me, would be a lie."[৮] অনুরাগ প্রকাশের ভাষা এর চেয়ে সুন্দর আর কী হতে পারে!

৩

ভিক্টোরিয়াকে নিয়ে লেখা কবিতাগুচ্ছকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'অলস মুহূর্তের ছায়াতলে বেড়ে-ওঠা একগুচ্ছ লাজুক ফুল।' একখানি পত্রে তিনি বলেছেন, "···to-day I discover that my basket, while I was there, was being daily filled with shy flowers of poems that thrive under the shade of lazy hours."[৯]

কবির এই নব-অনুভূতির সঙ্গে ঋজু বা তির্যগ্‌ভাবে সম্পৃক্ত ছাব্বিশটি কবিতা দিয়ে এই 'লাজুক ফুলের গুচ্ছ' রচিত হয়েছে। এই কবিতা-ষড়বিংশতির কালানুক্রমিক তালিকা নিয়ে দেওয়া হল :

১০ নভেম্বর ১৯২৪	বুয়েনোস-এয়ারিস	শীত
১১ ”	”	কিশোর প্রেম
১১ ”	”	প্রভাত
১২ ”	”	বিদেশী ফুল
১৫ ”	”	অতিথি
১৬ ”	”	অন্তর্হিতা
১৭ ”	”	আশঙ্কা
২১ ”	”	শেষ বসন্ত
২২ ”	”	বিপাশা
২৬ ”	”	চাবি
২৭ ”	”	বৈতরণী

১	ডিসেম্বর	বুয়েনোস-এয়ারিস	প্রভাতী
৪	”	”	মধু
৭	”	”	অদেখা
১০	”	”	চঞ্চল
১১	”	”	প্রবাহিণী
১৬	”	চাপাড মালাল	আকন্দ
১৭	”	”	কঙ্কাল
২৪	”	বুয়েনোস-এয়ারিস	না-পাওয়া
২৫	”	”	সৃষ্টিকর্তা
২৭	”	সান-ইসিড্রো	বীণাহারা
২৮	”	”	বনস্পতি
২৯	”	”	পথ
৯	জানুয়ারি ১৯২৫,	জুলিয়ো চেজারে জাহাজে	মিলন
১০	”	”	অন্ধকার
১৭	”	”	বদল

৪

এই কবিতাগুচ্ছের “শীত”, “বৈতরণী” ও “কঙ্কাল”—এই তিনটি কবিতায় কবিমানসে জরা বার্ধক্য ও মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব, এবং কবি কর্তৃক তা অস্বীকার করার অনুভূতি ভাষা পেয়েছে। “শীত” কবিতায় কবির জিজ্ঞাসা—

শীতের হাওয়া হঠাৎ ছুটে এল
গানের বেলা শেষ না হতে হতে ?

এর উত্তর কবি নিজের অন্তরের সারস্বত বিশ্বাসের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন। তাই কবিতার অন্তিম স্তবকে তিনি বলছেন :

মন যে বলে, নয় কখনোই নয়,
ফুরায়নি তো, ফুরাবার এই ভান ;
মন যে বলে, শুনি আকাশময়
যাবার মুখে ফিরে আসার গান।

যাবার মুখে এই ফিরে আসার গানের একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এ গানগুলি আসলে প্রেমের গান। কবি বলছেন, তাঁর মনের কথা শীর্ণ শীতের লতা নগ্ন-শাখার ফাঁকে ফাঁকে হিমের রাতে লুকিয়ে রাখে, ফাল্গুনেতে তাঁর প্রিয়ার চরণমূলে ফুলে ফুলে ফিরিয়ে দেবে বলেই। শীতের জরাকে জয় করার পরেই কবিচিত্তে দেখা দিল মৃত্যুর বৈতরণী। তরল খড়্গের মত ধারা তার। কবি বলছেন, তাঁর বিশ্বের আলোতে কতবার বৈতরণীর খেয়ার তরণী এসে তাঁর কত উৎসবের বাতি কালহীন বিলুপ্তির কালোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু কবি বলছেন, অদৃশ্যের উপকূলে যেখানে ধরণী তার শেষসীমায় থেমে গেছে, সেই নির্জনে মৃত্যুর অরূপতলে সব রূপ পূর্ণ হয়ে ফোটে, সব গান দীপ্ত হয়ে ওঠে শ্রাবণের পরপারে মৃত্যুর 'নিঃশব্দের কণ্ঠহারে'। তাই কবি বলছেন:

যে-সুন্দর বসেছিল মোর পাশে এসে
ক্ষণিকের ক্ষীণ ছদ্মবেশে,
যে চির-মধুর।
দ্রুতপদে চলে গেল নিমেষের বাজায়ে নূপুর,
প্রলয়ের অন্তরালে গাহে তারা অনন্তের সুর।

* * *

চিত্তের নিশীথ রাত্রে গাঁথে তারা নক্ষত্রমালিকা;
অনির্বাণ অলোকেতে সাজায় অক্ষয় দীপালিকা।

প্রেমের মন্ত্রই যে মৃত্যু-বিজয়ের মন্ত্র, এই সত্যই এ কবিতার ফলশ্রুতি। এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা "কঙ্কাল"। কবিকণ্ঠ সেখানে বলিষ্ঠ। মাঠের পথের একপাশে ঘাসের ওপর পশুর কঙ্কাল পড়ে আছে। পাণ্ডু অস্থিরাশি যেন কালের নীরস অট্টহাসি। কবি বলছেন:

সে যেন রে মরণের অঙ্গুলিনির্দেশ,
ইঙ্গিতে কহিছে মোরে, একদা পশুর যেথা শেষ,
সেথায় তোমারো অন্ত, ভেদ নাহি লেশ।
তোমারো প্রাণের সুরা ফুরাইলে পরে
ভাঙা পাত্র পড়ে রবে অমনি ধূলায় অনাদরে।

কবি বলছেন, বিধির এই বৃহৎ পরিহাস তিনি কিছুতেই নন। অসীম ঐশ্বর্য দিয়ে রচিত এই মহৎ সর্বনাশ তাঁর নিয়তি নয়। কেন না তিনি শূন্যময়

আঁধার প্রান্তরে জ্যোতির্ময় আত্মস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন—তাই তাঁর কণ্ঠে মৃত্যুবিজয়ের অভীক বাণী উচ্চারিত হয়েছে :

আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপমধু পান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান,
অনন্ত মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে,
দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে।

এই কবিতাত্রয়ে উচ্চারিত মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীতই কবিজীবনের প্রৌঢ়-বসন্তে তাঁর প্রেমচেতনার প্রেক্ষাপট রচনা করেছে।

৫

কবির প্রৌঢ়-বসন্তের এই প্রেমচেতনায় আবিষ্ট কবিমানসের আত্মপরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে "প্রভাত", "শেষ বসন্ত", "চাবি", "প্রভাতী", "মধু", "অদেখা", "চঞ্চল", "প্রবাহিণী" ও "বনস্পতি" কবিতায়। "চাবি" কবিতায় কবির একটি সুকুমার বাসনা ভাষা পেয়েছে। বিধাতা তাঁর মনকে বহু কক্ষে ভাগ-করা হর্ম্যের মতন সৃষ্টি করে তার অন্তঃপুরের কক্ষটি তালাবন্ধ করে তার চাবিটি লুকিয়ে রেখে দিয়েছেন।—

শুধু তার বাহিরের ঘরে
প্রস্তুত রহিল সজ্জা নানামতো অতিথির তরে ;
নীরব নির্জন অন্তঃপুরে
তালা তার বন্ধ করি চাবিখানি ফেলি দিলা দূরে।

* * *

সেথায় লাজুক পাখি ছায়াঘন শাখে,
মধ্যাহ্নে করুণ কণ্ঠে উদাসীন প্রেয়সীরে ডাকে।

কবির একান্ত কামনা, কেউ এসে তাঁর অন্তঃপুরের রুদ্ধদ্বারের চাবিটি খুঁজে পাক। তারই জন্যে কবির প্রতীক্ষা।—

মনে করি যদি কভু পাই তার দেখা
যে-পথিক একদিন অজানা সমুদ্র-উপকূলে
কুড়ায়ে পেয়েছে চাবি ;

অবশেষে
মৌমাছির পরিচিত এ নিভৃত পথপ্রান্তে এসে
যাত্রা তার হবে অবসান ;
খুলিবে সে গুপ্ত দ্বার কেহ যার পায় নি সন্ধান।

'কেহ যার পায় নি সন্ধান'—এ কথাটার মধ্যে কবিজনোচিত অত্যুক্তি অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু সেই গুপ্ত দ্বার পাওয়ার পথের সঙ্কেত জানা যাবে মৌমাছির কাছে,—কবির এই উক্তি থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে, তাঁর হৃৎকমলের মর্মকোষে সঞ্চিত প্রেমের মধুই সেই রুদ্ধদ্বার কক্ষের ভাণ্ডার পূর্ণ করে রেখেছে। মৌমাছির ব্যঞ্জনাটি এই অর্থেই সার্থক।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, মৌমাছি আর পুষ্পমধুর কল্পনায় পুরাতন কবিপ্রসিদ্ধিটি এখানে প্রতীপধর্মিতা লাভ করেছে। প্রাচীন কবিদের দৃষ্টিতে পুরুষচিত্তই মৌমাছি, আর প্রেমময়ী নারী মধুস্বাদী পুষ্পের উপমানে উপমিত। রবীন্দ্রনাথ নিজের প্রেমপূর্ণ হৃদয়কে মধুপূর্ণ কমলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যে-নারী সেই প্রেমের সন্ধানে আসবে তারই উপমান মধুসন্ধানী মৌমাছি। "প্রভাতী" কবিতায় কবি বলছেন :

চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি,
খনে খনে এসে চলে যাও থাকি থাকি।
হৃদয়কমল টুটিয়া সকল বন্ধ
বাতাসে বাতাসে মেলি দেয় তার গন্ধ,
তোমারে পাঠায় ডাকি,
হে কালো কাজল আঁখি।

অর্থাৎ, কবির এই প্রেমচেতনায় আমি-চেতনার চেয়ে তুমি-চেতনাই অধিকতর ক্রিয়াশীল। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা নয়, যাকে ভালবাসি তারই প্রীতিকামনা এর লক্ষ্য। প্রীতিকামনাও নয়, প্রিয়জনের আত্মিক তৃপ্তিবিধান করেই এ প্রেমের চরিতার্থতা। "প্রভাত" এবং "মধু" এই দুটি কবিতা বিশ্লেষণ করলেই আমাদের বক্তব্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। অতলান্তিক মহাসমুদ্র পাড়ি দেবার পথে আণ্ডেস জাহাজের নৈরাশ্যপ্রপীড়িত অন্ধকার দিনগুলির অবসানে বুয়েনোস এয়ারিসে পৌঁছে কবির মনে হল তিনি যেন সুদীর্ঘ অমারাত্রির

অবসানে প্রভাতের আলোর মুখ দেখলেন। স্বর্ণসুধাঢালা সেই প্রভাতের পরিপূর্ণ অবকাশ কবিচিত্তে নূতন উপলব্ধির জন্ম দিল। তিনি বললেন:

মুদিল অলস পাখা মুগ্ধ মোর গান।
যেন আমি নিস্তব্ধ মৌমাছি
আকাশ-পদ্মের মাঝে একান্ত একেলা বসে আছি।

"প্রভাত" কবিতায় বর্ণিত আত্মমানসের এই উপমানটিতে কবি খুশি হতে পারেন নি। "মধু" কবিতায় তাই মৌমাছির উপমানকে অস্বীকার করে এল আকাশে-ওড়া পাখির উপমান।—

মৌমাছির মতো আমি চাহি না ভাণ্ডার ভরিবারে
বসন্তেরে ব্যর্থ করিবারে।
পাখির মতন মন শুধু উড়িবার সুখ চাহে
উধাও উৎসাহে;
আকাশের বক্ষ হতে ডানা ভরি তার
স্বর্ণ-আলোকের মধু নিতে চায়,…

অর্থাৎ, মৌমাছির মত মধুসঞ্চয়ে ভাণ্ডার পূর্ণ করা নয়, পাখির মতন শুধু ওড়বার আনন্দ। আকাশের বক্ষ হতে স্বর্ণ-আলোকের মধু পাখায় নিয়ে উধাও উৎসাহে নভোবিহার। রূপকল্পটি ঈষৎ জটপাকানো। কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থে কবির বক্তব্য অস্পষ্ট নয়। মৃত্তিকার মধু নয়, আকাশের আলোই এ প্রেমের অভিপ্রেয়। ভাষান্তরে তারই নাম রূপের পদ্মে অরূপমধু পান। অলংকার-কৌস্তভের ভাষায় একে বলা যেতে পারে অসম্প্রয়োগবিষয়া প্রীতিরতি। পাক থেকে পাকান্তর প্রাপ্ত হয়ে তাও রূপের পদ্মে অরূপমধুপানেরই সহোদরা। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, পাখির রূপকল্পটি প্লেটোর 'ফিড্রাস' ডায়লগের পক্ষবান আত্মার রূপকটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।[১০]

ভালবাসা যে চিরচঞ্চল—এ ধারণা কবির চিরদিনের। "চঞ্চল" কবিতায় বলছেন, "হায় রে তোরে রাখব ধরে, ভালোবাসা, মনে ছিল এই দুরাশা।" কিন্তু কবি সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছেন—

অনেক দুঃখে গেছে বোঝা
বেঁধে রাখা নয় তো সোজা,

স্থখের ভিতে নহে তোমার
অচল বাসা।

তাই কবির সংকল্প—

এবার আমি সবফুরানো
পথের শেষে
বাঁধব বাসা মেঘের দেশে।

কিন্তু মেঘের দেশে তার বাসা হলেও, দুর্গম দূর শৈলশিরের স্তব্ধ তুষার সে নয়। সে আপনহারা ঝরনাধারায় ধূলির ধরায় নেমে এসেছে। স্তব্ধতার পাষাণ-বক্ষে সে কলমন্দ্রমুখরা ‘প্রবাহিণী’। প্রবাহিণীর আত্মপরিচয় ছলে কবি ভালবাসারই স্বরূপ বর্ণনা করে বলছেন :

মন্দ্রস্বরের মন্ত্র শুনাই
গভীর গুহার আঁধার তলে,
গহন বনের ভাঙাই ধেয়ান
উচ্চহাসির কোলাহলে।
শুভ্র ফেনের কুন্দমালায়
বিন্ধ্যগিরির বক্ষ সাজাই,
যোগীশ্বরের জটার মধ্যে
তরঙ্গিণীর নূপুর বাজাই।

৬

ভিক্টোরিয়া কবিচিত্তে কিভাবে ধরা দিয়েছেন তার পরিচয় রয়েছে “বিদেশী ফুল”, “অতিথি”, “বিপাশা”, “আকন্দ”, এবং “বনস্পতি” কবিতায়। কবির কাছে একলা বসলে ভিক্টোরিয়ার কণ্ঠে কথা হারিয়ে যেত। কবিচিত্তে তারই প্রতিবেদন পড়েছে “বিদেশী ফুলে”। কবি বলছেন :

হে বিদেশী ফুল, যবে আমি পুছিলাম—
“কী তোমার নাম”,
হাসিয়া দুলালে মাথা, বুঝিলাম তবে
নামেতে কী হবে।

আর কিছু নয়,

হাসিতে তোমার পরিচয়।

পাচটি স্তবকে পাঁচটি প্রশ্ন ও তার কবিকল্পিত উত্তরের মালা এই কবিতাটি। কী তোমার নাম? কোথা তুমি থাক? ভাষা কী তোমার? চেন তুমি মোরে? এবং সর্বশেষ জিজ্ঞাসা, মোরে ভুলিবে কি? শেষ প্রশ্নের উত্তরে কবিকল্পনা বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। "অতিথি" কবিতাটি স্বতঃস্ফূর্ত। ওর শেষ পঙ্‌ক্তিমিথুন—

জানি না তো ভাষা তব, হে নারী, শুনেছি তব গীতি,

"প্রেমের অতিথি কবি, চিরদিন আমারি অতিথি।"

"বিপাশা" কবিতায় কবি তাঁকে বলছেন মায়ামৃগী। বলছেন:

শূন্য পথে মনোরথে

ফের আকাশপার,

বুকের মাঝে নাই বহিলে

অশ্রুজলের ভার।

এমনি করেই যাও খেলে যাও

অকারণের খেলা;

ছুটির স্রোতে যাক্ না ভেসে

হালকা খুশির ভেলা।

"বনস্পতি" কবিতায় ভিক্টোরিয়া দিগঙ্গনার রূপকে ধরা দিয়েছেন। সম্পর্ক অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। "বনস্পতি" কবিতাটির আলোচনা প্রথম খণ্ডে করা হয়েছে। এখানে তার পুনরুল্লেখ বাহুল্য হবে।[১১]

ভিক্টোরিয়ার আরেকটি উপমান হয়েছে আকন্দ। কবিতাটির দুটি অংশ। প্রথম অংশে 'আকন্দবল্লভ রবি' সাগরপারের দেশে বসে তাঁর অতীত দিনের একটি স্মৃতিকে স্মরণ করছেন। একদিন ভুবনডাঙার মাঠে গোয়ালপাড়ার বাটে কবি যখন নতুনফোটা গানের কুঁড়ি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তখন কবির ছন্দে বাসা বাঁধার আকাঙ্ক্ষায় আকন্দ পাঠিয়েছিল তার করুণ ভীরু গন্ধ। বসন্তের বনভূমিতে মালতী-যূথী-জাতির দলে আকন্দ এতদিন কবির বন্দনা পায় নি। কবি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার প্রার্থনা পূরন করবেন। সাগরপারের দেশে মন-কেমনের হাওয়ার পাকে সেই স্মৃতি তাঁর চিত্তে করুণ সুরে বাজল।

কবিতার দ্বিতীয় অংশে আছে মৌমাছির বন্ধু আকন্দের বন্দনা। তার অন্তিম স্তবকে কবি বলছেন :

আকাশের একবিন্দু নীলে
তোমার পরান ডুবাইলে,
শিখে নিলে আনন্দের ভাষা।
বক্ষে তব শুভ্র রেখা এঁকে
আপন স্বাক্ষর গেছে রেখে
রবির সুদূর ভালবাসা।

কবিতাটি চাপাড-মালালে লেখা। ভিক্টোরিয়া এ সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। কবিতাটি লেখা যখন প্রায় শেষ তখন ভিক্টোরিয়া ছিলেন কবির সামনে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। উভয়ের মধ্যে ছিল নৈঃশব্দ্যের দুস্তর ব্যবধান। ভিক্টোরিয়া বলছেন, Miles and miles of silence surrounded us. তখন বিকেলের চায়ের সময় হয়েছে। কিন্তু ভিক্টোরিয়া আবদার করলেন, কবিতাটি তাঁকে তক্ষুনি অনুবাদ করে শোনাতে হবে। কবি তাঁকে আক্ষরিক অনুবাদ করে শোনালেন। ভিক্টোরিয়া বলছেন, "What he read, hesitating sometimes, seemed to me tremendously enlightening. It was as if by miracle, or chance, I had entered into direct contact, at last, with the poetic material (or raw material) of the written thing without having on the pair of gloves translations always are—gloves that blunt our sense of touch and prevent our taking hold of the words with sensitive bare hands...."[১২]

ভিক্টোরিয়া কবিকে সমস্ত কবিতাটি অনুবাদ করে তাঁকে দেবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। পরদিন যখন কবি তাঁকে অনূদিত কবিতাটি দিলেন তখন দেখা গেল অনেক কথাই তাতে বাদ পড়েছে। ভিক্টোরিয়া এর কারণ কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন। কবি বললেন, যে-সব অংশ তিনি বাদ দিয়েছেন সেগুলি প্রতীচ্যবাসীর মনকে স্পর্শ করবে না বলেই তিনি মনে করেন। ভিক্টোরিয়া অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বললেন, কবির এ ধারণা মারাত্মক ভুল। ভিক্টোরিয়া

ঠিকই বলেছেন। আকন্দ ব্যঙ্গ্যার্থে যে অভিব্যঞ্জনা লাভ করেছে তাতে সে দেশ-বিশেষের সীমাকে অতিক্রম করে লাভ করেছে সার্বভৌম ব্যাপ্তি।

৭

ভিক্টোরিয়াকে উপলক্ষ্য করে লেখা প্রেমের কবিতাগুলির কাব্যোৎকর্ষ বিচার করা অসঙ্গত নয়। কবিতা রচনাকালের প্রায় পনেরো বৎসর পরে ১৯৩৯-এর মার্চে ভিক্টোরিয়াকে লেখা এক চিঠিতে কবি বলছেন, "**Possibly you know that the memory of those sunny days and tender care has been encircled by some of my verses—the best of their kind; the fugitives are made captive, and they will remain,...**"[১৩] অর্থাৎ কবি এই কবিতাগুলিকে সমপর্যায়ের কাব্যের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলে মনে করতেন। কবিতাগুলির মধ্যে কবির ব্যক্তিহৃদয়ের উষ্ণ স্পর্শ লাভ করা যায়। ''অন্তর্হিতা" ও "আশঙ্কা" কবিতার আলোচনা আমরা প্রথম খণ্ডে করেছি। কিন্তু ভিক্টোরিয়াকে নিয়ে লেখা কবিতাগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা হল "শেষবসন্ত"। এই কবিতায় কবির অনুভূতি যেমন অকুণ্ঠ তেমনি আবেগগর্ভ। প্রকাশভঙ্গিও অলজ্জ অসংকোচে স্বতঃ-উৎসারিত। আবেদন অ-তির্যক্ ভঙ্গিতে মর্মস্পর্শী। কবি বলছেন :

বেলা কবে গিয়াছে বৃথাই
এতকাল ভুলেছিনু তাই
হঠাৎ তোমার চোখে
দেখিয়াছি সন্ধ্যালোকে
আমার সময় আর নাই।

* * *

ফিরিয়া যেয়ো না, শোনো শোনো,
সূর্য অস্ত যায় নি এখনো।
সময় রয়েছে বাকি ;
সময়েরে দিতে ফাঁকি
ভাবনা রেখো না মনে কোনো।

* * *

রাত্রি যবে হবে অন্ধকার
বাতায়নে বসিয়ো তোমার।
সব ছেড়ে যাব প্রিয়ে,
সুমুখের পথ দিয়ে,
ফিরে দেখা হবে না তো আর।
ফেলে দিয়ো ভোরে গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালাখানি।
সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী।

এই তিনটি স্তবকে ভিক্টোরিয়ার প্রতি কবির অনুরাগের সব কথাই বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমকাব্যে "শেষবসন্ত" সত্যসত্যই অনবদ্য, অতুলনীয়।

৮

ভিক্টোরিয়ার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগকে আমরা অসম্প্রয়োগবিষয়া প্রীতিরতির সমশ্রেণীভুক্ত করেছি। শেলি এপিসাইকিডিয়নে তাঁর প্রেমচেতনা সম্পর্কে গিস্‌বোর্ণকে বলেছিলেন,—"It is a mystery, as to real flesh and blood, you know I do not deal in these articles..."[১৪] প্রেমচেতনার দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শেলির সগোত্র শিল্পী। তাঁর শেষবসন্তের অনুরাগের স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে "না-পাওয়া", "সৃষ্টিকর্তা", "পথ", "মিলন", "অন্ধকার" ও "বদল" কবিতাগুলিতে।

কবিমানসের রসায়নাগারে বহুবিচিত্রের সমন্বয়ে যে যৌগিক উপলব্ধির সৃষ্টি হয় তার কথাই কবি বলেছেন "না-পাওয়া" কবিতায়।—

কার গানে কার সুর
মিলে গেছে সুমধুর
ভাগ করে কে লইবে চিনে।

কিন্তু সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যেই কবির বিধাতার সানন্দ সমর্থন বর্তমান। "সৃষ্টিকর্তা" কবিতায় কবি বলছেন :

যে দিন প্রিয়ার কালো চক্ষুর সজল করুণায়
রাত্রির প্রহর মাঝে অন্ধকারে নিবিড় ঘনায়
নিঃশব্দ বেদনা, তার দুটি হাতে মোর হাত রাখি
স্তিমিত প্রদীপালোকে মুখে তার স্তব্ধ চেয়ে থাকি,
তখন আঁধারে বসি' আকাশের তারকার মাঝে
অপেক্ষা করেন তিনি, শুনিতে কখন বীণা বাজে
যে-সুরে আপনি তিনি উন্মাদিনী অভিসারিণীরে
ডাকিছেন সর্বহারা মিলনের প্রলয়তিমিরে।

তাই রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে ব্যক্তি-প্রেমও বিশ্বপ্রেমের সঙ্গে একই ছন্দে বাঁধা। ব্যক্তিসীমায় যে অনুভূতি মিলন-বিরহের সুখদুঃখের লীলায় আন্দোলিত তা বিশ্বলীলারই অংশমাত্র। এ লীলা শিশুর খেলার মতই অহৈতুকী। ভিক্টোরিয়াকে একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "I assure you that through me a claim comes that is not mine. A child's claim upon its mother has a sublime origin—it is not a claim of an individual, it is that of humanity."[১৫] "পথ" কবিতায় এই অনুভূতিকেই ভাষা দিয়ে কবি বলছেন :

বিধাতার মতো শিশু লীলা দিয়ে শূন্য দেয় ভরে।

* *

ভিত্তিহীন ঘর বেঁধে আনন্দে কাটায়ে দেয় বেলা,
মূল্য যার কিছু নাই তাই দিয়ে মূল্যহীন খেলা।

'পূরবী'র যে-অংশে এই কবিতাগুলি সংকলিত হয়েছে কবি তার নাম দিয়েছেন 'পথিক'। বস্তুত এ-চেতনা কবিকে গৃহের বন্ধনে বাঁধে নি, চলার পথেই তাঁকে আনন্দের বেগে এগিয়ে দিয়েছে। দক্ষিণ-আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে জুলিয়ো চেজারে জাহাজে বসে কবি যে কবিতাগুলি রচনা করেন তার মধ্যে "মিলন," "অন্ধকার" ও "বদল"—এই তিনটি কবিতায় ভিক্টোরিয়ার সদ্য-ফেলে-আসা দিনগুলির স্মৃতিই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই সময়ে কবি ভিক্টোরিয়াকে যে-সব চিঠি লেখেন তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে কবিতাগুলির প্রেরণার উৎস সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে পারা যায়। কবি ভিক্টোরিয়াকে একটি চিঠিতে লিখছেন, "When we were together we

mostly played with words and tried to laugh away best opportunities to see each other clearly. Such laughter often disturbs the atmosphere of our mind, raising dust from its surface which only blurs our view."[১৬] "মিলন" কবিতার অন্তিম চরণে কবি এই কথাই বলেছেন :

রজনী কী খেলা যে প্রভাত সনে
খেলিছে পরাজয়কামী,
বুঝিনু যবে দোঁহে পরাণপণে
খেলিনু তুমি আর আমি।

আর্জেন্টিনার প্রেমচেতনার পূর্ণাহুতি হয়েছে "বদল" কবিতা দিয়ে। কবি বলছেন :

হাসির কুসুম আনিল সে ডালি ভরি,
আমি আনিলাম দুখবাদলের ফল।
শুধালেম তারে, "যদি এ বদল করি
হার হবে কার বল্।"

কৌতুক-হাসি হেসে সুন্দরী কবির 'দুখবাদলের ফলে'র সঙ্গে তার 'হাসির কুসুম' বদল করে নিলে। কবি বলছেন :

সে লইল তুলে আমার ফলের ডালা,
করতালি দিল হাসিয়া সকৌতুকে।
আমি লইলাম তাহার ফুলের মালা,
তুলিয়া ধরিনু বুকে।
"মোর হল জয়" হেসে হেসে কয়,
দূরে চলে গেল ত্বরা।
উঠিল তপন মধ্যগগনদেশে,
আসিল দারুণ খরা,
সন্ধ্যায় দেখি তপ্ত দিনের শেষে
ফুলগুলি সব ঝরা।

প্রেমচেতনায় চিরদিন হাসির কুসুমের চেয়ে দুখ-বাদলের ফলই অধিকতর মূল্যবান—এই শাশ্বত সত্যই কবির নূতন উপলব্ধিতে নবরূপে সত্যতর হয়ে উঠল।

সেণ্টেনারি ভল্যুমে লা প্লাতা নদার তারে কবির সঙ্গে নিজের অবিস্মরণীয় দিনগুলির বর্ণনা শেষ করে ভিক্টোরিয়া লিখেছেন, "During his stay at San Isidro, Tagore taught me a few words of Bengali. I have retained only one, which I shall always repeat to India: *Bhalobasa*. 'There is no history but of the soul."[১৭]

আর্জেন্টিনার এই কাহিনী দুটি অবিনশ্বর ;আত্মারই আনন্দমিলনের অমর ইতিহাস।

উল্লেখপঞ্জী

১ Rabindranath Tagore: A Centenary Volume, পৃ° ৪৬।

২ তদেব। পৃ° ২৭।

৩ তদেব। পৃ° ৩২।

৪ তদেব। পৃ° ৪২।

৫ "পত্র", 'পুনশ্চ'। রবীন্দ্র-রচনাবলী-১৬, পৃ° ১৯-২০।

৬ Rabindranath Tagore: A centenary Volume, পৃ° ২৩-২৪।

৭ দ্রষ্টব্য, কবিমানসী-১, পৃ° ১১-১৩।

৮ সেণ্টেনারি ভল্যুম, পৃ° ৩৪।

৯ ভিক্টোরিয়াকে লেখা চিঠি—আগস্ট ১৯২৫। দ্রষ্টব্য, সেণ্টেনারি ভল্যুম, পৃ° ৩১।

১০ দ্রষ্টব্য, বর্তমান গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের ষষ্ঠ উপচ্ছেদ।

১১ কবিমানসী-১, পৃ° ৩৬৭-৬৯।

১২ সেণ্টেনারি ভল্যুম, পৃ° ৪৩।

১৩ তদেব, পৃ° ৩৯।

১৪ এডওয়ার্ড ডাওডেন লিখিত শেলির কবিতাবলীর ভূমিকা। পৃ° xxxi.

১৫ সেণ্টেনারি ভল্যুম, পৃ° ৩১।

১৬ তদেব। পৃ° ৪৩।

১৭ তদেব। পৃ° ৪৭।

পঞ্চম অধ্যায়

কাদম্বরী : ধ্রুবতারা

১

মানুষের চেতনার নানা স্তর। অতিসূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন মহাকবি রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনাও যে নানা স্তরে বিন্যস্ত হবে তা বলাই বাহুল্য। 'পত্রপুটে'র পনেরো সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রেমচেতনার দুটি ধারার কথা বলেছেন,—

একদিন বসন্তে নারী এল সঙ্গীহারা আমার বনে
প্রিয়ার মধুর রূপে।
এল সুর দিতে আমার গানে,
নাচ দিতে আমার ছন্দে,
সুধা দিতে আমার স্বপ্নে।

*　　*　　*

ভালোবেসেছি তাকে।
সেই ভালোবাসার একটা ধারা
ঘিরেছে তাকে স্নিগ্ধ বেষ্টনে
গ্রামের চিরপরিচিত অগভীর নদীটুকুর মতো।
অল্পবেগের সেই প্রবাহ
বহে চলেছে প্রিয়ার সামান্য প্রতিদিনের
অনুচ্চ তটচ্ছায়ায়।

আমার ভালোবাসার আর একটা ধারা
মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিতবাহিনী।
মহীয়সী নারী স্নান ক'রে উঠেছে
তারি অতল থেকে।

সে এসেছে অপরিসীম ধ্যানরূপে
আমার সর্বদেহে-মনে,
পূর্ণতর করেছে আমাকে, আমার বাণীকে।
জ্বেলে রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে
চিরবিরহের প্রদীপশিখা।

রবীন্দ্রচিত্তে কাদম্বরী-চেতনা দ্বিতীয় ধারার দ্যোতক। তা মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিতবাহিনী। কবির সর্বদেহে-মনে তার আবির্ভাব অপরিসীম ধ্যানরূপে। কবির চেতনার নিভৃত গভীরে জ্বেলে রেখেছে চিরবিরহের প্রদীপশিখা।

'চেতনার নিভৃত গভীরে'র বাগ্‌ভঙ্গিটি এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার মত। জ্যাক মারিতাঁ তাঁর 'Creative Intuition in Art and Poetry' গ্রন্থে বলেছেন, "The creative emotion of minor poets is born in a flimsy twilight and at a comparatively superficial level of the soul. Great poets descend into the creative night and touch the deep waters over which it reigns. Poets of genius have their dwelling place in this night and never leave the shores of these deep waters."

অর্থাৎ, সাধারণ কবিরা আত্মার অপেক্ষাকৃত অগভীর স্তরে চেতনা-গোধূলির আলো-আঁধারি লীলায় তাঁদের কাব্য রচনা করেন। মহাকবিরা সৃষ্টির নিশীথ-অন্ধকারে তলিয়ে যান, এবং চেতনার অতল প্রবাহে অবগাহন করেন। কথাটা সত্য, অথচ সর্বাংশে সত্যও নয়। সাধারণ কবিরা আত্মার অতল গভীরে তলিয়ে যেতে পারেন না, এ কথা অবশ্যই সত্য; কিন্তু মহাকবিরা সর্বদা সৃষ্টির নিশীথ-অন্ধকারে তলিয়ে গিয়ে চেতনার অতল প্রবাহে অনুক্ষণ নিমজ্জিত থাকেন —এ কথা সত্য নয়। মহাকবিদের চেতনারও নানা স্তর আছে। কখনও তাঁদের মানসলোকে গোধূলির আলো-আঁধারি লীলা, কখনও নিশীথের নিস্তরঙ্গ সৃষ্টি-অন্ধকার।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের "দিঘি" কবিতাটি স্মরণীয়। সিসৃক্ষু কবিমানসের আত্মার অতল গভীরতারই উপমান এই দিঘি। কবি বলছেন:

শেওলা-পিছল পৈঁঠা বেয়ে নামি জলের তলে
একটি একটি করে,

ডুবে যাবার সুখে আমার ঘটের মতো যেন
অঙ্গ উঠে ভরে।
ভেসে গেলেম আপন মনে ভেসে গেলেম পারে,
ফিরে এলেম ভেসে,
সাঁতার দিয়ে চলে গেলেম, চলে এলেম যেন
সকল-হারা দেশে।

দিঘির অতল জলে সকল-হারা দেশে পৌঁছে কবি বলছেন :

ওগো বোবা, ওগো কালো, স্তব্ধ সুগম্ভীর
গভীর ভয়ংকর,
তুমি নিবিড় নিশীথ রাত্রি বন্দী হয়ে আছ,
মাটির পিঞ্জর।
পাশে তোমার ধুলার ধরা কাজের রঙ্গভূমি,
প্রাণের নিকেতন,
হঠাৎ থেমে তোমার 'পরে নত হয়ে প'ড়ে
দেখিছে দর্পণ।

আত্মার সৃজনলীলা বোঝাতে কবি ও দার্শনিকের দুটি রূপকল্প আশ্চর্যভাবে এক হয়ে গেছে। 'নিবিড় নিশীথ রাত্রি' এবং 'কূলে কূলে পূর্ণ নিটোল গভীর ঘন কালো শীতল জলরাশি' আর '**creative night**' এবং '**deep waters over which it reigns**' ভাবে ও ভাষায় অবিকল এক। কিন্তু এই অবগাহন যে বিশেষ-বিশেষ মুহূর্তেই সম্ভব, তার ইঙ্গিত রয়েছে "দিঘি"র অন্তিম স্তবকে। কবি বলছেন :

দিন ফুরাল রাত্রি এল, কাটল মাঝের বেলা
দিঘির কালো নীরে।

যদি বলা যায়, সৃষ্টির মুহূর্তগুলিই এই বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত, তাহলেও কবিমানস-রহস্যের সবটুকু বলা হয় না। মহৎ কবির চেতনারও কোন প্রবাহ 'গ্রামের চিরপরিচিত অগভীর নদীটুকুর মত,' আবার কোন প্রবাহ 'মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিতবাহিনী'। কাদম্বরী-প্রেমেই রবীন্দ্র-কবিমানস আত্মার অতল গভীরতায় তলিয়ে যেতে পেরেছে। অন্যান্য প্রেমচেতনায় আছে গোধূলির আলো-আঁধারি প্রদেশে রোমান্স-রাগরঞ্জিত কবিচিত্তের বিচিত্র সফরী-লীলা।

কলাকৃতি ও কাব্যরূপায়ণের দিক থেকে সেগুলির বর্ণাঢ্যতা নগণ্য নয়। জীবনসঙ্গিনীর সঙ্গে কবিমানসের চিরপুরাতন-বিরহমিলন-লীলা মধুস্বাদী। কিন্তু প্রতিদিনের অমুচ্চ তটচ্ছায়ায় অল্পবেগের সে-প্রবাহ মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিত বহন করে আনতে পারে নি। কেবল কবিজায়ার মৃত্যুর পরে কবির স্বকীয় প্রেমচেতনা বিরহবিপ্রলম্ভের বহ্নিস্নানে দিব্যকান্তি লাভ করেছিল।

তা ছাড়া কবির প্রেমচেতনা আত্মার গভীরে তলিয়ে গেলেই নব নব উপলব্ধি ও শিল্পসুন্দর জীবনবোধের ব্যঞ্জনা বহন করে আনে। কবির যে-প্রেমচেতনার সঙ্গে তাঁর সৌন্দর্যচেতনা ও জীবনদেবতা-চেতনার সম্পর্ক রয়েছে সে প্রেমচেতনা কবির আত্মার নিভৃত-গভীরে জ্বেলে রেখেছে চিরবিরহের প্রদীপশিখা। আর এই চিরবিরহী প্রেমের আলম্বন-স্বরূপিণী হলেন কাদম্বরী দেবী।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা মনে রাখা কর্তব্য। যে-প্রদীপশিখা কবির মানসমন্দিরে জ্বলছে তার আলোয় কাদম্বরী দেবীর মানবী-মূর্তিটি যেমন চির-উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে, তেমনি সেই আলোতেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাঁর নব-নব সৌন্দর্যমূর্তি এবং অন্তর্যামী-রূপিণী দেবীমূর্তি। দান্তের চেতনায় বেয়াত্রিচে কিভাবে বিরাজমানা ছিলেন তার কথা বলতে গিয়ে মারিতাঁ বলছেন :

"Symbolically transmuted as she may be, Beatrice is never a symbol or an allegory for Dante. She is both herself and what she signifies".[২]

রবীন্দ্রনাথের বেয়াত্রিচেও একটি বিশেষ মানবী-মূর্তিতেই কবিমানসে চিরপ্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই মূর্তিই দিব্য-এরসের অনুপ্রেরণায় কবির মানসসুন্দরী, লীলাসঙ্গিনী ও অন্তর্যামীর নব নব দিব্যকান্তিতে বার বার দেখা দিয়েছেন। তার ফলে কাদম্বরী দেবীর প্রতি একদিকে কবির অনুরাগ যেমন চিরদিনই প্রেমচেতনার বিচিত্র স্তরে নিত্যবিলসিত ছিল, অন্যদিকে তেমনি তিনিই 'জগতের মাঝে' 'বিচিত্ররূপিণী', এবং অন্তর মাঝে 'অন্তরবাসিনী' লীলাসঙ্গিনী হয়ে কবি-চেতনাকে দিব্যানুভূতির নব নব ঘাটে বহন করে নিয়ে গেছেন।

২

আমরা অন্যত্র বলেছি, চেতনার স্তরভেদে কবির কাছে তাঁর নতুন-বৌঠানের ছিল তিনটি সত্তা। অনুরক্ত ভক্তের কাছে তিনি ছিলেন দেবী, রসিক কবির প্রেমকল্পনায় তিনি রহঃসখী, আর তরুণ প্রেমিকের হৃদয়বাসনায় কৌতুকময়ী মানসসুন্দরী।[৩]

রবীন্দ্রনাথের কৈশোরে তাঁর কবিজীবনের যাত্রারম্ভ তিনখানি কাহিনীকাব্য দিয়ে—'বনফুল', 'কবিকাহিনী', ও 'ভগ্নহৃদয়'। এই কাহিনী-কাব্যত্রয়ে কাদম্বরী দেবী কিভাবে কবিচিত্তকে অনুপ্রাণিত করেছেন তা বলা সহজ নয়। 'শৈশবসংগীতে'র গীতিকবিতাগুলিতেও তাঁর অলক্ষ্য চরণের আবির্ভাব দুর্নিরীক্ষ্য। কবির কুড়ি বৎসর বয়সে, 'ভারতী' পত্রিকায় ১২৮৭ সালের কার্তিক মাস থেকে 'ভগ্নহৃদয়' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'ভগ্নহৃদয়ে'র "উপহার" কবিতাটিই কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশে কবির প্রথম গীতিনৈবেদ্য নিবেদন। আসলে এটি একটি গান। ছায়ানট রাগিণীতে গেয়। এই গীতি-উৎসর্গটি এখানে সমগ্রভাবে উদ্ধারযোগ্য—

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা।
যেথা আমি যাই নাকো, তুমি বিরাজিত থাকো
আকুল এ আঁখি 'পরে ঢাল' গো আলোকধারা।
ও মু'খানি সদা মনে জাগিতেছে সংগোপনে
আঁধার হৃদয় মাঝে দেবীর প্রতিমা-পারা।
কখনো বিপথে যদি ভ্রমিতে চায় এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি শরমে সে হয় সারা।
চরণে দিনু গো আনি— এ ভগ্ন-হৃদয়খানি
চরণ রঞ্জিবে তব এ হৃদি-শোণিতধারা।

এই গানটি ঈষৎ বদল করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মসংগীতে রূপান্তরিত হয়েছিল।[৪] কাদম্বরী দেবীর প্রতি তরুণ কবির প্রথম হৃদয়ানুরাগ এই

দেবীপূজার আকারেই প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাটি বিশ্লেষণ করলে যে-ভাবানুষঙ্গগুলি পাওয়া যাবে তা হল : ১ কাদম্বরী দেবীই কবিজীবনের ধ্রুবতারা। ২ কবিমানসে তিনি নিত্যবিরাজিতা। ৩ ওই মুখখানি তাঁর আঁধার-হৃদয়ে দেবী-প্রতিমার মত উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে। ৪ কবির বিপথ-গামী চিত্ত ওই মুখখানি দেখে 'শরমে সারা' হয়। ৫ কবির হৃদয়-শোণিত-ধারায় তাঁর চরণ রঞ্জিত হবে। এই ভাবানুষঙ্গগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন এই জন্যে যে, কবিমানসে কাদম্বরী দেবীর মানবীমূর্তি থেকে দেবীমূর্তিতে বিবর্তনের আলোচনা-প্রসঙ্গে এগুলির কথা স্মরণ করা প্রয়োজন হবে।

এই গানটি ব্রহ্মসংগীতে রূপান্তরিত হওয়ায় 'ভগ্নহৃদয়' গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় কবি নূতন উপহার-কবিতা রচনা করেন। উক্ত "উপহারে"র প্রথম দুটি স্তবকের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিনিবদ্ধ করা প্রয়োজন। কবি বলছেন :

হৃদয়ের বনে বনে সূর্যমুখী শত শত
ওই মুখপানে চেয়ে ফুটিয়া উঠেছে যত।
বেঁচে থাকে বেঁচে থাক্, শুকায় শুকায়ে যাক্,
ওই মুখপানে তারা চাহিয়া থাকিতে চায় ;
বেলা অবসান হবে, মুদিয়া আসিবে যবে
ওই মুখ চেয়ে যেন নীরবে ঝরিয়া যায়!

জীবন-সমুদ্রে তব জীবন-তটিনী মোর
মিশায়েছি একেবারে আনন্দে হইয়ে ভোর,
সন্ধ্যার বাতাস লাগি ঊর্মি যত উঠে জাগি,
অথবা তরঙ্গ উঠে ঝটিকায় আকুলিয়া,
জানে বা না জানে কেউ, জীবনের প্রতি ঢেউ
মিশিবে—বিরাম পাবে—তোমার চরণে গিয়া।

বলাই বাহুল্য, এই কবিতাটিও দেবীপূজা। কবিকিশোরের হৃদয়ের বনে বনে শত শত কাব্যের সূর্যমুখী ওই মুখপানে চেয়েই ফুটে উঠেছে। এখানে কাদম্বরী দেবী কবির কাছে জ্যোতির্ময়ী সাবিত্রী। দ্বিতীয় স্তবকে বলা হয়েছে, কবি তাঁর জীবন-তটিনীকে তাঁরই জীবন-সমুদ্রে আনন্দে বিভোর

হয়ে মিশিয়ে দিয়েছেন। কেউ জানুক আর না-ই জানুক, কবিজীবনের প্রতিটি ভাবতরঙ্গ তাঁরই চরণে গিয়ে মিশবে এবং বিরাম লাভ করবে। এই 'পরানুরক্তি'র প্রতিশ্রুতি দিয়েই কবিভক্তের প্রথম দেবীবন্দনা উচ্চারিত হয়েছে।

৩

'ভগ্নহৃদয়ে' এই দুটি উপহার-কবিতার পরে তরুণ কবির যে কাব্যসংকলনের সঙ্গে কাদম্বরী দেবী ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সে কাব্যসংকলনের নাম 'সন্ধ্যাসংগীত'। রচনাবলী সংস্করণে 'কবির মন্তব্যে' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সন্ধ্যাসংগীতেই তাঁর কাব্যের প্রথম পরিচয়। সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাই 'প্রথম স্বকীয় রূপ দেখিয়ে' কবিকে আনন্দ দিয়েছিল। "সে উৎকৃষ্ট নয় কিন্তু আমারই বটে। সে সময়কার অন্য সমস্ত কবিতা থেকে আপন ছন্দের বিশেষ সাজ পরে এসেছিল। সে সাজ বাজারে চলিত ছিল না।"

'সন্ধ্যাসংগীত' কবির একবিংশবর্ষ বয়সের কাব্য। চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগান-বাড়িতে বসে এর বেশির ভাগ কবিতা রচিত হয়। শেষদিকের কিছু কবিতা লেখা হয়েছিল চৌরঙ্গি জাদুঘরের নিকট দশ নম্বর সদর স্ট্রীটে জ্যোতিদাদার বাসায় বসে। 'সন্ধ্যাসংগীতে'র দোসর হল "বিবিধ প্রসঙ্গ"। প্রথম খণ্ডে আমরা বলেছি, "বিবিধ প্রসঙ্গ" 'সন্ধ্যাসংগীত"-পর্বের কবিমানসের কড়চা। 'সন্ধ্যাসংগীতে' যে মান-অভিমান রাগ-অনুরাগের দ্বন্দ্বে কবিচিত্ত আন্দোলিত হয়েছে, "বিবিধ প্রসঙ্গ" যেন তারই সহজবোধ্য গদ্যভাষ্য। আমরা আরও বলেছি, চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগান-বাড়িতে কাদম্বরী দেবীর নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গ ও সান্নিধ্যের মধ্যে তাঁরই অনুরক্ত ভক্তকবির চিত্তে নবযৌবনের যে বিচিত্র ভাবরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়েছিল "বিবিধ প্রসঙ্গে" রয়েছে তারই আলোছায়ার লীলা।[৫]

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে এই সময়কার তাঁর মানসিক অবস্থার বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন, এ যেন মনের রাজ্যে বসন্ত সমাগম। বলেছেন :

"মনের রাজ্যে যখন বসন্ত আসে তখন ছোটো ছোটো স্বল্পায়ু রঙিন ভাবনা উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে কেহ লক্ষ্যও করে না, অবকাশের দিনে

সেইগুলাকে ধরিয়া রাখিবার খেয়াল আসিয়াছিল। আসল কথা, তখন সেই একটা ঝোঁকের মুখে চলিয়াছিলাম—মন বুক ফুলাইয়া বলিতেছিল, আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিব—কী লিখিব সে খেয়াল ছিল না কিন্তু আমিই লিখিব, এইমাত্র তাহার একটি উত্তেজনা।"[৬]

'বিবিধ প্রসঙ্গে'র "সমাপনে"র সর্বশেষ অনুচ্ছেদটিকে আমরা গ্রন্থের উৎসর্গ-পত্র বলেছি। এই উৎসর্গপত্রটি কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশে লেখা। কবি বলছেন, "আমার পাঠকদিগের মধ্যে একজন লোককে বিশেষ করিয়া আমার এই ভাবগুলি উৎসর্গ করিতেছি। এ ভাবগুলির সহিত তোমাকে আরও কিছু দিলাম, সে তুমিই দেখিতে পাইবে। * * * এই লেখাগুলির মধ্যে কিছুদিনের গোটাকতক সুখ দুঃখ লুকাইয়া রাখিলাম, এক একদিন খুলিয়া তুমি তাহাদের স্নেহের চক্ষে দেখিও, তুমি ছাড়া আর কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না! আমার এই লেখার মধ্যে লেখা রহিল, এক লেখা তুমি আমি পড়িব, আরেক লেখা আর সকলে পড়িবে।"[৭]

এই কথাগুলিকে 'সন্ধ্যাসংগীতে'র ব্যাখ্যার মূলসূত্র হিসাবেই গ্রহণ করতে হবে। কেন না, কবির সাক্ষ্য অনুসারেই[৮] 'বিবিধ প্রসঙ্গ' 'সন্ধ্যাসংগীতে'র দোসর। একুশ বৎসর বয়সে কবির মানসলোকে বসন্ত-সমাগমে প্রস্ফুটিত যুগল-পলাশ।

কবি 'সন্ধ্যাসংগীতে'র কবিতাগুলিকে কাঁচা আমের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বলেছেন, "তাকে আমের বোলের সঙ্গে তুলনা করব না, করব কচি আমের গুটির সঙ্গে, অর্থাৎ তাতে তার আপন চেহারাটা সবে দেখা দিয়েছে শ্যামল রঙে। রস ধরে নি, তাই তার দাম কম।"[৯]

'জীবনস্মৃতি'তে "সন্ধ্যাসংগীতে"র আলোচনা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, "এখন হইতে কাব্যসমালোচকদের মধ্যে আমার সম্বন্ধে এই একটা রব উঠিতেছিল যে, আমি ভাঙা-ভাঙা ছন্দ ও আধো-আধো ভাষার কবি। সমস্তই আমার ধোঁয়া-ধোঁয়া, ছায়া-ছায়া। কথাটা তখন আমার পক্ষে যতই অপ্রিয় হউক-না কেন, তাহা অমূলক নহে।"[১০]

অমূলক নয় বলেই, কবি ভাঙা-ভাঙা ছন্দে আধো-আধো ভাষায় ধোঁয়া-ধোঁয়া ছায়া-ছায়া যে ভাবগুলিকে প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে তাঁর হৃদয়ের একটি বিশেষ অবস্থার বিশেষ পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে বলেই তিনি

'সন্ধ্যাসংগীতে' তাঁর স্বকীয় কবিতার রূপ দেখে আনন্দিত হয়েছিলেন। সেগুলি উৎকৃষ্ট না হতে পারে, কিন্তু সেগুলি তাঁর নিজেরই বটে। তাই 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন :

"যেমন নীহারিকাকে সৃষ্টিছাড়া বলা চলে না, কারণ তাহা সৃষ্টির একটা বিশেষ অবস্থার সত্য—তেমনি কাব্যের অস্ফুটতাকে ফাঁকি বলিয়া উড়াইয়া দিলে কাব্যসাহিত্যের একটা সত্যেরই অপলাপ করা হয়। মানুষের মধ্যে অবস্থাবিশেষে একটা আবেগ আসে যাহা অব্যক্তের বেদনা, যাহা অপরিস্ফুটতার ব্যাকুলতা। মনুষ্যপ্রকৃতিতে তাহা সত্য সুতরাং তাহার প্রকাশকে মিথ্যা বলিব কী করিয়া। এরূপ কবিতার মূল নাই বলিলে ঠিক বলা হয় না, তবে কিনা মূল্য নাই বলিয়া তর্ক করা চলিতে পারে। কিন্তু একেবারে নাই বলিলে কি অত্যুক্তি হইবে না। কেননা কাব্যের ভিতর দিয়া মানুষ আপনার হৃদয়কে ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে; সেই হৃদয়ের কোনো অবস্থার কোনো পরিচয় যদি কোনো লেখায় ব্যক্ত হয় তবে মানুষ তাহাকে কুড়াইয়া রাখিয়া দেয়—ব্যক্ত যদি না হয় তবেই তাহাকে ফেলিয়া দিয়া থাকে।"[১১]

'সন্ধ্যাসংগীতে' রবীন্দ্র-কবিহৃদয়ের একটা বিশেষ অবস্থার একটা বিশেষ পরিচয়ই ব্যক্ত হয়েছে। আর, বলাই বাহুল্য, 'বনফুল'-'কবিকাহিনী-'ভগ্নহৃদয়ে' কাহিনী-কাব্যের মাধ্যমে নিজের কবিস্বপ্নশিহরিত নবীন-কৈশোরের প্রেম-চেতনাকে ভাষা দিয়ে প্রথমযৌবনারম্ভে কবি গীতিকবিতার আকারে উত্তমপুরুষের বাচনিকে হৃদয়ের যে বিশেষ অবস্থাটিকে ভাষা দিলেন আলংকারিক পরিভাষায় তার নাম পূর্বরাগ-বিপ্রলম্ভ। অপ্রাপ্তির বেদনাই তার মূল সুর। প্রকাশভঙ্গির দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'অব্যক্তের বেদনা', 'অপরিস্ফুটতার ব্যাকুলতা', বিষয়ালম্বনের দিক দিয়ে তারই নাম অপ্রাপ্তির দুঃখ। কবির প্রথম গীতিকাব্যসংকলন 'সন্ধ্যাসংগীত' যে বিষণ্নহৃদয়ের গান, তার মূল কারণ কবিচেতনার কেন্দ্রবর্তী ওই অপ্রাপ্তি-জনিত বিষাদ। ওরই অন্য নাম ঐশী অসন্তোষ।

৪

মোরান সাহেবের বাগান-বাড়িতে বসে লেখা "বিবিধ প্রসঙ্গে"র প্রথম যে-প্রবন্ধটি ১২৮৮ সালের শ্রাবণের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল তার নাম "মনের বাগানবাড়ি"। "বিবিধ প্রসঙ্গে"র মূল সুরটি ওর মধ্যেই উচ্চারিত। ওই প্রবন্ধের প্রথমেই কবি বলেছেন, "ভালবাসা অর্থে আত্মসমর্পণ নহে। ভালবাসা অর্থে, নিজের যাহা কিছু ভাল তাহাই সমর্পণ করা। হৃদয়ে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা নহে; হৃদয়ের যেখানে দেবত্রভূমি, যেখানে মন্দির, সেইখানে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা।"[১২]

'সন্ধ্যাসংগীতে'র কবি তাঁর হৃদয়ের দেবত্রভূমির মন্দিরে যে প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে-প্রতিমার নাম কাদম্বরী। তাঁর উদ্দেশে বিরচিত কবির প্রথম হৃদয়-সংগীতগুলি ওই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে গুঞ্জরিত।

'সন্ধ্যাসংগীতে'র মূল সুরটি পাওয়া যাবে "হৃদয়ের গীতিধ্বনি" কবিতায়। কবি বলছেন:

ঘুমাই বা জেগে থাকি, মনের দ্বারের কাছে
কে যেন বিষণ্ণ প্রাণী দিনরাত বসে আছে—
চিরদিন করিতেছে বাস,
তারি শুনিতেছি যেন নিশ্বাস প্রশ্বাস।
এ প্রাণের ভাঙা ভিতে স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে,
ঘুঘু এক বসে বসে গায় এক স্বরে
কে জানে কেন সে গান গায়।
গলি সে কাতর স্বরে স্তব্ধতা কাঁদিয়া মরে,
প্রতিধ্বনি করে হায় হায়।

মনের দ্বারের কাছে এই 'বিষণ্ণ প্রাণী'র অনুক্ষণ উপস্থিতি এবং ঘুঘুর প্রতীকটি এখানে বিশেষ ব্যঞ্জনাবহ। ঘরোয়া প্রেমের প্রতীক কপোত, কবিকল্পনায় মুক্তপ্রেমের প্রতীক হিসাবে দেখা দিয়েছে বনকপোত।

"অনুগ্রহ" কবিতায় সেদিনকার কবিমানসে বিলসিত বিপ্রলম্ভ-প্রেমের স্বরূপটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কবি বলছেন:

ভালোবাসি আপনা ভুলিয়া
গান গাহি হৃদয় খুলিয়া,
ভক্তি করি পৃথিবীর মতো,
স্নেহ করি আকাশের প্রায়।

* * *

দেয় যথা মহা পারাবার
অসীম আনন্দ উপহার,
তেমনি সমুদ্র-ভরা আনন্দ তাহারে দিই
হৃদয় যাহারে ভালোবাসে,
হৃদয়ের প্রতি ঢেউ উথলি গাহিয়া উঠে
আকাশ পুরিয়া গীতোচ্ছ্বাসে।

* * *

আপনারে ভুলে গিয়ে হৃদয় হইতে চাহে
একটি জগতব্যাপী গান।

* * *

ভালোবাসা স্বাধীন মহান,
ভালোবাসা পর্বত-সমান।
ভিক্ষাবৃত্তি করে না তপন
পৃথিবীরে চাহে সে যখন ;
সে চাহে উজ্জ্বল করিবারে,
সে চাহে উর্বর করিবারে ;
জীবন করিতে প্রবাহিত,
কুসুম করিতে বিকশিত।

এই 'সমুদ্র-ভরা আনন্দ', এই 'জগত-ব্যাপী গান'ই তরুণ কবির সেই ভালবাসার যথার্থ রূপক। এ ভালবাসার উপমান পৃথিবীর প্রতি সূর্যের ভালবাসা। সে চায় উজ্জ্বল করতে উর্বর করতে। জীবনকে প্রবাহিত করতে, কুসুমকে বিকশিত করতে। বলাই বাহুল্য, 'সন্ধ্যাসংগীতে' রবীন্দ্রনাথ নিজের পবিত্র-সুন্দর প্রেমের ভাষাটিকে খুঁজে পেয়েছেন। প্রেমের প্রেরণাসম্ভূত স্বরূপটিকেও।

৫

আমরা বলেছি, 'সন্ধ্যাসংগীতে'র প্রেম বিপ্রলম্ভ-পূর্বরাগের অপ্রাপ্তি-জনিত বিষণ্ণতায় একাধারে করুণ ও মধুর। তরুণ হৃদয়ের মাত্রাতিরেকী আবেগোচ্ছ্বাস যে অন্যপক্ষের অস্বস্তির কারণ, তারই আভাস পাওয়া যাবে "অসহ্য ভালোবাসা" কবিতায়।—

বুঝেছি গো বুঝেছি সজনি,
কী ভাব তোমার মনে জাগে,
বুক-ফাটা প্রাণ-ফাটা মোর ভালোবাসা
এত বুঝি ভালো নাহি লাগে।
এত ভালোবাসা বুঝি পার না সহিতে,
এত বুঝি পার না বহিতে।

কখনও নিজের অনুভূতির প্রতিদানে কিছু না পেয়ে কবি কাদম্বরী দেবীকে বলছেন পাষাণী। "পাষাণী" কবিতায় আছে:

তুমি নও, সে জন তো নও,
তবে তুমি কোথা হতে এলে?
এলে যদি এস তবে কাছে,
এ হৃদয়ে যত অশ্রু আছে,
একবার সব দিই ঢেলে,
তোমার সে কঠিন পরান
যদি তাহে এক তিল গলে,
কোমল হইয়া আসে মন
সিক্ত হয়ে অশ্রু জলে জলে!

এ অনুরাগে সন্নিকর্ষে যেমন অতৃপ্তি, বিচ্ছেদ-ব্যবধানেও তেমনি হাহাকার। "পরিত্যক্ত" কবিতায় এই হাহাকারই প্রতিধ্বনিত হয়েছে:

চলে গেল, আর কিছু নাই কহিবার।
চলে গেল, আর কিছু নাই গাহিবার।

শুধু গাহিতেছে আর শুধু কাঁদিতেছে
দীনহীন হৃদয় আমার,
শুধু বলিতেছে
"চলে গেল সকলেই চলে গেল গো,
বুক শুধু ভেঙে গেল দলে গেল গো!"

মিলনে-বিচ্ছেদে মান-অভিমান-ভরা এই বেদনার আনন্দই ক্ষরিত হয়েছে 'সন্ধ্যাসংগীতে'র এই কবিতাগুলিতে। অপ্রাপণীয়াকে পাবার অভিলাষ ও উদ্বেগ, এবং না-পাবার অতৃপ্তি ও বেদনাই তার মুখ্যচেতনা। কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতাটির নাম "উপহার",—কাদম্বরীদেবীকে উৎসর্গীকৃত। ওরই প্রথম স্তবকে কবিজীবনে সেই প্রেমের প্রতিষ্ঠার কথাই উচ্চারিত হয়েছে। কবিহৃদয়ের দেবত্র-ভূমির মন্দিরে প্রেমপ্রতিমা প্রতিষ্ঠার কথা :

ভুলে গেছি কবে তুমি ছেলেবেলা একদিন
মরমের কাছে এসেছিলে,
স্নেহময়, ছায়াময়, সন্ধ্যাসম আঁখি মেলি
একবার বুঝি হেসেছিলে।
বুঝি গো সন্ধ্যার কাছে, শিখেছে সন্ধ্যার মায়া
ওই আঁখি দুটি,
চাহিলে হৃদয় পানে মরমেতে পড়ে ছায়া,
তারা উঠে ফুটি।
আগে কে জানিত বলো কত কী লুকানো ছিল
হৃদয়-নিভৃতে,
তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া
পাইনু দেখিতে।

এই অপূর্ব-সুন্দর কাব্যাংশটুকু নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র 'সন্ধ্যাসংগীত' কাব্যখানি ছেঁকে "উপহারে"র ওই অংশের ষোড়শ পঙ্‌ক্তিকে "দৃষ্টি" শিরোনামায় কবি অমরতা দিয়েছেন তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যসংকলন 'সঞ্চয়িতা'য়। 'সন্ধ্যাসংগীত' নামকরণের তাৎপর্যও ওর মধ্যে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। নিসর্গ-সন্ধ্যার বন্দনা করেই গ্রন্থখানির আরম্ভ। কিন্তু তার উপসংহারে দেখা দিয়েছে কবির মানস-সন্ধ্যার ধ্রুবতারাটি। কাদম্বরী দেবীর "সন্ধ্যাসম" আঁখি-দুটির দৃষ্টি-

পাতেই কবির মানস-আকাশের তারা ফুটে উঠেছে। তাঁরই নয়নের দৃষ্টি দিয়ে কবি নিজের হৃদয়কেও দেখতে পেয়েছেন। প্রেমের আলোকে এই আত্মপরিচয়ই কবির প্রথম পরিচয়। সেই পরিচয়ই তাঁর অন্তরতর পরিচয়।

প্রেমিক-হৃদয়ে প্রিয়ার আঁখিতারার দীপ্তিতেই য়ুরোপীয় দৃষ্টিতে দিব্যপ্রেম দ্যোতিত হয়। বেয়াত্রিচের প্রতি দান্তের, লরার প্রতি পেত্রার্কার দিব্যপ্রেম রবীন্দ্রনাথের কৈশোর-জীবনে তাঁর স্বপ্নকামনার বিষয়ীভূত হয়েছিল। পেত্রার্কা তাঁর দশম কান্‌ৎসোনেতে লরার নয়নবন্দনায় বলেছেন :

> As, vex'd by the fierce wind,
> The weary sailor lifts at night his gaze
> To the twin lights
> which still our pole displays,
> So, in the storms unkind
> Of Love which I sustain,
> in those bright eyes
> My guiding light and only solace lies ;

যেন ওরই সঙ্গে সুর মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,
> এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা ॥

কাদম্বরী দেবী রবীন্দ্র-জীবনের অনির্বাণ ধ্রুবতারা।

৬

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু ১২৯১ বঙ্গাব্দের ৮ই বৈশাখ। কাদম্বরী দেবীকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রমানসের প্রেমচেতনা এই মৃত্যুর দ্বারা দ্বিখণ্ডিত। মৃত্যুর পূর্বে আর মৃত্যুর পরে। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পূর্বে কবির গীতিকাব্য-সংকলন হল 'শৈশবসংগীত', 'সন্ধ্যাসংগীত', 'প্রভাতসংগীত', 'ছবি ও গান'। একটি পদ ছাড়া [কো তুহুঁ বোলবি মোয়] 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'ও এই যুগের রচনা।

কাদম্বরী দেবীর জীবদ্দশায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের কোথায় কিভাবে তাঁর প্রত্যক্ষ ছায়াপাত হয়েছে তা চিন্তা করে দেখা বিশেষ প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের

আঠারো-উনিশ বৎসর বয়সে লেখা প্রথম পত্রগুচ্ছ "য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র" মুখ্যত কাদম্বরী দেবীকেই লেখা।[১৩] গ্রন্থাকারেও এই পত্রাবলী তাঁরই হস্তে সমর্পিত। 'ভগ্নহৃদয়ে'র দুটি উপহার-কবিতাও তাঁরই উদ্দেশে লেখা। তেরো থেকে আঠারো বৎসর বয়সের মধ্যে রচিত কবিতার সংকলন 'শৈশবসংগীত' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পাঁচ সপ্তাহ পরে [২৯ মে ১৮৮৪]। এ গ্রন্থখানিও তাঁরই নামে উপহার দিয়ে কবি লিখেছেন, "এ কবিতাগুলিও তোমাকে দিলাম। বহুকাল হইল, তোমার কাছে বসিয়াই লিখিতাম, তোমাকেই শুনাইতাম। সেই সমস্ত স্নেহের স্মৃতি ইহাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে।" একুশ বৎসর বয়সে লেখা 'সন্ধ্যাসংগীতে'র উপহার ও অন্যান্য কবিতার কথা এই অধ্যায়ে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। 'সন্ধ্যা-সংগীতে'র দোসর, কবির প্রথম কাব্য-সুরভিত মন্ময় গদ্যসংকলন 'বিবিধ প্রসঙ্গ'ও কাদম্বরী দেবীকেই উপহৃত। এই প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে কবি বলছেন, "এই লেখাগুলির মধ্যে কিছুদিনের গোটাকয়েক সুখ দুঃখ"[১৪] তিনি লুকিয়ে রেখেছেন। এই লেখাগুলি সাধারণভাবে সকলের হলেও বিশেষভাবে দুজনের। ["আমার এই লেখার মধ্যে লেখা রহিল, এক লেখা তুমি আমি পড়িব, আর এক লেখা আর সকলে পড়িবে।"[১৫]]

বস্তুত, দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রার উদ্যোগ মাদ্রাজ পর্যন্ত এগিয়ে ব্যর্থ হবার পর তরুণ কবি বেশির ভাগ সময়ই জ্যোতিদাদা ও নতুন-বৌঠানের সঙ্গে কাটাতে লাগলেন। কবির একবিংশ বর্ষটি কাটল চন্দননগরের মোরান সাহেবের বাগান-বাড়িতে। লেখা হল 'সন্ধ্যাসংগীতে'র কবিতা ও 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র নিবন্ধগুলি। চন্দননগর থেকে রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিদাদাদের সঙ্গে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করে উঠলেন সদর স্ট্রীটের বাড়িতে। সেখানে 'প্রভাতসংগীত' এবং 'ছবি ও গানে'র কবিতাগুলি লেখা শুরু হল। কিছুদিনের জন্যে সদর স্ট্রীটের দল গেলেন দার্জিলিঙে। সেখান থেকে ফিরে আর সদর স্ট্রীটে নয়, এলেন সার্কুলার রোডের বাসা-বাড়িতে। পরবর্তী গ্রীষ্মে কিছুদিন কাটল কারোয়ারের সমুদ্রতীরে। এই কালসীমার মধ্যেই 'প্রভাতসংগীত' এবং 'ছবি ও গানে'র কবিতাগুলি লেখা। 'প্রভাত-সংগীতে'র প্রকাশ ১২৯০ সালের বৈশাখে। বেশির ভাগ কবিতাই লেখা ১২৮৯ সালে। 'ছবি ও গান' প্রকাশিত হয় 'প্রভাতসংগীতে'র দশ-এগারো মাস পরে, ১২৯০ সালের ফাল্গুনে।

'ছবি ও গানে'র "উৎসর্গে" কবি লিখেছেন, "গত বৎসরকার বসন্তের ফুল লইয়া এ বৎসরকার বসন্তে মালা গাঁথিলাম। যাঁহার নয়ন-কিরণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি একটি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিত, তাঁহারি চরণে ইহাদিগকে উৎসর্গ করিলাম।" বলাই বাহুল্য, কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশেই এই উৎসর্গ-লিপি রচিত। এই উৎসর্গ-লিপির ভাষার তাৎপর্য আমরা প্রথম খণ্ডে আলোচনা করেছি।[১৬] 'ছবি ও গানে'র কবিতাগুলি 'প্রভাতসংগীতে'র প্রায় সমকালীন। "গত বসন্তের ফুল নিয়ে এ বৎসরকার [১২৯০] বসন্তে মালা" গাঁথা হয়েছে—এ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে উৎসর্গের ভাষায়। 'গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপনে' কবি বলেছেন, "এই গ্রন্থে প্রকাশিত ছোট ছোট কবিতাগুলি গত বৎসরে লিখিত হয়। কেবল শেষ তিনটি কবিতা পূর্বেকার লেখা....।"[১৭]

'ছবি ও গানে'র "উৎসর্গ" এবং "গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপনে" যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, 'প্রভাতসংগীত' এবং 'ছবি ও গানে'র কবিতাগুলি মুখ্যত কবির বাইশ বৎসর বয়সের লেখা। সুরের পার্থক্য অনুসারে একই বৎসরের ফসল দুখানি পৃথক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। 'প্রভাতসংগীতে'র কবিতাগুলি তত্ত্বপ্রধান। কবির কণ্ঠে আলোর মন্ত্র উচ্চারিত। 'ছবি ও গানে'র কবিতাগুলি ভাবপ্রধান, কবির কণ্ঠে প্রেমের মন্ত্র গুঞ্জরিত। কবি নিজেই এই পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। রচনাবলী সংস্করণে "কবির ভণিতা"য় তিনি বলেছেন, সন্ধ্যাসংগীত পর্বে তাঁর মনে কেবলমাত্র "হৃদয়াবেগের গদ্‌গদভাষী আন্দোলন" চলছিল। 'প্রভাত সংগীতে' দেখা দিল "একটা আধটা মননের রূপ।" কবি বলছেন, "কোথা থেকে কতকগুলো মত মনের অন্দর-মহলে জেগে উঠে সদরের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল। ঐগুলো হচ্ছে অনন্ত জীবন, অনন্ত মরণ, প্রতিধ্বনি।"[১৮]

'প্রভাতসংগীতে'র মূল সুর ফুটে উঠেছে প্রভাত-উৎসবে। কবি বলছেন :

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি।
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

* * *

জগৎ আসে প্রাণে, জগতে যায় প্রাণ,
জগতে প্রাণে মিলি গাহিছে এ কী গান।

'ছবি ও গান' সম্পর্কে রচনাবলী সংস্করণে "কবির মন্তব্যে" কবি বলেছেন, "পূর্বেকার অবস্থায় একটা বেদনা ছিল অনুদ্দিষ্ট, সে যেন প্রলাপ বকে আপনাকে শান্ত করতে চেয়েছে। এখন সেই বয়স যখন কামনা কেবল সুর খুঁজছে না, রূপ খুঁজতে বেরিয়েছে। * * কবি সংসারের ভিতরে তখনো প্রবেশ করে নি, তখনো সে বাতায়নবাসী।"[১৯]

'ছবি ও গানে'র মূল সুরটি প্রকাশিত হয়েছে "ঘুম" কবিতার শেষ দুটি পঙ্‌ক্তিতে। কবি বলছেন :

আলোতে ছেলেতে ফুলে এক সাথে আঁখি খুলে
প্রভাতে পাখিতে গান গায়।

৭

ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে [২১ মে, ১৮৯০] কবি প্রমথ চৌধুরীকে 'ছবি ও গান' সম্পর্কে একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন। তাতে তিনি বলেছেন, "আমি তখন দিনরাত পাগল হয়ে ছিলুম।"…"আমার সমস্ত শরীরে মনে নবযৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মতো এসে পড়েছিল।"…"একটা বাতাসের হিল্লোলে একরাত্রির মধ্যে কতকগুলো ফুল মায়ামন্ত্রবলে ফুটে উঠেছিল তার মধ্যে ফলের লক্ষণ কিছুই ছিল না। কেবলি একটা সৌন্দর্যের পুলক, তার মধ্যে পরিণাম কিছুই ছিল না।"…"সত্যি কথা বলতে কি, সেই নবযৌবনের নেশা এখনো আমার হৃদয়ের মধ্যে লেগে রয়েছে। 'ছবি ও গান' পড়তে পড়তে আমার মন যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে এমন আমার কোন পুরোনো লেখায় হয় না।"[২০]

সেই নবযৌবনের নেশা-ধরা পরিবেশটি পাওয়া যাবে 'ছবি ও গানে'র "জাগ্রত স্বপ্ন" কবিতায়। কবি বলছেন :

চারি দিকে মোর বসন্ত হসিত,
যৌবন-কুসুম প্রাণে বিকশিত,
কুসুমের 'পরে ফেলিব চরণ,
যৌবন-মাধুরী ভরে।
চারিদিকে মোর মাধবী মালতী
সৌরভে আকুল করে।

কবির নিজের অবস্থাটি ফুটে উঠেছে "পাগল" ও "মাতাল" কবিতায়। "পাগল" কবিতায় কবি নিজের মনের মত্তদশাটি বর্ণনা করে বলেছেন :

যেখান দিয়ে যায় সে চলে
সেথায় যেন ঢেউ খেলে যায়,
বাতাস যেন আকুল হয়ে ওঠে
ধরা যেন চরণ ছুঁয়ে
শিউরে ওঠে শ্যামল দেহে
লতায় যেন কুসুম ফোটে ফোটে।

* * *

আকাশ বলে এস এস,
কানন বলে ব'সো ব'সো,
সবাই যেন নাম ধরে তার ডাকে
হেসে যখন কয় সে কথা,
মূর্ছা যায় রে বনের লতা,
লুটিয়ে ভুঁয়ে চুপ করে সে থাকে।

"মাতাল" কবিতায় কবি বলছেন :

চাঁদের কিরণ পান করে ওর ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি,

* * *

ফুলের গন্ধে মাতাল হয়ে বসে আছে একাকী।

এই একাকিত্বের বেদনাই 'ছবি ও গানে'র মূল সুরটি রচনা করেছে। "পাগল" কবিতায় কবি আক্ষেপের সুরে বলছেন :

তোরাই শুধু শুনলি নে রে,
কোথায় বসে রইলি যে রে,
দ্বারের কাছে গেল গেয়ে গেয়ে,
কেউ তাহারে দেখলি নে তো চেয়ে।
গাইতে গাইতে বলে গেল,
কত দূর সে চলে গেল,
গানগুলি তার হারিয়ে গেল বনে।
দুয়ার দেওয়া তোদের পাষাণ মনে।

"মাতাল" কবিতায় তাঁর প্রাণের অভিলাষটি ব্যক্ত করে বলছেন :

চলো দূরে নদীর তীরে,
বসে সেথায় ধীরে ধীরে,
একটি শুধু বাঁশরী বাজাও।
আকাশেতে হাসবে বিধু,
মধু কণ্ঠে মৃদু মৃদু
একটি শুধু সুখেরি গান গাও।

৮

'দুয়ার দেওয়া পাষাণ মনে'র কাছে অতৃপ্ত প্রেমিকের আকুল আবেদনই 'ছবি ও গানে'র প্রেমচেতনার মর্মবাণী। চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগান-বাড়ির বকুল গাছটি কবিমানসকে নিত্যসুরভিত করে রেখেছে। এই বকুলই রবীন্দ্র-সাহিত্যের সবচেয়ে প্রিয় ফুল। সেই বকুল গাছের ছায়ায় নতুন-বৌঠানের ছবিটিকে কবি নানারূপে ফিরে ফিরে দেখেছেন।—

আঁধার গাছের ছায়
ডুবু ডুবু জোছনায়
ম্লানমুখী রমণী দাঁড়িয়ে।[২১]

ডুবু ডুবু জোছনায় আঁধার গাছের ছায়াটিতে তরুণ কবির সৌন্দর্যমুগ্ধ আনন্দিত চিত্তের কলাকৃতির স্পর্শ লেগেছে—

ঘন গাছের পাতার মাঝে
আঁধার পাখি গুটিয়ে পাখা,
তারি উপর চাঁদের আলো শুয়েছে,
ছায়াগুলি এলিয়ে দেহ
আঁচলখানি পেতে যেন
গাছের তলায় ঘুমিয়ে রয়েছে।[২২]

"সুখের স্মৃতি" কবিতায় সেই গাছের ছায়ায়, সেই চাঁদের আলোয় কাদম্বরী দেবীর মূর্তিটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—

চেয়ে আছে আকাশের পানে
জোছনায় আঁচলটি পেতে,

যত আলো ছিল সে চাঁদের
সব যেন পড়েছে মুখেতে।

* * *

অতি দূরে বাজে ধীরে বাঁশি,
অতি সুখে পরান উদাসী,
অধরেতে স্খলিতচরণা
মদিরহিল্লোলময়ী হাসি।
কে যেন রে চুমো খেয়ে তারে
চলে গেছে এই কিছু আগে ;
চুমোটিরে বাঁধি ফুলহারে,
অধরেতে হাসির মাঝারে,
চুমোতে চাঁদের চুমো দিয়ে
রেখেছে রে যতনে সোহাগে।

জ্যোৎস্নার প্রসাধনে কাদম্বরী দেবীর সুন্দর মুখখানি প্রেমমুগ্ধ কবির চোখে আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। কিন্তু কাদম্বরী দেবীর চোখ দুটিতেই কবি তাঁর আত্মার গভীর রহস্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই তাঁর বর্ণনাতে আত্মিক প্রেমের সেই দুটি চোখের কথাই এসেছে বারবার। "স্নেহময়ী" কবিতায় কবি বলেছেন, জুঁই বেলা অশোক বকুলের মত ওদেরই একজন হয়ে, তাঁর স্নেহ কুড়োবার বাসনা কবিচিত্তকে অনুক্ষণ ঘিরে আছে—

বড়ো সাধ যায় তোরে
ফুল হয়ে থাকি ঘিরে
কাননে ফুলের সাথে মিশে,
নয়ন-কিরণে তোর
দুলিবে পরান মোর,
সুবাস ছুটিবে দিশে দিশে।

এই কাব্যকলির বাগ্‌ভঙ্গিটি লক্ষ্য করার মত। 'নয়ন-কিরণে তোর দুলিবে পরান মোর।'—স্বতই এই চরণটি কবির চিরপ্রিয় জ্ঞানদাসকে মনে করিয়ে দেয়—

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ান-নাচনে নাচে হিয়ার পুতলী॥

অমিয়-মাধুরী-মাখা সেই চোখের বর্ণনায় কবি চির-অতৃপ্ত। বলছেন :

অমিয়-মাধুরী মাখি
চেয়ে আছে দুটি আঁখি,
জগতের প্রাণ জুড়াইছে,
ফুলেরা আমোদে মেতে
হেলে দুলে বাতাসেতে
আঁখি হতে স্নেহ কুড়াইছে।

কবিচিত্তের পুষ্পকামনাও ওই দৃষ্টিসুধা পানের জন্যে চিরপিপাসিত। তাই তাঁর প্রার্থনা :

ওই দৃষ্টিসুধা দাও,
এই দিক পানে চাও,
প্রাণে হোক প্রভাত বিকাশ।

এই বাসনাই "স্মৃতি-প্রতিমা" কবিতায় শৈশবের স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে নূতন আদরের প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছে—

সেই পুরাতন স্নেহে
হাতটি বুলাও দেহে,
মাথাটি বুকেতে তুলে রাখি,
কথা কও নাহি কও,
চোখে চোখে চেয়ে রও,
আঁখিতে ডুবিয়া যাক আঁখি।

কিন্তু 'ছবি ও গানে' কবির পূর্বরাগ-বিপ্রলম্ভ যত 'প্রৌঢ়' হয়েছে ততই অপ্রাপ্তির বেদনাটি মীড়ে-মূর্ছনায় করুণ নিখাদে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। বৈষ্ণব কবিরা পূর্বরাগের বর্ণনায় স্বপ্নকে একটা বড় স্থান দিয়েছেন। "স্বাক্ষাৎ স্বপ্নে চ" রূপ দেখে পূর্বরাগ-সঞ্চার শুধু বৈষ্ণব কবিদেরই নয়, সংস্কৃত সাহিত্যেরও একটা বড় দিক। বড়, কেন না তা মনস্তত্ত্বসম্মতও বটে। 'ছবি ও গানে'র প্রচলিত সংস্করণের শেষ কবিতা "নিশীথ-চেতনা" এই স্বপ্নানুরাগেরই একটি সার্থক রূপ। এই কবিতায় কবিকল্পনা বৈষ্ণবানুসারী হয়েও স্বকীয় মাধুর্যে উজ্জ্বল। স্বপ্নকে সম্ভাষণ করে কবি বলছেন :

স্বপ্ন, তুমি এস কাছে, মোর মুখপানে চাও,
তোমার পাখার 'পরে মোরে তুলে লয়ে যাও।

স্বপ্নের পাখায় ভর করে স্বপ্নতনু হবার এই বাসনার হেতু নির্ণয় করে কবি বলছেন :

হৃদয়ের দ্বারে দ্বারে ভ্রমি মোরা সারা নিশি,
প্রাণে প্রাণে খেলাইয়া প্রভাতে যাইব মিশি।

এই সাধারণ বাসনাটিই কবিতার শেষপ্রান্তে এসে একটি বিশেষ প্রাণের স্বপ্ন হয়ে ওঠার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষায় পরিসমাপ্ত হয়েছে। কবি বলছেন :

ওরে স্বপ্ন, আমি যদি স্বপন হতেম হায়,
যাইতাম তার প্রাণে, যে মোরে ফিরে না চায়।
প্রাণে তার ভ্রমিতাম, প্রাণে তার গাহিতাম,
প্রাণে তার খেলাতেম অবিরাম নিশি নিশি।
যেমনি প্রভাত হত আলোকে যেতাম মিশি।
দিবসে আমার কাছে কভু সে খোলে না প্রাণ,
শোনে না আমার কথা, বোঝে না আমার গান,
মায়ামন্ত্রে প্রাণ তার গোপনে দিতাম খুলি,
বুঝায়ে দিতেম তারে এই মোর গানগুলি।
পরদিন দিবসেতে যাইতাম কাছে তার,
তাহলে কি মুখপানে চাহিত না একবার ?

যে ফিরেও চায় না তার দুয়ার-দেওয়া পাষাণ-প্রাণে প্রবেশের পথটি কবির নিজেরই বিপ্রলব্ধ চিত্তের আবিষ্কার। স্বপ্ন দেখে উপজাত পূর্বরাগের প্রথানুগত্য-মাত্রই নয়, বৈষ্ণব পদাবলীর ঐতিহ্যকে এখানে কবি সূক্ষ্ম চারুতায় মণ্ডিত করেছেন।

৯

কবি বলেছেন, 'ছবি ও গান' রচনার সময় তাঁর সেই বয়স ছিল যখন 'কামনা কেবল সুর খুঁজছে না, রূপ খুঁজতে বেরিয়েছে'। উক্তিটির তাৎপর্য অনেকখানি। বস্তুত 'সন্ধ্যাসংগীতে'র পর্বের সঙ্গে 'প্রভাতসংগীত' এবং 'ছবি ও গানে'র পর্বের

একটি বড় পার্থক্য এখানেই রয়েছে। 'সন্ধ্যাসংগীতে'র পর্বে কেবলমাত্র "হৃদয়ের গদ্‌গদভাষী আন্দোলন।" 'প্রভাতসংগীতে' "জগৎ আসে প্রাণে, জগতে প্রাণ যায়।" 'ছবি ও গানে' "আলোতে ছেলেতে ফুলে এক সাথে আঁখি খুলে প্রভাতে পাখিতে গান গায়।"

এই দুই পর্বে কবির জীবনচেতনার যে পরিবর্তন হয়েছে সেই পরিবর্তন তাঁর প্রেমচেতনার মধ্যেও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। 'সন্ধ্যাসংগীতে'র প্রেম হৃদয়ের গদ্‌গদভাষী আন্দোলনেই পরিসমাপ্ত, 'ছবি ও গানে'র প্রেম কেবল সুরই খুঁজছে না, রূপ খুঁজতেও বেরিয়েছে। কেবল আত্মকথাই নয়, যাকে ভালবাসি তার প্রতিও দৃষ্টি উন্মুক্ত হয়েছে। 'ছবি ও গানে'র প্রথম দুটি কবিতায় কবির প্রেমাবিষ্ট 'আমি' তন্ময় হয়ে দেখছে প্রেমস্বরূপিণী 'তুমি'কে। "কে ?" কবিতায় কবি বলছেন :

আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাসটুকুর মতো।
সে যে ছুঁয়ে গেল নুয়ে গেল রে
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত।

কবিচেতনা এখানেও আত্মমগ্ন। কিন্তু "সুখস্বপ্ন" কবিতায় 'সে' আত্মস্বরূপেই সমুদ্ভাসিতা। তন্ময় দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে কবি বলছেন :

ওই জানালার কাছে বসে আছে
করতলে রাখি মাথা।
তার কোলে ফুল পড়ে রয়েছে
সে যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা।

এই দুটি কবিতার আলম্বনস্বরূপিণী কবির মানসলক্ষ্মী গানের পাখায় ভর করে শাশ্বত প্রেমের অমর লোকে পৌঁছেছেন। কিন্তু তাঁর যে বিশেষ লাবণ্যময় র্তিটি কবি ধ্যান করেছেন সেই মূর্তিটিই চিরকালের জন্যে তাঁর মানস-পটে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে—

চোখের উপর মেঘ ভেসে যায়,
উড়ে উড়ে যায় পাখি,
সারা দিন ধরে বকুলের ফুল
ঝরে পড়ে থাকি থাকি।

মধুর আলস, মধুর আবেশ,
মধুর মুখের হাসিটি,
মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে
বাজিছে মধুর বাঁশিটি।

এই লাবণ্যমূর্তিটির দিকে তাকিয়ে ভানুসিংহের মানস-রাধাকে মনে পড়ে-যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু 'ছবি ও গানে'র কবির ধ্যানে কাদম্বরী দেবীর সৌন্দর্য-মূর্তিটি সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে "আচ্ছন্ন" কবিতায়। কবি বলছেন :

আলোক-বসনা যেন আপনি সে ঢাকা আছে
আপনার রূপের মাঝার।

পরিণত বয়সে কবি অমরাবতীর বাতায়নবর্তিনী[২৩] জ্যোতির্ময়ী উষসী-মূর্তিরূপে কাদম্বরী দেবীর যে ধ্যানে তন্ময় হয়েছিলেন তারই প্রথম লাবণ্য-প্রতিমা রচিত হয়েছে 'ছবি ও গানে'র এই "আচ্ছন্ন" কবিতায়। এখানে কবির প্রেমচেতনা তাঁর সৌন্দর্যচেতনার সহোদর। কবিতাটির অন্তিম স্তবকে অনুরক্ত কবির মানস-সিন্ধু মন্থন করে যে সৌন্দর্যলক্ষ্মী আবির্ভূতা হয়েছেন কবির হৃদয়-কমলাসনে তাঁর অধিষ্ঠান চিরদিনের। প্রেমের দৃষ্টিতে যে সৌন্দর্যের আলোক বিচ্ছুরিত হয় তারই কিরণে উদ্ভাসিত কবির সেই মানসপ্রতিমার দিকে তাকিয়ে কবি বলছেন :

কে তুমি গো উষাময়ী, আপন কিরণ দিয়ে
আপনারে করেছ গোপন,
রূপের সাগর মাঝে কোথা তুমি ডুবে আছ
একাকিনী লক্ষ্মীর মতন।
ধীরে ধীরে ওঠো দেখি, একবার চেয়ে দেখি,
স্বর্ণজ্যোতি কমল আসন,
সুনীল সলিল হতে ধীরে ধীরে উঠে যথা
প্রভাতের বিমল কিরণ।
সৌন্দর্য-কোরক টুটে এসো গো বাহির হয়ে
অনুপম সৌরভের প্রায়,
আমি তাহে ডুবে যাব সাথে সাথে বহে যাব
উদাসীন বসন্তের বায়।

এই স্বর্ণজ্যোতি কমলাসনা ঊষাময়ী মূর্তিই 'ছবি ও গানে'র কবিমানসের তন্নিষ্ঠ ধ্যানের মূর্তি।

১০

রবীন্দ্রমানসে কাদম্বরী দেবীর প্রথম মানসী-মূর্তি হল রাধা-মূর্তি। সে মূর্তির প্রথম প্রকাশ 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে।

ভানুসিংহ ঠাকুরের ছদ্মনামে রবীন্দ্রনাথ সবশুদ্ধ তেইশটি রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ রচনা করেন। প্রথম পদ হল 'গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে'। সেটি লেখা ১২৮৪ বঙ্গাব্দের বর্ষাকালে। সেই বর্ষাতেই, শ্রাবণ মাসে, ঠাকুরবাড়ি থেকে 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। ১২৮৪ সালের আশ্বিন-সংখ্যায় 'সজনি গো, শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা' শীর্ষক পদটি প্রকাশিত হয়। ভারতীতে প্রকাশিত কালক্রম অনুসারে পদগুলিকে পুনর্বিন্যস্ত করা হল :

১২৮৪ আশ্বিন	'সজনি গো, শাঙন গগনে'
,, অগ্রহায়ণ	'গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে'
,, পৌষ	'বজাও রে মোহন বাঁশি'
,, মাঘ	'হম সখি দারিদ নারী'
,, ফাল্গুন	'সখি রে পিরীত বুঝবে কে'
,, ,,	'সতিমির রজনী'
,, চৈত্র	'বাদর বরখন, নীরদ গরজন'
১২৮৫ বৈশাখ	'বার বার সখি বারণ করনু'
১২৮৬	'মাধব, না কহ আদর বাণী'
১২৮৭ বৈশাখ	'দেখ লো সজনী চাঁদনী রজনী'
১২৮৭ অগ্রহায়ণ	'সখি লো, সখি লো, নিকরুণ মাধব'
১২৮৭	'হম যব না রব, সজনী,'
১২৮৮ শ্রাবণ	'মরণ রে, তুঁহু মম'
১২৯০	'আজু সখি মুহু মুহু'

ভারতীতে প্রকাশিত এই চৌদ্দটি পদ ছাড়া 'কো তুঁহু বোলবি মোয়' পদ

২৯২ সালের 'নবজীবনে' প্রকাশিত হয়েছিল। বাকি যে আটটি পদ সাময়িক ত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি সেগুলি হল—

বসন্ত আওল রে !
শুনলো শুনলো বালিকা,
হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে,
শ্যামরে, নিপট কঠিন মন তোর।
সজনি সজনি রাধিকা লো,
বঁধুয়া, হিয়া-'পর আও রে,
শুন সখি, বাজই বাঁশি,
শ্যাম, মুখে তব মধুর অধরমে।

এই তেইশটি পদের মধ্যে পরবর্তী কালে 'হম সখি দারিদ নারী', 'সখিরে পিরীত বুঝবে কে' এবং 'দেখ লো সজনী চাঁদনী রজনী'—এই তিনটি পদ পরিত্যক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় সর্বশেষে প্রকাশিত রচনাবলী সংস্করণে কুড়িটি পদই ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে রয়েছে।

গ্রন্থাকারে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' প্রকাশিত হয় ১২৯১ সালে। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে গ্রন্থের প্রকাশকরূপে বিজ্ঞাপিত করেছিলেন। প্রকাশকের বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল, "ভানুসিংহের পদাবলী শৈশবসংগীতের আনুষঙ্গিক রূপে প্রকাশিত হইল। ইহার অধিকাংশই পুরাতন কালের খাতা হইতে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছি।"

শেষের বাক্যটি থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, সাময়িক-পত্রিকায় অপ্রকাশিত আটটি পদ "পুরাতন কালের খাতা থেকে সন্ধান করে বের করা হয়েছে।" অর্থাৎ এগুলি কবির ষোলো-সতেরো বৎসর বয়সের রচনা। প্রথম সংস্করণ পদাবলীতে 'আজু সখি মুহু মুহু', 'মরণ রে তুঁহু মম,' এবং 'কো তুঁহু বোলবি মোয়'—এই তিনটি পদ ছিল না। প্রথম দুটি 'ছবি ও গানে'র প্রথম ও শেষ কবিতারূপে ওই গ্রন্থের অঙ্গীভূত হয়েছিল। তৃতীয়টি পদাবলীর প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পরে, ১২৯২ সালে রচিত হয়েছে।

১১

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংগীত-সংকলন। দ্বিতীয় সংকলন 'রবিচ্ছায়া' প্রকাশিত হয় পদাবলীর পর বৎসর, ১২৯২ সালে। পরিণত বয়সে ভানুসিংহের পদাবলী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। একান্ন বৎসর বয়সে লেখা 'জীবনস্মৃতি'তে "ভানুসিংহের কবিতা" প্রসঙ্গের সমাপ্তিতে বলেছেন, "ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণ-গলানো ঢালা সুর নাই, তাহা আজকালকার সস্তা আর্গিনের বিলাতি টুংটাং মাত্র।"[২৪]

শেষের বাক্যটির তাৎপর্য কি তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। ভানুসিংহের কবিতা আসলে গান। বৈষ্ণব পদাবলীর গানের একটি বিশিষ্ট 'ঢঙ' আছে তাকে বলা হয় কীর্তন। ভানুসিংহের গানগুলি কীর্তনাঙ্গ হলেও তার মধ্যে "সস্তা আর্গিনের বিলাতি টুংটাং"-এর প্রভাবও কিছু কিছু এসেছে। কিন্তু এখানে রবীন্দ্রনাথ "দিশি নহবতের প্রাণগলানো ঢালা সুরে"র সঙ্গে "সস্তা আর্গিনের বিলাতি টুংটাং"-এর যে তুলনা করেছেন তা ভানুসিংহের গানের সুর বা রীতি সম্পর্কে নয়, তা ভানুসিংহের পদাবলীর ভাব সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বিশদতর হয়েছে ১৩৪৬ সালে প্রকাশিত রচনাবলী সংস্করণে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর 'সূচনা'য়। তাতে রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহের কবিতাগুলিকে বলেছেন "পদাবলীর জালিয়াতি"। জালিয়াতি কেন তার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন, "পদাবলী শুধু কেবল সাহিত্য নয়, তার রসের বিশিষ্টতা বিশেষ ভাবের সীমানার দ্বারা বেষ্টিত। সেই সীমানার মধ্যে আমার মন স্বাভাবিক স্বাধীনতার সঙ্গে বিচরণ করতে পারে না। তাই ভানুসিংহের সঙ্গে বৈষ্ণবচিত্তের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা নেই।"[২৫]

এই মন্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, পদাবলীর রসের বিশিষ্টতা "বিশেষ ভাবের সীমানার দ্বারা বেষ্টিত"। সেই সীমানার মধ্যে তাঁর মন "স্বাভাবিক স্বাধীনতার সঙ্গে বিচরণ করতে পারে না", তাই ভানুসিংহের সঙ্গে "বৈষ্ণবচিত্তের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা নেই"। সেইজন্যেই ভানুসিংহের কবিতা "পদাবলীর জালিয়াতি"। রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যকেও সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন।

প্রথমেই প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহ ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন কেন? তিনি জীবনস্মৃতিতে বলেছেন, অক্ষয় চৌধুরীর কাছে বালক-কবি চ্যাটার্টনের গল্প শুনে তাঁকে নকল করার লোভ তাঁর হয়েছিল। চ্যাটার্টন অষ্টাদশ শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকের কবি [১৭৫২-১৭৭০]। পঞ্চদশ শতাব্দীর রাউলে নামক একজন কল্পিত কবির ছদ্মনাম গ্রহণ করে তিনি প্রাচীন রীতিতে কবিতা লিখে অল্পবয়সেই প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। কিন্তু জীবনের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে মাত্র আঠারো বৎসর বয়সেই তিনি বিষ পান করে আত্মহত্যা করেছিলেন। 'ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস'-লেখক ক্যাজামিঞার ভাষায় চ্যাটার্টন ছিলেন 'the most romantic man of his age." রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বলেছেন, 'তাঁহার গল্পটার মধ্যে যে একটা নাটকিয়ানা' ছিল, তা তাঁর কল্পনাকে খুব 'সরগরম' করে তুলেছিল। তাই 'আত্মহত্যার অনাবশ্যক অংশটুকু' হাতে রেখে তিনি দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলেন।

দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হবার বাসনায় নিজের নাম গোপন করার এই কাহিনী কিন্তু আংশিক ভাবে সত্য। সে যুগে সাময়িক-পত্রিকায় বেশির ভাগ লেখাই অনামে কিংবা ছদ্মনামে প্রকাশিত হত। ভারতীর প্রথম মাস থেকে রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধের যে কঠোর সমালোচনা লিখেছিলেন তাতে "ভাঃ" এই একাক্ষর নামসংকেত ব্যবহৃত হয়। বলাই বাহুল্য "ভাঃ" ভানুসিংহেরই আদ্যক্ষর। কাজেই শুধু পদাবলী রচনার জন্যেই রবীন্দ্রনাথ এই নাম গ্রহণ করেছিলেন একথা সত্য নয়। পরবর্তীকালে শ্রীমতী (লেডি) রানু মুখার্জিকে তিনি যেসব পত্র লিখেছিলেন তারও কিছু কিছু লেখা "ভানুসিংহের পত্রাবলী" নামে প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ 'অপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর', এবং 'দিক্‌শূন্য ভট্টাচার্য' প্রভৃতি ছদ্মনামেও ছেলেবেলায় লেখা প্রকাশ করেছেন।

পদাবলী লেখা হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহের পরিচয় প্রকাশের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। জীবনস্মৃতিতে সেকথা তিনি বলেছেন। তাঁর বয়স্ক বন্ধু প্রবোধচন্দ্র ঘোষ যখন কবিতাগুলি কোন প্রাচীন কবির লেখা শুনে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন তখন তিনি আর নিজেকে গোপন রাখতে পারেন নি। নিজের খাতা দেখিয়ে স্পষ্ট প্রমাণ করে দিলেন যে ভানুসিংহের পদাবলী তাঁরই লেখা। বৎসর দুই না যেতেই রবীন্দ্রনাথের একটি অনামা লেখা [চ্যাটার্টন বালক-কবি] ভারতীর ১২৮৬

সালের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হল। তাতেও প্রাচীন কবির নামে প্রাচীন রীতিতে কবিতা লেখা সম্পর্কে ওকালতি আছে। তা ছাড়া ১২৯১ সালের 'নবজীবন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় [শ্রাবণ] "ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী" নামে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরহীন একটি ব্যঙ্গরচনা প্রকাশিত হয়। তাতে ভানুসিংহের জন্ম যে ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে হয়েছে সেকথা কবি বলেই ফেলেছেন। কিন্তু তারও প্রয়োজন ছিল না ; কেন না ১২৯০ সালের ফাল্গুনে রবীন্দ্রনাথের 'ছবি ও গান' প্রকাশিত হয়। তার ভূমিকা ও উপসংহার হিসাবে যথাক্রমে "আজু সখি মুহু মুহু" এবং "মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান"—এই পদ দুটি গ্রন্থের অঙ্গীভূত হয়। তাতে ভানুসিংহের রচনা যে রবীন্দ্রনাথেরই লেখা তাই শুধু প্রমাণিত হয় নি, এই রচনাগুলি যে তাঁর তৎকালীন রচনাবলীর ভাব থেকে ভিন্ন নয় তাও পরোক্ষভাবে স্বীকৃত হয়েছে।[২৬]

তা ছাড়া বৈষ্ণব পদাবলীর অনুসরণে রাধাকৃষ্ণের প্রতীকে প্রেমের কবিতা রচনার রীতি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত চলে এসেছে। কবিওয়ালারা 'সখীসংবাদে' রাধাকৃষ্ণ প্রতীকই ব্যবহার করেছেন। অবশ্য কবিওয়ালাদের হাতে বৈষ্ণবীয় প্রেমাদর্শ বিকৃত ও অবনমিত হয়েছে। কবিওয়ালাদের হাতে রাধাকৃষ্ণ পদাবলীর এই বিকৃতি দেখে মধুসূদন খেদ করে বলেছিলেন "vile imagination of poetasters"ই এ জন্যে দায়ী। তাই তিনি 'ব্রজাঙ্গনা'য় নূতন ভাষা ও নূতন রীতি উদ্ভাবন করলেন। তা ছাড়া ব্রজাঙ্গনার ভাবও উচ্চগ্রামে উন্নীত। সুগভীর বিরহে রাধাচিত্ত যখন 'উন্মাদ'-দশায় পৌঁছেছে তখনকার প্রেমচেতনাই ভাষা পেয়েছে ব্রজাঙ্গনায়। পদাঙ্কদূতের "গোপী ভর্তু বিরহবিধুরা" শ্লোকটির উদ্ধৃতির সাহায্যে মধুসূদন তাঁর কবিকল্পনাকে সেই উচ্চগ্রামে উন্নীত করেছিলেন।

ষোলো বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ যখন ভানুসিংহের পদাবলী শুরু করেন তখন তিনি বৈষ্ণব প্রেমভক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এ কথা মনে করা সঙ্গত হবে না। এইজন্যেই তিনি বলেছেন, ভানুসিংহের সঙ্গে বৈষ্ণবচিত্তের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা নেই। তাহলে রবীন্দ্রনাথ ব্রজবুলি ভাষায় রাধাকৃষ্ণের প্রেম অবলম্বনে পদাবলী লিখতে গেলেন কেন ? এই প্রশ্নের আংশিক উত্তর রয়েছে জীবনস্মৃতিতে। অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্রের যুগ্ম-সম্পাদনায় "প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ" তিনখণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৭৪-৭৬ খ্রীস্টাব্দে।

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন তেরো থেকে পনেরো। জীবনস্মৃতিতে তিনি বলছেন, এই কাব্যসংগ্রহ তিনি আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন। বিদ্যাপতির ব্রজবুলি ভাষা বালককবির কাছে সহজবোধ্য ছিল না। কিন্তু তিনি সেই ভাষার রহস্য-আবিষ্কারে অধ্যবসায়ের সঙ্গে আত্মনিয়োগ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলছেন :

[১] "গাছের বীজের মধ্যে যে-অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নিচে যে-রহস্য অনাবিষ্কৃত, তাহার প্রতি যেমন একটি একান্ত কৌতূহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল।"

[২] "আবরণ মোচন করিতে করিতে একটি অপরিচিত ভাণ্ডার হইতে একটি-আধটি কাব্যরত্ন চোখে পড়িতে থাকিবে, এই আশাতেই আমাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল।"

[৩] "এই রহস্যের মধ্যে তলাইয়া দুর্গম অন্ধকার হইতে রত্ন তুলিয়া আনিবার চেষ্টায় যখন আছি তখন নিজেকেও একবার এইরূপ রহস্য-আবরণে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার একটা ইচ্ছা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল।"[২৭]

এই উদ্ধৃতিত্রয়ের শেষাংশ থেকে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী রচনার মূলে কী প্রেরণা ছিল তার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। নিজেকে "রহস্য-আবরণে আবৃত" করে প্রকাশ করার একটা ইচ্ছাই কবিকিশোরকে ভানু-সিংহের পদাবলী রচনায় প্রবৃত্ত করেছে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় প্রকাশক-রূপে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ভানুসিংহের পদাবলী তাঁর তেরো থেকে আঠারো বৎসর বয়সের মধ্যে লেখা 'শৈশবসংগীতে'র "আনুষঙ্গিক" রচনা। ভানুসিংহের পদাবলী শৈশবসংগীতের আনুষঙ্গিক বটে, কিন্তু একটু পার্থক্যও আছে। শৈশবসংগীতের সতেরোটি কবিতা ও গানের মধ্যে ফুলবালা, প্রতিশোধ, লীলা, অপ্সরা-প্রেম ও ভগ্নতরী—এই পাঁচটি গাথা-কবিতাও স্থান পেয়েছে। কাজেই "শৈশবসংগীত" সন্ধ্যাসংগীত ও প্রভাত-সংগীতের মত সংগীতাখ্য হলেও অবিমিশ্র গীতিকাব্য-সংকলন নয়। রচনা-কালের বিচারে ভানুসিংহের পদগুলিতেই রবীন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ গীতিকবিতা-রচনার সূত্রপাত। বনফুল-কবিকাহিনী-ভগ্নহৃদয়ের কাহিনীকাব্য রচনার রীতি পেরিয়ে সন্ধ্যাসংগীত-প্রভাতসংগীত-ছবি-ও-গানের বিশুদ্ধ গীতিকাব্য-রীতিতে পৌছবার মধ্যবর্তী স্তর হল ভানুসিংহের পদাবলী। ভানুসিংহের

রাধামূর্তি রচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ বনফুলের 'কমলা' এবং 'কবিকাহিনীর 'নলিনী'-মূর্তি কল্পনা করেছেন। ভানুসিংহের রাধা কমলা-নলিনীরই সহোদরা। কেবল তফাৎ এই যে, কমলা-নলিনী কিশোর-কবির স্বকপোলকল্পিত নায়িকা, আর রাধা সহস্র-বৎসরের ঐতিহ্য দিয়ে গড়া মূর্তিমতী প্রেম। বাল্যসখী কাদম্বরীর মধ্যে কবিকিশোর এই মূর্তিমতী প্রেমকেই আবিষ্কার করেছিলেন। কাদম্বরীর মানসরহস্যের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একই সূত্রে প্রেম ও গীতিকবিতাকে খুঁজে পেলেন। সেই আবিষ্কারের আনন্দই ভানুসিংহের পদাবলীর ভাষায় ও সুরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। স্বভাবতই রহঃসখীর এই মানসরহস্য অবগুণ্ঠনের অন্তরালেই মধুর ও সুন্দর হবে বলে ব্রজবুলির অবগুণ্ঠন এবং রাধাকৃষ্ণের নির্মোকটি ব্যবহৃত হয়েছে। নিজেকে রহস্য-আবরণে আবৃত করার এই হল মুখ্য হেতু। কবিকাহিনীতে রবীন্দ্রনাথ কবি ও নলিনীর প্রেমকাহিনীর মধ্যে "নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তিটাকেই"[২৮] খুব বড় করে দেখেছেন। কবিকাহিনীর নায়ক কবি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সে-কবি যে লেখকের সত্তা তা নয়—লেখক আপনাকে যা বলে মনে করতে ও ঘোষণা করতে ইচ্ছা করে, সে-কবি তাই।[২৯] ভানুসিংহের রাধা কবিকিশোরের রহঃসখীরই প্রেমমূর্তি।

কথাটাকে আরেকটু স্পষ্ট করা প্রয়োজন। "নষ্টনীড়ে"র অমল ও চারুর কৈশোরলীলার উপমানেই বক্তব্যটি বিশদীভূত হবে। অমল ও চারু প্রথমে আকাশকুসুমের চয়নে নিযুক্ত ছিল, তারপরে শুরু হল কাব্যকুসুমের চাষ। অমলের সাহিত্যরচনা এবং চারুকে তা পড়ে শোনানো হল দুজনের নিত্যকর্ম। "অমলের লেখা অমল চারু দুজনের সম্পত্তি। অমল লেখক এবং চারু পাঠক। তাহার গোপনতাই তাহার প্রধান রস।"[৩০]

ভানুসিংহের প্রথম পদটি রচনার ইতিবৃত্ত এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, "একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলাদিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা স্লেট লইয়া লিখিলাম, 'গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে।' লিখিয়া ভারি খুশি হইলাম—তখনই এমন লোককে পড়িয়া শুনাইলাম বুঝিতে পারিবার আশঙ্কামাত্র যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং সে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, 'বেশ তো, এ তো বেশ হইয়াছে।"[৩১]

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ভানুসিংহের প্রথম পদটি কবির স্বাভাবিক আনন্দ থেকেই সৃষ্ট। "মেঘলাদিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে"ই পদটি লেখা। জীবনস্মৃতিতে বলেছেন, "বাড়ির ভিতর এক ঘরে" খাটের উপর উপুড় হয়ে পড়ে পদটি লেখা হয়েছে। রচনাবলীর 'সূচনা'য় বলেছেন, "প্রথম গানটি লিখেছিলুম একটা শ্লেটের উপরে, অন্তঃপুরের কোণের ঘরে।"

এই অন্ত:পুরের কোণের ঘরে কবিকিশোরের নিত্যসঙ্গিনী ছিলেন কাদম্বরী দেবী। কবিতাটি লিখে ভারি খুশি হয়ে তখুনি যাঁকে দেখালেন তিনি কাদম্বরী দেবী ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না। কবিতার ভাব ও অর্থ বুঝতে পারার আশঙ্কামাত্র তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, এই পরিহাসবিজল্পিত বক্রোক্তিটি বিশেষ ব্যঞ্জনাবহ। বস্তুত কাদম্বরী দেবীর মনের কথাটিই রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহের রাধার কণ্ঠে ব্যক্ত করেছেন। একুশ বৎসর বয়সে লেখা 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র "মাছ ধরা" শীর্ষক অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ভাবের সরোবরে আমরা জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতে পারি না, ছিপ ফেলিয়া ধরিতে হয়। * * আমরা পরের মনঃসরোবর হইতেও মাছ তুলিয়া থাকি। আমার এক সহচর আছেন, তাঁহার পুষ্করিণী আছে, কিন্তু ছিপ নাই। অবসরমত আমি তাঁহার মন হইতে মাছ ধরিয়া থাকি, খ্যাতিটা আমার। নানা প্রকার কথোপকথনের চার ফেলিয়া তাঁহার মাছগুলিকে আকর্ষণ করিয়া আনি, ও খেলাইয়া খেলাইয়া জমিতে তুলি।"[৩২]

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, বিবিধ প্রসঙ্গের "সমাপন" প্রবন্ধের অন্তিম অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আমার এই লেখার মধ্যে লেখা রহিল, এক লেখা তুমি আমি পড়িব, আর এক লেখা সকলে পড়িবে।" কাদম্বরী দেবীকে উদ্দেশ্য করে লেখা এই অংশটির সঙ্গে "মাছ ধরা"র বক্তব্যটি মিলিয়ে পড়লেই বুঝতে পারা যাবে যে, কাদম্বরী দেবীর মনঃসরোবরেই ভানুসিংহ-রূপী রবীন্দ্রনাথ ধীবরবৃত্তি করেছেন।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে। তাঁকে গ্রন্থখানি উৎসর্গ করে উৎসর্গপত্রে কবি লিখেছেন, "ভানুসিংহের কবিতাগুলি ছাপাইতে তুমি আমাকে অনেকবার অনুরোধ করিয়াছিলে। তখন সে অনুরোধ পালন করি নাই। আজ ছাপাইয়াছি, আজ তুমি আর দেখিতে পাইলে না।" ভানুসিংহের কবিতাগুলি যদি নিতান্তই

"মেকি" হত, যদি এর মধ্যে শুদ্ধমাত্র "পদাবলীর জালিয়াতি"ই ধরা পড়ত, তাহলে কাদম্বরী দেবী কবিতাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্যে কিছুতেই আগ্রহ দেখাতেন না।

১২

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-জীবনে বৈষ্ণব-প্রভাবের কথা অনিবার্য ভাবেই আসে। ষাট বৎসর বয়সে ১৩২৮ সালের ১৬ই কার্তিক, রবীন্দ্রনাথ আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে যে পত্রখানি লেখেন এই প্রসঙ্গে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিজের জীবনে উপনিষৎ ও বৈষ্ণব-প্রভাবের আপেক্ষিক গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে রবীন্দ্রনাথ ব্রজেন্দ্রনাথকে লিখছেন:

"বৈষ্ণব সাহিত্য এবং উপনিষৎ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাওয়া তৈরি করিয়াছে। নাইট্রোজেনে এবং অক্সিজেনে যেমন মেশে তেমনি করিয়াই তাহারা মিশিয়াছে। আমার রচনায় সীমা ও অসীমের দ্বন্দ্ব নাই, মিলন আছে; তাহার কারণটি আমার ব্যক্তিগত প্রকৃতিতে নাই, আমার চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। * * আমার পিতার হৃদয়ে হাফিজ ও উপনিষদের এই সংগম ঘটিয়াছিল—সৃষ্টির পক্ষে এইরূপ দুই বিষমের মিলনের প্রয়োজন আছে—সৃষ্টিকর্তার চিত্তের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই আছেন নহিলে একভাবে সৃষ্টি হইতেই পারে না।"৩৩

রবীন্দ্রমানসে বিলসিত লীলাবাদের উৎসসন্ধানে এই পত্রখানির গুরুত্ব অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, যে-হাওয়ায় শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে আমরা বেঁচে আছি সেই হাওয়ায় যেমন নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন মিশে আছে, তেমনি তাঁর মনের হাওয়াও গড়ে উঠেছে উপনিষৎ ও বৈষ্ণব-সাহিত্যের মিশ্রণে। উপমাটি পরিপূর্ণ ভাবে সার্থক নয়। আকাশে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনে মিশে আছে বটে, কিন্তু তা রাসায়নিক সম্মিলনে যৌগিক পদার্থে পরিণত হয় নি। রবীন্দ্রমানসে বিলসিত লীলাবাদ কিন্তু উপনিষৎ এবং বৈষ্ণব-সাহিত্যের রাসায়নিক মিলনের ফলেই গড়ে উঠেছে। তা ছাড়া হাওয়ায় নাইট্রোজেনের পরিমাণ পাঁচ ভাগের চার ভাগ, অক্সিজেন পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র। কিন্তু রবীন্দ্রমানসে উপনিষৎ এবং বৈষ্ণবতার পরিমাণ প্রায় সমান-সমান। বরং তাঁর

ব্যক্তিসত্তায় উপনিষদের ভাব সমধিক হলেও তাঁর কবিসত্তায় বৈষ্ণবতার ভাব অনেক বেশি।

'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে'র মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে পরিচিত হন তেরো-চোদ্দ বৎসর বয়স থেকে। প্রথম কয়েক বৎসর চলে তার অনুকরণ এবং অনুসরণ। একুশ থেকে পঁচিশ বৎসর বয়সে অনুকরণের স্তর পেরিয়ে তা স্বীকরণের পর্যায়ে পৌছয়। এই বয়সের লেখা 'আলোচনা' ও 'সমালোচনা' গ্রন্থের কয়েকটি প্রবন্ধ তার সাক্ষী হয়ে রয়েছে। 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী' ও 'সোনার তরী'র কয়েকটি কবিতাও রবীন্দ্রমানসে বৈষ্ণবতার স্বরূপ নির্ণয়ের পক্ষে অত্যাবশ্যক। 'আলোচনা' গ্রন্থে 'সৌন্দর্য ও প্রেম' [ভারতী, আষাঢ় ১২৯১] আর 'বৈষ্ণব কবির গান' [নবজীবন, কার্তিক ১২৯১] এবং 'সমালোচনা' গ্রন্থের 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি' [ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৮], 'বসন্ত রায়' [শ্রাবণ ১২৮৯] এবং 'বাউলের গান' [বৈশাখ ১২৯০]—এই পাঁচটি প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের একুশ বৎসর থেকে চব্বিশ বৎসর বয়সের বৈষ্ণবতার দিগ্‌দর্শনী।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদগুলি কবির ষোলো বৎসর থেকে চব্বিশ বৎসর বয়সের মধ্যে লেখা। অর্থাৎ অনুকরণের যুগ পেরিয়ে স্বীকরণের যুগকেও পদাবলীর রচনাকাল স্পর্শ করেছে। সুতরাং এই পদগুলি নিতান্তই 'মেকি' এবং 'জালিয়াতি'-প্রসূত,—এ মন্তব্য ইতিহাসের সমর্থন পাবে না। রচনাবলী সংস্করণের 'সূচনা'য় রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "ভানুসিংহের পদাবলী ছোট বয়স থেকে অপেক্ষাকৃত বড় বয়স পর্যন্ত দীর্ঘকালের সূত্রে গাঁথা। তাদের মধ্যে ভালমন্দ সমান দরের নয়।"

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব-পদাবলীর অনুকরণে প্রবৃত্ত হলেন কেন, এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাবে শেলি সম্পর্কে অধ্যাপক কার্লোস বেকারের একটি মন্তব্যে। অধ্যাপক বেকার বলেছেন:

"Shelley displayed a singular capacity for projecting himself imaginatively into the literature he admired, and his reading became for him a part of his actual experience, like any other emotional or intellectual adventure which arose from his contact with flesh-and-blood people."[৩৪]

এই অভিযোজন ব্যাপারে রবীন্দ্রমানস শেলিমানসেরই সহোদর। ১২৯০ সালের বৈশাখ সংখ্যার ভারতীতে প্রকাশিত 'বাউলের গান' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে যদি আমরা আমাদের প্রাণের একটা মিল খুঁজিয়া পাই তবে আমাদের কি বিস্ময়, কি আনন্দ! আনন্দ কেন হয়? তৎক্ষণাৎ সহসা মুহূর্তের জন্য বিদ্যুতালোকে আমাদের হৃদয়ের অতি বিপুল স্থায়ী প্রতিষ্ঠা-ভূমি দেখিতে পাই বলিয়া। আমরা দেখিতে পাই মগ্নতরী হতভাগ্যের ন্যায় আমাদের এই হৃদয় ক্ষণস্থায়ী যুগ-বিশেষের অভ্যাস ও শিক্ষা নামক ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড আশ্রয় করিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে না, অসীম মানব-হৃদয়ের মধ্যে ইহার নীড় প্রতিষ্ঠিত। ইহা দেখিলে আমাদের হৃদয়ের উপরে আমাদের বিশ্বাস জন্মে। আমরা তখন যুগের সহিত যুগান্তরের গ্রন্থনসূত্র দেখিতে পাই। আমার এই হৃদয়ের পানীয় এ কি আমার নিজেরই হৃদয়স্থিত সংকীর্ণ কূপের পঙ্ক হইতে উত্থিত, না অভ্রভেদী মানব-হৃদয়ের গঙ্গোত্রী-শিখর নিঃসৃত, সুদীর্ঘ অতীত কালের শ্যামল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত বিশ্বসাধারণের সেবনীয় স্রোতস্বিনীর জল! যদি কোন সুযোগে জানিতে পারি শেষোক্তটিই সত্য, তবে হৃদয় কি প্রসন্ন হয়! প্রাচীন কবিতার মধ্যে আমাদিগের হৃদয়ের ঐক্য দেখিতে পাইলে আমাদের হৃদয় সেই প্রসন্নতা লাভ করে।"[৩৫]

বাইশ বৎসর বয়সের এই চিন্তা ষোল বৎসর বয়সে লেখা ভানুসিংহের পদ-রচনায় সচেতন ভাবে ক্রিয়াশীল ছিল এ কথা আমরা নিশ্চয়ই বলতে চাই না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এর পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ 'বনফুলে'র প্রেম-নায়িকা ষোড়শী কমলাকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কিশোরমানসে রোমান্টিক স্বপ্নকামনা রহঃসখী কাদম্বরীর সান্নিধ্যে ও সাহচর্যে নিত্যবিলসিত হয়ে রয়েছে। 'যে ভাবের উদয়ে পরিচিত গৃহকে প্রবাস বোধ হয়' সেই রোমান্টিক ভাবকল্পনায় কবিকিশোরের দৃষ্টিতে জোড়াসাঁকোর প্রাসাদমালা হয়েছে বৈষ্ণবের বৃন্দাবন। কিশোরী ভ্রাতৃবধূর পতিপ্রেমই রাধাকৃষ্ণের চিরপুরাতন বিরহমিলন লীলার প্রতীক আশ্রয় করে ভানুসিংহের পদাবলীর জন্ম দিয়েছে। একটি বিশেষ পাত্রেই চিরন্তন প্রেমের রস আস্বাদনীয় হয়ে উঠেছে। কবি-কিশোর অনুভব করতে পেরেছেন, আমাদের এই হৃদয় ক্ষণস্থায়ী যুগবিশেষের অভ্যাস ও শিক্ষা নামক ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড আশ্রয় করেই ভেসে বেড়াচ্ছে না,

অসীম মানব-হৃদয়ের মধ্যে তার নীড় প্রতিষ্ঠিত। আমাদের হৃদয়ের পানীয় আমাদের নিজেরই হৃদয়স্থিত সংকীর্ণ কূপের পঙ্ক থেকে উত্থিত নয়, তা অভ্রভেদী মানবহৃদয়ের গঙ্গোত্রীশিখর নিঃসৃত, সুদীর্ঘ অতীত কালের শ্যামল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিশ্ব-সাধারণের সেবনীয় স্রোতস্বিনীর জল।

বিশেষ জীবনের মধ্যে এই বিশ্বজনীন মানবসত্যকে প্রত্যক্ষ করার দৃষ্টিই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব দৃষ্টি। পরবর্তী কালে এই দৃষ্টিকেই তিনি বলেছেন, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা। সহজিয়া বৈষ্ণবের ভাষায় এরই নাম রূপের মধ্যে স্বরূপের আরোপ করা। আমরা অন্যত্র রবীন্দ্রনাথকে বলেছি অদীক্ষিত বৈষ্ণব। তাঁর চেতনায় বৈষ্ণব প্রেমলীলা নানা স্তরে বিলসিত। তার মধ্যে সহজিয়া প্রেমের প্রভাবও যেমন আছে, তেমনি আছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের 'রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।' ১২৮৮ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে তিনি চণ্ডীদাসের কামগন্ধহীন রজকিনী-প্রেমকেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা বলেছেন। রজকিনী-প্রণয়িনী সম্পর্কে চণ্ডীদাসের উক্তি [রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ কামগন্ধ নাহি তায়] উদ্ধৃত করে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "দিবস রজনী পরবশে থাকিব, অথচ প্রেমকে স্বপ্নের মধ্যে রাখিয়া দিব। একত্রে থাকিব অথচ তাহার দেহ স্পর্শ করিব না।—অর্থাৎ এ প্রেম বাহ্য-জগতের দর্শন-স্পর্শনের প্রেম নহে; ইহা স্বপ্নের ধন, স্বপ্নের মধ্যে আবৃত থাকে, জাগ্রত জগতের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। ইহা শুদ্ধমাত্র প্রেম, আর কিছুই নহে।"[৩৬]

শুধু চণ্ডীদাস সম্পর্কেই যে রবীন্দ্রনাথ এই দৃষ্টি পোষণ করতেন তা নয়, বৈষ্ণব কবি-মাত্রেই একটি বিশেষ রূপের মধ্যেই যে 'কিশোরী-স্বরূপে' সন্ধান পেয়েছিলেন—এই প্রতীতিসম্মত জিজ্ঞাসাই 'সোনার তরী'র "বৈষ্ণব কবিতা"য় ভাষা পেয়েছে। কবি বলছেন:

> সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণবকবি,
> কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
> কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
> বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার বয়ান,
> রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে।

* *

এত প্রেমকথা—
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে!

ভানুসিংহ সম্পর্কেও এই জিজ্ঞাসারই উত্তর খুঁজতে হবে—'কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি?' 'কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান বিরহ-তাপিত?' বলাই বাহুল্য, গৃহবৃন্দাবনে নিজের কৈশোরসঙ্গিনী কাদম্বরী দেবীর প্রেমমূর্তিখানিই ভানুসিংহের চিত্তে রাধামূর্তিরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। চৈতন্যোত্তর গৌড়ীয় বৈষ্ণবকবির মঞ্জরী-ভাবের অনুরূপ দৃষ্টি নিয়ে তিনি প্রিয়সখীর সেই প্রেমলীলাকে আস্বাদন করেছেন। সেই আস্বাদনেরই আনন্দ ভানুসিংহের পদাবলী আকারে উৎসারিত হয়েছে। ভানুসিংহকে বিদ্যাপতি দিয়েছেন ভাষা, চণ্ডীদাস দিয়েছেন রূপের মধ্যে স্বরূপ আরোপের দৃষ্টি, গোবিন্দদাস-জ্ঞানদাস দিয়েছেন মঞ্জরী-ভাবে প্রেমাস্বাদনের ইঙ্গিত। প্রথমে হয়তো খেলাচ্ছলেই এর সূত্রপাত হয়েছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে খেলার সাথীই লীলাসঙ্গিনীর আসনে অধিষ্ঠিত হলেন।

১৩

বৈষ্ণব পদাবলীর বৈশিষ্ট্য এই যে, ভণিতার মধ্য দিয়েই পদকর্তার ভাবসাধনার স্বরূপটি চিনতে পারা যায়। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে ভানুমানসের সন্ধানে প্রবৃত্ত হলে ভণিতার দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। বিদ্যাপতি মুখ্যত কৃষ্ণের দৃষ্টি দিয়ে রাধার প্রেমকে আস্বাদন করেছেন। চণ্ডীদাসের দৃষ্টি রাধার মন নিয়ে কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করা। চৈতন্যোত্তর গৌড়ীয় বৈষ্ণবের দৃষ্টি সখীপ্রেম হৃদয়ে জাগিয়ে যুগলরস আস্বাদন করা। নরোত্তমের প্রার্থনায় সেই অভিলাষটিই অভিব্যক্ত হয়েছে। 'দুঁহু-অঙ্গ পরশিব, দুঁহু-অঙ্গ নিরখিব, সেবন করিব দোঁহাকার।' ভানুসিংহ তাঁর প্রিয়সখীর বিরহ-মিলনের গান গাইতে গিয়ে রাধামাধবেরই জয়ধ্বনি করেছেন—

জয় জয় মাধব, জয় জয় রাধা,
চরণে প্রণমে ভানু॥ ১০॥

ভানুসিংহ স্লেটে প্রথম যে পদটি লিখেছিলেন তার ভণিতায় আছে,

শ্যামকো পদারবিন্দ
ভানুসিংহ বন্দিছে ॥ ৮ ॥

রাধাকৃষ্ণের মিলনে ভানুর অন্তর আনন্দে পুলকিত হয়ে ওঠে। ষষ্ঠপদের ভণিতায় আছে—

ধন্য ধন্য রে ভানু গাহিছে
প্রেমক নাহিক ওর।
হরখে পুলকিত জগৎ-চরাচর
দুঁহুক প্রেমরস ভোর ॥ ৬ ॥

একাদশ পদে বসন্ত-রজনীর মিলনোৎসবে ভানু আনন্দিত—

হাসে শশি ঢলঢল
ভানু মরি যায়।

রাধামাধবের মিলনে যেমন ভানু আনন্দিত, তেমনি বিরহের দিনে বিরহিণী রাধার জন্যে তাঁর সমবেদনা ও সান্ত্বনাও সমপ্রাণতায় অনবদ্য। দ্বিতীয় পদে বিরহিণী রাধাকে ভানু বলেছেন, তোমার কুসুমমালিকা তুলে রাখ। কেন না, কুঞ্জে কুঞ্জে অন্বেষণ করেও আমি কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাই নি। তাই পদান্তে অশ্রুবারি বিসর্জন করে ভানু বলছেন,

কুঞ্জপানে হেরিয়া,
অশ্রুবারি ডারিয়া
ভানু গায় শূন্য-কুঞ্জ শ্যামচন্দ্র নাহি রে!

বিরহিণী রাধা দুঃসহ বিরহযন্ত্রণায় বারবার মৃত্যুকামনা করছেন। তৃতীয় পদে তাঁর মর্মবিদারী বেদনা ভাষা পেয়েছে,—আমি হলাহল পান করে মৃত্যু বরণ করব। ভানু তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বলছেন,

ঐস বৃথা ভয় না কর বালা,
ভানু নিবেদয় চরণে,
সুজনক পীরিতি নৌতুন নিতি নিতি,
নহি টুটে জীবন-মরণে।

শুধু সান্ত্বনা আর প্রবোধ দিয়েই ভানু চুপ করে থাকেননি। কৃষ্ণের পক্ষে ওকালতিও করেছেন। ১৪-সংখ্যক কবিতায় ঘনদুর্যোগের মধ্যে অভিসারক

কৃষ্ণের প্রেম বিশ্লেষণ করে বলছেন, "প্রেমসিন্ধু মম কালা।" ১৭-সংখ্যক পদে বলছেন, অয়ি বিরহকাতরা, তুমি মুগ্ধা বলেই আমার শ্যামের স্নেহ বুঝেও বুঝলে না।

রাধাশ্যামের বিচ্ছেদের দিনে ভানু প্রাণপণে চেষ্টা করছেন যাতে বিচ্ছেদের অবসান ঘটে। চতুর্থ পদে মথুরাগত কৃষ্ণকে সম্বোধন করে ভানু বলছেন, 'শ্যাম রে নিপট কঠিন মন তোর।' পদের শেষে বলছেন, রাধা বিরহে ব্যাকুল হয়েছেন, তুমি শীঘ্র আমার সঙ্গে চলে এসো। নবম পদে বিরহ-বিষণ্ণ মিলন-পিপাসিত রাধা যে প্রেমের অমৃতরসপানের জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন সেকথাই ভানু জানাচ্ছেন কৃষ্ণকে। প্রবাস থেকে কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তন-সম্ভাবনায় ভানুর আনন্দ উচ্ছলিত হয়েছে পঞ্চম পদে। তৃষিত-নয়ন ভানু কৃষ্ণের আগমন পথের দিকে তাকিয়ে বলছেন, 'মৃদুলগমন শ্যাম আওয়ে, মৃদুল গান গাহিয়া।' কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে রাধার উদ্দেশে তাঁর উপদেশ, কুঞ্জমিলনের জন্যে সত্বর যাত্রা কর।—

চলহ তুরিত গতি শ্যাম চকিত অতি,
ধরহ সখীজন হাত,
নীদ-মগন মহী, ভয় ডর কছু নহি,
ভানু চলে তব সাথ ॥ ৭ ॥

ভানুর রাধার দুটি রূপ—অভিমানিনী ও আদরিণী। অভিমানিনী রাধার মান-দশার অবসানে ভানু বলছেন,

মিটল মান অব—ভানু হাসতহি
হেরই পীরিত-লীলা।
কভু অভিমানিনী আদরিণী কভু
পীরিতি-সাগর বালা ॥ ১৫ ॥

আদরিণী রাধার কৃষ্ণমিলনের লগ্ন স্থায়ী হোক্—এই ভানুসিংহের কামনা। কিন্তু মিলনের রাত বড়ো তাড়াতাড়ি শেষ হয়। নলিনী-মিলন-অভিলাষী প্রাতঃসূর্য পূবের আকাশে উদিত হয়। নিষ্ঠুর বুঝতে পারে না তার ত্বরান্বিত আবির্ভাব কতো প্রেমিক-প্রেমিকার হতাশার কারণ হয়ে ওঠে—

ভানু কহত অব—"রবি অতি নিষ্ঠুর,
নলিন-মিলন অভিলাষে

কত নরনারীক মিলন টুটাওত,
ডারত বিরহ হুতাশে ॥ ১২ ॥

এই সমস্ত পদের ভণিতি-ভাষণ বিশ্লেষণ করে কবি-কিশোরের রহঃসখীই যে তাঁর মানসরাধা—এই সিদ্ধান্ত প্রত্যয়সিদ্ধ হয়ে ওঠে। ষোড়শ পদে বিরহিণী রাধার সমব্যথী ভানুসিংহ তাঁকে "ভাই" বলে সম্বোধন করছেন—

বরখি আঁখিজল ভানু কহে—অতি
দুখের জীবন ভাই।
হাসিবার তর সঙ্গ মিলে বহু
কাঁদিবার কো নাই ॥ ১৬ ॥

এই ভাই-সম্বোধনের দ্বারা ভানুসিংহও তাঁর কল্পনালোক থেকে নেমে এসেছেন বাস্তব মাটির কোলে। যৌবনলগ্নে কবিজায়ার প্রতি কবির পত্রসম্বোধন ছিল প্রথমে 'ভাই ছোটবৌ', সবশেষে 'ভাই ছুটি'[৩৭]। আদরের এই অন্তরঙ্গ সম্বোধনের মধ্যে 'ভাই' কথাটি নূতন ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। ভানুসিংহের পদে এর অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব সম্বোধিতা পাত্রীটির বাস্তবতা সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ। বস্তুত, ভানুসিংহের অভিমানিনী রাধা অক্ষয় চৌধুরীর 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী'কে স্মরণ করিয়ে দেয়।[৩৮] উভয় ক্ষেত্রেই দয়িত-প্রেমবঞ্চিতা নারীর হৃদয়বেদনা কবিকণ্ঠের আলম্বন।

১৪

ভানুসিংহের পদাবলীতে পূর্বরাগ নেই। আছে মান, মানান্ত মিলন, বংশীধ্বনি, অভিসার, মাথুর ও বিরহ-বেদনা-জনিত মৃত্যুদশা। পূর্বসংগতা নায়িকার অপ্রাপ্তি-জনিত মর্মপীড়াই ভানুসিংহের পদাবলীর কুহরে কুহরে ঝংকৃত। সম্ভোগ নয়, বিপ্রলম্ভের সুরই এই কাব্যের প্রধান সুর।

বসন্ত-সমাগমে কাব্যের আরম্ভ। এদিক দিয়ে জয়দেবের গীতগোবিন্দের সঙ্গে ভানুসিংহের পদাবলীর সাদৃশ্য আছে। গীতগোবিন্দের আদিতেও আছে বৃন্দাবনে বসন্ত-সমাগম। 'ললিতলবঙ্গ-লতা-পরিশীলন-কোমলমলয়-সমীরে'। সরস বসন্তে হরি-বিহার দিয়েই গীতগোবিন্দের রহঃকেলির সূত্রপাত। ভানু-সিংহের পদে দেখা দিয়েছে রোদনভরা বসন্ত। নিখিল জগৎ যখন হর্ষোৎফুল্ল

হয়ে রভস-রস-গান গাইছে তখন ভানুসিংহের দুঃখিনী রাধা বিলাপ করে বলছেন, এমন মধুমিলনের দিনে আমার হৃদয়বসন্ত—আমার প্রিয়—আমার প্রিয়তম কোথায় গেলেন? দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদে বিরহিণী রাধার আর্তি ফুটে উঠেছে। চতুর্থে ভানু স্বয়ং দূত হয়ে মথুরায় গিয়ে কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করছেন। পঞ্চম পদে আছে ব্রজধামে কৃষ্ণের পুনরাগমন-বার্তা। ষষ্ঠে প্রত্যাগত দয়িতের সঙ্গে বিরহিণীর পুনর্মিলন। সপ্তমে কৃষ্ণের বাঁশি বাজছে। অষ্টমে রাধার অভিসার। নবম ও দশম পদে বংশীরবে কৃষ্ণের পুনরাহ্বান। একাদশে মিলন। দ্বাদশে কৃষ্ণ স্বপ্নে রাধার মুখ দেখছেন। ত্রয়োদশে যেন পদাবলীর নবপর্যায় সূচিত হল। রাধার বর্ষাভিসারের অভিলাষ ওতে বর্ণিত হয়েছে। চতুর্দশে কৃষ্ণের অভিসার। পঞ্চদশে রাধার মান। ষোড়শে ভবন্-মাথুরের বর্ণনা। সপ্তদশে মথুরা-প্রত্যাগতা দূতীর কাছে রাধার আক্ষেপ। অষ্টাদশে বিরহিণীর রসোদ্গার। ঊনবিংশতিতে দুঃসহ বিরহে রাধার মৃত্যুকামনা। বিংশতিতে চির-অতৃপ্ত জিজ্ঞাসা 'কো তুঁহু বোলবি মোয়।'

এই পদবিংশতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে প্রিয়-বিরহিতা নারীর বিচ্ছেদ-বেদনা পদগুলির প্রধান আলম্বন। ভানুসিংহের অভিমানিনী রাধা প্রিয়তমের প্রেমবঞ্চিত হয়ে মৃত্যুকামনা করছেন। তৃতীয় পদেই বিরহিণী রাধা বলছেন, 'মরিব হলাহল ভখি রে।' দশম পদে আছে,

সাধ যায় বঁধু, যমুনা-বারিম
ডারিব দগধ-পরান।

রাধার মৃত্যুকামনার শ্রেষ্ঠ পদ হল ঊনবিংশ পদটি। 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।' শুধু সমানই নন, বিরহিণীর কাছে মৃত্যু প্রিয়তমের চেয়েও প্রিয়তর বলে মনে হচ্ছে। কৃষ্ণ তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন, তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ করে দিয়েছেন। কিন্তু মৃত্যু তা কখনও করবে না। তাই মৃত্যুর প্রেম তাঁর দৃষ্টিতে অতুলনীয় বলে মনে হচ্ছে—

তুঁহু নহি বিছুরবি, তুঁহু নহি ছোড়বি,
রাধা-হৃদয় তু কবহুঁ ন তোড়বি,
হিয় হিয় রাখবি অনুদিন অনুখন
অতুলন তোঁহার লেহ।

রাধার এই বার-বার মৃত্যুকামনা কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিতে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। ভানুসিংহ অবশ্য এজন্যে রাধাকে তিরস্কার করছেন। ভণিতায় তাঁর ভর্ৎসনা-বাণী উচ্চারিত হয়েছে—

ভানুসিংহ কহে—ছিয়ে ছিয়ে রাধা
চঞ্চল হৃদয় তোহারি ;
মাধব পহু মম, পিয় স মরণসেঁ
অব তুঁহু দেখ বিচারি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-চেতনার নিদর্শন হিসাবে 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান' পদটির কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু ওটি রবীন্দ্রনাথের কথা নয়, ওটি ভানুসিংহের বিরহিণী রাধার বিরহের দশম দশার আর্তনাদ। রবীন্দ্রনাথের কথা হল 'মাধব পহু মম, পিয় স মরণসেঁ !'

১৫

ভানুসিংহের পদাবলী যে মহাজন-পদাবলীর জালিয়াতি-মাত্রই নয়, তার প্রমাণ ভানুসিংহের বাগ্‌ভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের সমকালীন ও পরবর্তী কাব্যে অনুসৃত ও পুনরাবৃত্ত হয়েছে। শুধু বাগ্‌ভঙ্গিই নয়, গীতিকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিভাষা আবিষ্কার করলেন ভানুসিংহের পদাবলীতে। ব্রজবুলির ধ্বনিপ্রধান ছন্দঃস্পন্দ এবং বাক্‌সংগীতের অনুশীলন করতে করতে রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেলেন বাংলা ভাষার গীতিধর্মকে। 'সন্ধ্যাসংগীত' ও 'প্রভাতসংগীতে' যা সম্ভব হয় নি, 'ছবি ও গান' এবং 'কড়ি ও কোমলে' যার আভাসমাত্র আছে, তাই কবির লেখনীমুখে মূর্ত হয়ে উঠল ভানুসিংহের কবিতায়। রবীন্দ্রনাথ-বিরচিত সমকালীন বাংলা কবিতার সঙ্গে ভানুসিংহের গীতি-ঝংকৃত পদগুলির ভাষা ছন্দ ও মিলের তুলনা করলেই বুঝতে পারা যাবে কাহিনী-কাব্য বনফুল-কবিকাহিনীর যুগ পেরিয়ে 'মানসী'-'সোনার তরী'তে উত্তরণের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ভানুসিহের পদাবলীতেই অভ্রান্তভাবে ভাষার ছন্দসংগীতের সন্ধান পেলেন। ব্রজবুলি ভাষার মধ্যে যা পাওয়া গেল, পরবর্তী কালে তাকেই তিনি বাংলা ভাষায় সঞ্চারিত করে দিলেন। রবীন্দ্রনাথের হাতে

বাংলা গীতিকাব্যের ভাষা যে গীতাত্মকতা লাভ করল তারই নান্দীপাঠ হল ভানুসিংহের কবিতায়।

বাগ্‌ভঙ্গির দিক দিয়ে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী রবীন্দ্রকাব্যলোকে কী চিহ্ন রেখে গেছে তার একটু আলোচনা, নিতান্তই সূত্রাকারে, এখানে করা যেতে পারে। ভানুসিংহের পদে সজনী ও সখী-সম্বোধন স্বাভাবিক-ভাবেই এসেছে। 'শুন শুন সজনী হৃদয় প্রাণ মম' (১), 'কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখি শ্যামচন্দ্র নাহি রে' (২), 'চল সখি গৃহে চল, মুঞ্চ নয়ন-জল, চল সখি চল গৃহকাজে' (৩), 'বিরহ সাথি করি সজনী রাধা রজনী করতহি ভোর' (৪), 'সজনি সজনি রাধিকা লো' (৫), 'শুন সখি বাজত বাঁশি' (৭), 'বিসরি ত্রাস লোকলাজে সজনি, আও আও লো', (৮), 'সতিমির রজনী, সচকিত সজনী, শূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য' (৯), 'আজু সখি মুহু মুহু' (১১); 'সজনি গো, শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা' (১৩), 'সখি লো, সখি লো. নিকরুণ মাধব মথুরাপুর যব যায়' (১৬), 'বারবার সখি বারণ করনু' (১৭), 'হম যব না রব সজনী' (১৮)।

এই সজনী কিংবা সখী-সম্বোধনে রবীন্দ্র-প্রেমসংগীত যে বিশিষ্টতা পেয়েছে এবার তার সন্ধান করা যাক গীতবিতানে। প্রেমপর্যায়ের কবিতাগুলি থেকেই উদাহরণ সংগ্রহ করা গেল। নির্দেশসূত্রে প্রথমে গীতবিতানের গানের সংখ্যা, পরে পৃষ্ঠা-সংখ্যা দেওয়া হল—

ভালোবেসে, সখী, নিভৃতে যতনে। ৩৪।২৮৩

সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে। ৬১।২৯৬

তোমার গোপন কথাটি, সখী, রেখো না মনে। ৬৩।২৯৭

হৃদয়ের এ কূল, ও কূল,

দু কূল ভেসে যায়, হায় সজনি, ৮২।৩০৫

বাজিবে, সখী, বাঁশি বাজিবে। ১১৫।৩১৬।

মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখি—

সখি, জাগ' জাগ'। ১৩৮।৩২৪

সখী, ওই বুঝি বাঁশি বাজে—

বনমাঝে কি মনোমাঝে। ১৪৪।৩৩৭

সখী, আমারি দুয়ারে কেন আসিল

নিশিভোরে যোগী ভিখারি। ১৫০।৩৩০
সখী, দেখে যা এবার এল সময়। ১৯৯।৩৫০
বলো সখী, বলো তারি নাম
আমার কানে কানে। ২১৬।৩৫৭
আজি যে রজনী যায়…
এ বেশভূষণ লহো সখী, লহো,—
এ কুসুম মালা হয়েছে অসহ। ২৪৭।৩৭০
সখী, আঁধারে একেলা ঘরে
মন মানে না। ২৮১।৩৮৩
ওগো সখী, দেখি দেখি, মন কোথা আছে। ৩১১।৩৯৫
সখী, বহে গেল বেলা, শুধু হাসিখেলা
এ কি আর ভালো লাগে। ৩১২।৩৯৫
ওলো রেখে দে সখী, রেখে দে। ৩১৩।২৯৫।
নীরবে থাকিস সখী, ও তুই নীরবে থাকিস। ৩৩৮।৪০৫
এবার সখী, সোনার মৃগ দেয় বুঝি দেয় ধরা। ৩৪৮।৪০৮
কী হল আমার! বুঝি বা সখী,
হৃদয় আমার হারিয়েছি। ৩৪৯।৪০৮
সকল হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছি যারে,
সে কী ফিরাতে পারে সখী। ৩৫১।৪০৯
তারে কেমনে ধরিবে, সখী,
যদি ধরা দিলে। ৩৫২।৪০৯
বলো দেখি, সখী লো। ৩৭৬।৪১৭
ওকে বল্, সখী, বল্—কেন মিছে করে ছল। ৩৮০।৪১৮
সখী, সে গেল কোথায়,
তারে ডেকে নিয়ে আয়। ৩৮২।৪১৯।

খুঁজলে আরো পাওয়া যাবে। কিন্তু এখানেই থামা যাক্। এসব গানে সখী-সম্ভাষণ ভানুসিংহেরই অনুস্মৃতি। রবীন্দ্রনাথের প্রেমসংগীতে 'বাঁশি'ও একটি উল্লেখযোগ্য প্রতীক-রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। গীতবিতানের প্রেম-পর্যায়ের গানগুলি আগের মতো অনুসরণ করা যাক—

বাঁশি আমি বাজাই নি কি পথের ধারে ধারে। ২৪।২৭৯
ওগো শোনো কে বাজায়। ৫৬।২৯৫
মরি লো মরি, আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে। ৫৯।২৯৬
বাজিবে, সখী, বাঁশি বাজিবে। ১১৫।৩১৬
সখী, ওই বুঝি বাঁশি বাজে—
বনমাঝে কি মনোমাঝে। ১৪৪।৩২৬
ক্লান্ত বাঁশির শেষ রাগিণী। ১৭৫।৩৪০
শুভ মিলনলগনে বাজুক বাঁশি। ২০৯।৩৫৪
ওগো কিশোর, আজি তোমার দ্বারে
পরান মম জাগে। ২২০।৩৫৮
আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে। ২৪৭।৩৭০
সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায়। ২৪৯।৩৭১
আমার একটি কথা বাঁশি জানে,
বাঁশিই জানে। ২৯৪।৩৮৮
ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে। ৩০০।৩৯০
ওগো এত প্রেম-আশা। ৩০২।৩৯১
বাঁশরি বাজাতে চাহি,
বাঁশরি বাজিল কই। ৩০৫।৩৯২
কোথা বাইরে দূরে। ৩২৭।৪০১
আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি। ৩৩১।৪০২
এখনো তারে চোখে দেখি নি,
শুধু বাঁশি শুনেছি। ৩৬৭।৪১৫
বনে এমন ফুল ফুটেছে। ৩৭২।৪১৭

এই তালিকা সম্পূর্ণ হয়েছে—একথা কিছুতেই বলা যাবে না। বাঁশির ডাক রবীন্দ্র-সংগীত-জগতে বারবার শোনা গেছে। চব্বিশ বৎসর বয়সে, নবজীবন পত্রিকার ১২৯১ সালের কার্তিক মাসে প্রকাশিত 'বৈষ্ণব কবির গান' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'সৌন্দর্য-স্বরূপের হাতে সমস্ত জগৎই একটি বাঁশি।'[৩৯] কিন্তু শুধু বাঁশিই নয়, সমস্ত বৈষ্ণব পটভূমিটিই রবীন্দ্রনাথের একাধিক গানে ও

কবিতায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। গীতবিতানের প্রেম-পর্যায়ের ৫৬-সংখ্যক গানটি এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য—

ওগো শোনো কে বাজায়।
বনফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায়॥
অধর ছুঁয়ে বাঁশিখানি চুরি করে হাসিখানি—
বঁধুর হাসি মধুর গানে প্রাণের পানে ভেসে যায়।
কুঞ্জবনের ভ্রমর বুঝি বাঁশির মাঝে গুঞ্জরে,
বকুলগুলি আকুল হয়ে বাঁশির গানে মুঞ্জরে!
যমুনারই কলতান কানে আসে, কাঁদে প্রাণ—
আকাশে ওই মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায়॥

২৪৭-সংখ্যক গানে বৈষ্ণব ভাবটি যেন পূর্ণ রূপ নিয়ে ধরা পড়েছে—

আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে॥
কেন নয়নের জল ঝরিছে বিফল নয়নে॥
এ বেশভূষণ লহ সখী, লহো,
এ কুসুমমালা হয়েছে অসহ,—
এমন যামিনী কাটিল বিরহ-শয়নে॥
আমি বৃথা অভিসারে এ যমুনাপারে এসেছি,
বহি বৃথা মনো-আশা এত ভালোবাসা বেসেছি।
শেষে নিশিশেষে বদন মলিন,
ক্লান্ত চরণ, মন উদাসীন,
ফিরিয়া চলেছি কোন্ সুখহীন ভবনে॥

এই গানটির বৈষ্ণবতা আলোর মতোই স্বয়ংপ্রকাশ। ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের কোনও অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু শুধু বাঁশি ও সখীই নয়, রবীন্দ্রনাথ যে ভানুসিংহের পদাবলীতেই প্রথম তাঁর গীতিকাব্যের কবিভাষার সন্ধান পেয়েছিলেন তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে সংগ্রহ করা যেতে পারে—

প্রথম পদেই আছে, 'কঁহি রে সো প্রিয়, কঁহি সো প্রিয়তম'। এই বাগ্-ভঙ্গির সঙ্গে 'বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিল' গানটির বাগ্‌ভঙ্গির তুলনা করলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে।—

যদি ও মুখ মনোরম শ্রবণে রাখি মম
নীরবে অতি ধীরে ভ্রমরগীতি সম
দু কথা বল শুধু 'প্রিয়' বা 'প্রিয়তম'
তাহে তো কণা মধু ফুরাবে না।

একাদশ পদে 'মধু অনল' কথাটি রবীন্দ্র-বাণীশিল্পেরই একটি চূড়ান্ত উদাহরণ—

অলকে ফুল কাঁপয়ি
কপোল পড়ে ঝাঁপয়ি,
মধু অনলে তাপয়ি
খসয়ি পড়ু পায়!

দ্বাদশ পদে ঘুমন্ত কৃষ্ণ রাধার স্বপ্ন দেখছেন—

নীদ-মেঘপর স্বপন-বিজলি সম
রাধা বিলসত হাসি।

নিদ্রার সঙ্গে মেঘের এবং স্বপ্নের সঙ্গে বিদ্যুতের তুলনা কবিকিশোরের মৌলিকতারই পরিচয় বহন করে এনেছে। নবজলধরকান্তি কৃষ্ণের বক্ষে বিদ্যুল্লতা রাধার ব্যঞ্জনাও ওতে আভাসিত। ভানুসিংহের প্রথম প্রকাশিত পদ হল 'শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা।' 'ভারতী'তে প্রকাশের সময় প্রথম পংক্তির বাণীরূপ অন্যতর ছিল। এই পদটি ব্রজবুলির ধ্বনি-ঝংকারে অনবদ্য। পদের ভণিতাংশটিও স্মরণীয়—

গহন রয়নমে ন যাও বালা
নওল কিশোরক পাশ।
গরজে ঘন ঘন, বহু ডর খাওব
কহে ভানু তব দাস।

ঘন দুর্যোগের কথা স্মরণ করে অভিসারিকার উদ্দেশে এই নিষেধবাণী রবীন্দ্রনাথের একটি অপূর্ব প্রেম-সংগীতে পুনরাবৃত্ত হয়েছে—

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে॥

১৮-সংখ্যক পদে রাধা বলছেন 'হম যব না রব সজনী।' এই বাগ্‌ভঙ্গিটিও রবীন্দ্রনাথের একটি গানে ধরা দিয়েছে—

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে
বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে,
চুকিয়ে দেব বেচাকেনা,
মিটিয়ে দেব লেনাদেনা,
বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে।

*   *   *

তখন এমনি করেই বাজবে বাঁশি এই নাটে,
কাটবে গো দিন আজো যেমন দিন কাটে,
ঘাটে ঘাটে খেয়ার তরী
এমনি সেদিন উঠবে ভরি—
চরবে গোরু খেলবে রাখাল ওই মাঠে।

'কো তুঁহু বোলবি মোয়' শীর্ষক বিংশ-সংখ্যক পদে রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ভাষার বাক্‌সংগীত যেন জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠেছে। এখানে ওই পদের শুধু পঞ্চম স্তবকটি উদ্ধার করা যাক্—

গোপবধূজন বিকশিত-যৌবন,
পুলকিত যমুনা, মুকুলিত উপবন,
নীল নীর 'পর ধীর সমীরণ,
পলকে প্রাণমন খোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়?

বলাই বাহুল্য হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বরের লঘুগুরু মাত্রা বজায় রেখে ভানুসিংহের পদাবলী পাঠ করতে হবে। 'নীল নীর 'পর ধীর সমীরণ',—এই অংশে দীর্ঘ-ঈ-কারের গুরুত্ব অসামান্য। বাণীভঙ্গিটি স্বভাবতই জয়দেবের বিখ্যাত পদ 'ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী'কে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু ভানুসিংহের সূক্ষ্ম চারুতা এখানে যেন জয়দেবের সিদ্ধিকেও অতিক্রম করে গেছে। রবীন্দ্রনাথ যে সুকুমার সুললিত গীতিকাব্যের কবি হবেন তার পূর্বাভাষ বহন করে এনেছেন ভানুসিংহ। তাই ভানুসিংহের পদাবলী রবীন্দ্রকাব্যালোকে অবহেলার যোগ্য নয়।

১৬

ভানুসিংহের পদাবলীর আলোচনার উপসংহারে 'কো তুঁহু বোলবি মোয়' পদটির আলোচনা করেই আমরা প্রসঙ্গান্তরে যাব। ভানুসিংহের শুধু এই পদটিই কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পরে লেখা। অন্যান্য সব পদ মৃত্যুর আগেই লেখা হয়েছে। এই পদটি সাময়িক-পত্রিকায় প্রকাশের পর প্রথমে 'কড়ি ও কোমল' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল। আমরা পূর্বে বলেছি, ভানু-সিংহের দুটি পদ—'আজু সখি মুহু মুহু,' এবং 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান'— 'ছবি ও গানে'র প্রথম ও শেষ কবিতা হিসাবে মুদ্রিত হয়।[৪০] অর্থাৎ এসব পদকে রবীন্দ্রনাথ শুধু কাব্যস্বীকৃতিই দেন নি, নিজের ভাবলোকের সঙ্গে একাত্মীভূত করেও নিয়েছেন। 'কড়ি ও কোমলে'র প্রথম সংস্করণে কবিতাগুলি ভাবানুষঙ্গ অনুসারে গুচ্ছে গুচ্ছে সাজানো ছিল। আমি প্রথম সংস্করণের ১৭৮ পৃষ্ঠা থেকে ১৯১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অংশে সংকলিত গানগুলির দিকে কৌতুহলী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নিম্নে গানগুলির শিরোনামা ও প্রথম পংক্তি সাজিয়ে দেওয়া গেল। 'কড়ি ও কোমলে'র এই অংশের গানগুলি কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পরে কবির বিলাপসংগীত-রূপেই রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা অন্যায় হবে না। ১৭৮ পৃষ্ঠার মাঝখানে চারি পংক্তির একটি চতুষ্ক মুদ্রিত হয়েছে। তার নাম 'বাকি'। পংক্তি-চতুষ্টয় হল—

কুসুমের গিয়েছে সৌরভ,
জীবনের গিয়েছে গৌরব!
এখন যা-কিছু সব ফাঁকি,
ঝরিতে মরিতে শুধু বাকি।

এই বিলাপ কেন ও কি উপলক্ষে কবিকণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে তা অনুধাবন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়। 'বাকি'র পরে আছে সাতটি বিরহ-সংগীত :

পৃষ্ঠা ১৭৯-৮০ বিলাপ।

ঝিঁঝিট ! একতালা।

ওগো এত প্রেম-আশা প্রাণের তিয়াষা
কেমনে আছে সে পাসরি।

পৃষ্ঠা ১৮১ সারাবেলা।

মিশ্র ভৈরবী। আড়াখেমটা।

হেলাফেলা সারাবেলা

এ কী খেলা আপন মনে।

পৃষ্ঠা ১৮২।৮৩ আকাঙ্ক্ষা।

যোগিয়া বিভাস—একতালা।

আজি শরত-তপনে প্রভাত-স্বপনে

কী জানি পরান কী যে চায়।

পৃষ্ঠা ১৮৪।৫ তুমি।

মিশ্র বারোয়া। আড়াখেমটা।

তুমি কোন্ কাননের ফুল

তুমি কোন্ গগনের তারা।

পৃষ্ঠা ১৮৬ ভুল।

কানাড়া। ঝাঁপতাল।

বিদায় করেছ যারে

নয়ন জলে,

পৃষ্ঠা ১৮৮ কো তুঁহু।

[গানের সুরের উল্লেখ নেই]

কো তুঁহু বোলবি মোয়।

পৃষ্ঠা ১৯১ গান।

মিশ্র কালাংড়া। আড়াখেমটা।

ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে।

এই গীতিসপ্তক লোকান্তরিতা কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশে তাঁর ভক্তকবির বিষণ্ণ-হৃদয়ের বিলাপ-সংগীত। 'কো তুঁহু' গানে সম্ভবত তখনো সুর দেওয়া হয় নি। তাই কড়ি ও কোমলের প্রথম সংস্করণে সুরের উল্লেখ নেই। পরে অন্য সূত্রে জানা যাচ্ছে ওটির সুর ইমন-কল্যাণ একতালা। 'কো তুঁহু' পদটিকে 'কড়ি ও কোমলে' এইভাবে বিন্যস্ত করায় পুনরায় প্রমাণিত হল যে, ভানুসিংহের পদগুলি কাদম্বরী দেবীকে সম্মুখে রেখেই রাধাকৃষ্ণের রূপককে আশ্রয় করে বিরচিত হয়েছে।

'কো তুঁহু বোলবি মোয়'-এর বাগ্‌ভঙ্গিটি ভানুসিংহ পেয়েছেন বিদ্যাপতি ও বসন্ত রায়ের কাব্য থেকে। বিদ্যাপতির 'তুঁহু কৈছে মাধব কহ তুঁহু মোয়' পদটিকে ভানুসিংহ অনুসরণ করেছেন। কিন্তু বসন্ত রায়ের পদটিও এই প্রসঙ্গে তাঁর মনে থাকা স্বাভাবিক। বসন্ত রায়ের রাধা বলছেন,

প্রাণনাথ, কেমন করিব আমি ?
তোমা বিনে মন করে উচাটন,
কে জানে কেমন তুমি !

বসন্ত রায় সম্পর্কে ১২৮৯ সালের শ্রাবণে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ রচনা করেন।[৪১] কাজেই পরবর্তী কালে 'কো তুঁহু' পদ রচনার সময় বিদ্যাপতির সঙ্গে বসন্ত রায়কেও ভানুসিংহের মনে পড়বার কথা। কিন্তু এই বাগ্‌ভঙ্গি ভানুসিংহের একটি পদেই শেষ হয়ে যায় নি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানে পরবর্তী কালে বহুবার এ-জাতীয় উক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটবে। তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে সংকলিত হল। এখানেও গীতবিতানের গান ও পৃষ্ঠা-সংখ্যার অনুসরণ করেছি—

আমার দোসর যে জন ওগো তারে
কে জানে। ১৩৪।৩২৩
হায় রে, ওরে যায়না কি জানা। ১৮৬।৩৪৪
আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাসটুকুর মতো। ১৯২।৩৪৭
কে উঠে ডাকি মম বক্ষোনীড়ে থাকি। ২৯৯।৩৯০
ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে। ৩০০।৩৯০

এই গীতিপঞ্চকের তৃতীয়টি 'ছবি ও গানে' রয়েছে। সুতরাং ওটি ভানুসিংহের 'কো তুঁহু'র আগে লেখা। এই প্রসঙ্গে 'গীতিমাল্যে'র 'কে গো অন্তরতর সে'—গানটিকেও মনে পড়বে। একই বাগ্‌ভঙ্গি এই সব কবিতায় অনুসৃত হয়েছে। 'কো তুঁহু' পদটির প্রথম স্তবক এবার উদ্ধার করা যেতে পারে—

কো তুঁহু বোলবি মোয় !
হৃদয়-মাহ মঝু জাগসি অনুখন,
আঁখ উপর তুঁহু রচলহি আসন,
অরুণ নয়ন তব মরম সঙে মম

নিমিখ ন অন্তর হোয়।

কো তুঁহু বোলবি মোয়॥

এই অংশের সঙ্গে বলাকার যুগে কাদম্বরী দেবীর ছবি-দেখে-লেখা কবিতা 'ছবি'র ভাবানুষঙ্গের মিল বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। সেখানে কবি বলছেন,

নয়ন-সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই;
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।

ভানুসিংহের 'আঁখ উপর তুঁহু রচলহি আসন' আর রবীন্দ্রনাথের 'নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই'—একটি আরেকটির প্রতিধ্বনি বলেই মনে হয়। তাই আমরা বলেছি রবীন্দ্র-মানসে কাদম্বরী দেবীর প্রথম মানসী-মূর্তি হল রাধা-মূর্তি।

১৭

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কড়ি ও কোমল'। পূর্বেই বলা হয়েছে কাদম্বরী দেবীর জীবদ্দশায় কবির শেষ কাব্যগ্রন্থ 'ছবি ও গান' প্রকাশিত হয় ১২৯০ সালের ফাল্গুনে। তার দু মাস পরেই কাদম্বরী দেবী লোকান্তরিতা হন। কড়ি ও কোমলের প্রকাশ ১২৯৩ সালের কার্তিকে। আমরা ধরে নিতে পারি ১২৯০ সালের ফাল্গুন-চৈত্র থেকে ১২৯৩ সালের আশ্বিন-কার্তিক পর্যন্ত কালসীমার মধ্যে রচিত কবিতাগুলি 'কড়ি ও কোমলে' সংকলিত হয়েছে। অর্থাৎ 'মৃত্যুশোকে'র প্রথম আড়াই বৎসরের কাব্যফসল 'কড়ি ও কোমল'।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কড়ি ও কোমলে যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে আর একটি প্রবল প্রবর্তনা প্রথম আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব। যাঁরা আমার কাব্য মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা

নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা নানা বাণীতে যার প্রকাশ। কড়ি ও কোমলেই তার প্রথম উদ্ভব।”[৪২]

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। কড়ি ও কোমলে আছে “যৌবনের রসোচ্ছ্বাসে”র সঙ্গে আর একটি “প্রবল প্রবর্তনা”। তা হল “জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব।” কড়ি ও কোমলেই তার “প্রথম উদ্ভব”। কিন্তু এই মৃত্যুর “নিবিড় উপলব্ধি” কবির সারাজীবনের কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা “নানা বাণীতে যার প্রকাশ।”

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আরও দুটি উক্তি স্মরণীয়। ‘বিচিত্র প্রবন্ধ’ গ্রন্থের “মাভৈঃ” প্রবন্ধে কবি বলেছেন, “মৃত্যু একটা কালো কঠিন কষ্টিপাথরের মতো। ইহারই গায়ে কষিয়া সংসারের সমস্ত খাঁটি সোনার পরীক্ষা হইয়া থাকে।”[৪৩]

জীবনস্মৃতিতে ‘মৃত্যুশোক’ অধ্যায়ে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু কবিমানসে কী সুগভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তার আলোচনা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, “জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে-দূরত্বের প্রয়োজন মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা বড় মনোহর।”[৪৪]

কবিমানসীর প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় আমরা বলেছি, “কাদম্বরী দেবীর প্রতি তরুণ রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ানুরাগই তাঁর জীবনের গভীরতম উপলব্ধি এবং কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুই রবীন্দ্র-জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।” রবীন্দ্র-নাথের সাম্প্রতিক জীবনীকার, তাঁর নাতজামাই, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালনির বক্তব্যও আমরা সেই প্রসঙ্গে উদ্ধার করেছি। শ্রীযুক্ত কৃপালনি কাদম্বরীকে বলেছেন তরুণ রবীন্দ্রনাথের “playmate and guardian angel”। কবি-মানসে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল সে-প্রসঙ্গে কৃপালনির বক্তব্য হল, “It did not break him, it made him.”[৪৫]

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুই রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথকে মহাকবি রবীন্দ্রনাথে রূপান্তরিত করেছে। এই মরণের বৃহৎ পটভূমিকাতেই কবি জীবন ও জগতের সত্যরূপকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখার মহাকবি-দৃষ্টি লাভ করলেন। আমরা

প্রথম খণ্ডে "আত্মবিসর্জন" অধ্যায়ে এই কবি-জন্মের নিগূঢ় ইতিহাসের রহস্যোন্মোচনের চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি গানে বলেছেন :

জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে,
বন্ধু হে আমার, রয়েছ দাঁড়ায়ে॥
এ মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে
তোমার মহাসন আলোতে ঢাকা সে,
গভীর কী আশায় নিবিড় পুলকে
তাহার পানে চাই দু বাহু বাড়ায়ে॥
নীরব নিশি তব চরণ নিছায়ে
আঁধার-কেশভার দিয়েছে বিছায়ে।
আজি এ কোন্ গান নিখিল প্লাবিয়া
তোমার বীণা হতে আসিল নাবিয়া!
ভুবন মিলে যায় সুরের রণনে,
গানের বেদনায় যাই যে হারায়ে॥

মৃত্যুর পরে কাদম্বরী দেবী জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে কবির প্রেমচেতনা, সৌন্দর্যচেতনা ও জীবনদেবতাচেতনায় নানা বাণীতে আলম্বন ও উদ্দীপন-বিভাবরূপে বিরাজমানা। কবির সারাজীবনের সেই ধ্যানতন্ময়তা কবি-চেতনায় যে বিচিত্র কাব্যরূপ পরিগ্রহ করেছে আমরা তারই একটি সম্ভাব্য তালিকা এখানে রচনা করলাম। বলাই বাহুল্য, কবির প্রেম ও পূজা পর্যায়ের অসংখ্য গান এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় আমাদের অনুসন্ধান খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ। তবু কবির চব্বিশ থেকে আশি বৎসর বয়স পর্যন্ত যে-নারী তাঁর চেতনার নিভৃত গভীরে চির-বিরহের প্রদীপশিখা জ্বালিয়ে পূর্ণতর করেছেন কবিকে, কবির বাণীকে, যিনি কবির সারাজীবন ভরে রয়েছেন অপরিসীম ধ্যানরূপে তাঁর সর্বদেহে-মনে, সেই বিচিত্ররূপিণী নারীলক্ষ্মীর বিচিত্র আত্ম-প্রকাশ রবীন্দ্র-কবিমানসলোকের পরমতম রহস্য। আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমেই বলেছি, যে প্রদীপশিখা কবির মানসমন্দিরে জ্বলছে তার আলোয় কাদম্বরী দেবীর মানবীমূর্তিটি যেমন চির-উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে, তেমনি সেই আলোতেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাঁর নবনব সৌন্দর্যমূর্তি এবং অন্তর্যামীরূপিণী দেবীমূর্তি। দান্তের চেতনায় বেয়াত্রিচে যেমন ছিলেন, রবীন্দ্রচেতনায়ও

কাদম্বরী দেবী তেমনি, "She is both herself and what she signifies"। মানসী, মানসসুন্দরী, সৌন্দর্যলক্ষ্মী, অন্তর্যামী ও জীবনদেবতা ;— কবিমানসে কাদম্বরী দেবীর বিচিত্র রূপায়ণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে।—

কড়ি ও কোমল : গ্রন্থপ্রকাশ কার্তিক ১২৮৩

পুরাতন
নূতন
যোগিয়া
ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি
মথুরায়
বনের ছায়া
কোথায়
শান্তি
হৃদয়ের ভাষা
বসন্ত অবসান
বাঁশি
বিরহ
বাকি
বিলাপ
সারাবেলা
আকাঙ্ক্ষা
তুমি
ভুল
কো তুঁহু (প্রথম সংস্করণ)
গান
যৌবন-স্বপ্ন
ক্ষণিক মিলন
গীতোচ্ছ্বাস
হৃদয়-আকাশ

অঞ্চলের বাতাস
পবিত্র প্রেম
পবিত্র জীবন
বৈতরণী
মানব-হৃদয়ের বাসনা
সিন্ধুগর্ভ
ক্ষুদ্র অনন্ত
অস্তমান রবি
অস্তাচলের পরপারে
সত্য ১-২
চিরদিন ১-৪

মানসী : রচনাকাল ১২৯৪ বৈশাখ - ১২৯৭ কার্তিক

উপহার	৩০ বৈশাখ ১৮৯০
ভুলে	বৈশাখ ১৮৮৭
ভুল-ভাঙা	„ ১৮৮৭
বিরহানন্দ	জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৭
ক্ষণিক মিলন	৯ ভাদ্র ১৮৮৯
শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা	আষাঢ় ১৮৮৭
আত্মসমর্পণ	১১ ভাদ্র ১৮৮৯
নিষ্ফল কামনা	১৩ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭
সংশয়ের আবেগ	১৫ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭
বিচ্ছেদের শান্তি	১৪ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭
তবু	১৫ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭
আকাঙ্ক্ষা	২০ বৈশাখ ১৮৮৮
নিষ্ফল প্রয়াস	১৮ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭
হৃদয়ের ধন	
নিভৃত আশ্রম	
পুরুষের উক্তি	২৩ „ „
শূন্যগৃহে	১১ বৈশাখ ১৮৮৮

জীবন-মধ্যাহ্নে	১৪ বৈশাখ ১৮৮৮
ভ্রান্তি	১৬ " "
বিচ্ছেদ	১৯ " "
মানসিক অভিসার	২১ " "
পত্রের প্রত্যাশা	২৩ " "
সুরদাসের প্রার্থনা	২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮
ধ্যান	২৬ শ্রাবণ ১৮৮৯
পূর্বকালে	২ ভাদ্র "
অনন্ত প্রেম	" "
আশঙ্কা	১৪ " "
বিদায়	আশ্বিন ১৮৯০
সন্ধ্যায়	৭ কার্তিক ১৮৯০
শেষ উপহার	৯ " "
মৌন ভাষা	১০ " "

সোনার তরী : ১২৯৮ ফাল্গুন - ১৩০০ অগ্রহায়ণ

প্রতীক্ষা	১৭ অগ্রহায়ণ ১২৯৯
মানসসুন্দরী	৪ পৌষ "
ব্যর্থ যৌবন	১৬ আষাঢ় ১৩০০
প্রত্যাখ্যান	২৭ " "
অচল স্মৃতি	১১ অগ্রহায়ণ "
নিরুদ্দেশ যাত্রা	২৭ " "

চিত্রা : ১২৯৯ চৈত্র - ১৩০২ ফাল্গুন

চিত্রা	১৮ অগ্রহায়ণ ১৩০২
প্রেমের অভিষেক	১৪ মাঘ ১৩০০
স্নেহস্মৃতি	বর্ষশেষ ১৩০০
নববর্ষে	নববর্ষ ১৩০১
দুঃসময়	৫ বৈশাখ "
মৃত্যুর পরে	৫ বৈশাখ "
ব্যাঘাত	৬ জ্যৈষ্ঠ "

অন্তর্যামী	ভাদ্র ১৩০১
সাধনা	৪ কার্তিক ”
আবেদন	২২ অগ্রহায়ণ ১৩০২
উর্বশী	২৩ ” ”
বিজয়িনী	১ মাঘ ”
উৎসব	২২ মাঘ ”
জীবনদেবতা	২৯ মাঘ ”
সিন্ধুপারে	২০ ফাল্গুন ১৩০২

চৈতালি : ১৩০২ চৈত্র - ১৩০৩ শ্রাবণ

উৎসর্গ	১৩ চৈত্র ১৩০২
গীতহীন	১৩ চৈত্র ১৩০২
স্বপ্ন	১৪ চৈত্র ১৩০২
মানসী	২৮ চৈত্র ১৩০২
নারী	” ”
প্রিয়া	” ”
ধ্যান	” ”
মৌন	২৯ চৈত্র ”
অসময়	” ”
গান	” ”
নদীযাত্রা	৭ শ্রাবণ ১৩০৩
মৃত্যুমাধুরী	” ”
স্মৃতি	” ”
বিলয়	” ”
প্রেয়সী	১১ শ্রাবণ ১৩০৩
শান্তিমন্ত্র	” ”

কল্পনা : গ্রন্থপ্রকাশ - ১৩০৭ বৈশাখ

মানসপ্রতিমা	৯ আশ্বিন ১৩০৪
অশেষ	

ক্ষণিকা : গ্রন্থপ্রকাশ ১৩০৭ শ্রাবণ

আবির্ভাব	১০ আষাঢ় ১৩০৭
অন্তরতম	৩ আষাঢ় ১৩০৭
সমাপ্তি	

উৎসর্গ : গ্রন্থপ্রকাশ ১৩১০

২	কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া
৩	মোর কিছু ধন আছে সংসারে
৪	তোমারে পাছে সহজে বুঝি
৬	তোমায় চিনি বলে করেছি গরব
১০	আমার মাঝারে যে আছে, কে গো সে
১৩	আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে
২০	দুয়ারে তোমার ভিড় করে যারা আছে
২৩	শূন্য ছিল মন

গীতাঞ্জলি : রচনাকাল ১৩১৩ - শ্রাবণ ১৩১৭

৬০	বিশ্ব যখন নিদ্রামগন	৪ বৈশাখ ১৩১৭
৬১	সে যে পাশে এসে বসেছিল	১২ বৈশাখ ১৩১৭
৮৩	কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি	৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

গীতিমাল্য : ১৩১৮ চৈত্র - ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ

২২	কে গো অন্তরতর সে	৬ বৈশাখ ১৩১৯
২৩	আমারে তুমি অশেষ করেছ	৭ বৈশাখ ১৩১৯
২৪	হারমানা হার পরাব তোমার গলে	,, ,,

বলাকা : ১৩২১ বৈশাখ - ১৩২২ কার্তিক

ছবি	৩ কার্তিক ১৩২১

পূরবী : ১৩২৯ আষাঢ় - ১৩৩১ অগ্রহায়ণ

লীলাসঙ্গিনী	ফাল্গুন ১৩৩০
শেষ অর্ঘ্য	,, ,,
বকুল বনের পাখি	,, ,,
পূর্ণতা	১ অক্টোবর ১৯২৪
আহ্বান	১ অক্টোবর ১৯২৪

খেলা ৭ ,, ,,
স্বপ্ন ২০ ,, ,,
দোসর ২৮ ,, ,,
তারা ১ নভেম্বর ১৯২৪
কিশোর প্রেম ১১ ,, ,,

বনবাণী : ১৩৩৩ ফাল্গুন - ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ
আম্রবন ৫ ফাল্গুন ১৩৩৪

মহুয়া : ১৩৩৩ চৈত্র - ১৩৩৫ পৌষ
অন্তর্ধান ২৬ আষাঢ় ১৩৩৫
দিনান্তে ১ শ্রাবণ ১৩৩৪

পরিশেষ : ১৩৩৭ চৈত্র - ১৩৩৯ শ্রাবণ
তুমি ৭ নভেম্বর ১৯৩০
নির্বাক্ মাঘ ১৩৩৮

পুনশ্চ : ১৩৩৯ শ্রাবণ - ভাদ্র
ফাঁক ১১ ভাদ্র ১৩৩৯

বিচিত্রিতা : গ্রন্থপ্রকাশ ১৩৪০ শ্রাবণ
ছায়াসঙ্গিনী মাঘ ? ১৩৩৮
নীহারিকা ১ এপ্রিল ১৯৩১

শেষ সপ্তক : গ্রন্থপ্রকাশ ১৩৪২ বৈশাখ
৪৩ সংখ্যক কবিতা ('পঁচিশে বৈশাখ চলেছে')

বীথিকা : ১৩৪১ বৈশাখ - ১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ
কৈশোরিকা ৯ মাঘ ১৩৪০
সত্যরূপ ৫ শ্রাবণ ,,
প্রত্যর্পণ ১৯৩২ ?
আদিতম ৮ বৈশাখ ১৩৪১
নিমন্ত্রণ ১৪ জুন ১৯৩৫
নাট্যশেষ আষাঢ় ১৩৪২
পোড়োবাড়ি ৩ আগস্ট ১৯৩২
বিদ্রোহী ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২

ছবি	১৭ বৈশাখ ১৩৩৮
উদাসীন	৯ শ্রাবণ ১৩৪১
অন্তরতম	৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪
প্রতীক্ষা	২১ শ্রাবণ ১৩৪২
বাদলসন্ধ্যা	২৩ ,, ,,
বাদলরাত্রি	২৮ ,, ,,
অভ্যাগত	২২ ,, ,,

পত্রপুট : ১৩৪২ আশ্বিন – ১৩৪৩ বৈশাখ

৫ সংখ্যক কবিতা	২৫ অক্টোবর ১৯৩৫
১২ সংখ্যক কবিতা	১ বৈশাখ ১৩৪৩
১৫ সংখ্যক কবিতা [প্রাসঙ্গিক]	১৮ বৈশাখ ১৩৪৩

শ্যামলী : ১৩৪৩ জ্যৈষ্ঠ - আষাঢ়

বিদায়বরণ	৩ জুন ১৯৩৬
মিলভাঙা	২০ ,, ,,

সেঁজুতি : ১৩৪৩ অগ্রহায়ণ – ১৩৪৫ বৈশাখ

সন্ধ্যা	২৩ এপ্রিল ১৯৩৭

আকাশপ্রদীপ : ১৩৪৫ কার্তিক-চৈত্র

আকাশপ্রদীপ	২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮
বধূ	২৫ অক্টোবর ১৯৩৮
শ্যামা	৩১ ,, ,,
জানা-অজানা	১১ সেপ্টেম্বর ,,
কাঁচা আম	৮ এপ্রিল ৯৩৯

নবজাতক : ১৩৪৫ আষাঢ় – ১৩৪৫ চৈত্র

শেষ কথা	৪ এপ্রিল ১৯৪০

সানাই : ১৩৪৫ আষাঢ় – ১৩৪৭ আষাঢ়

কর্ণধার	২৮ জানুয়ারি ১৯৪০
বিপ্লব	২১ ,, ,,
অনাবৃষ্টি	১৩ ,, ,,
মানসী	৯ জুন ১৯৩৯

মায়া	২২ জুন ১৯৩৮
অবশেষে	৬ ডিসেম্বর ,,
দূরবর্তিনী	? ১৯৩৭
গান ('যে ছিল আমার স্বপনচারিণী')	৮ ডিসেম্বর ১৯৩৮
অনসূয়া [প্রাসঙ্গিক]	২০ মার্চ ১৯৪০
শেষ অভিসার	২৩ এপ্রিল ১৯৪০
মানসী	২২ মে ১৯৪০
অসম্ভব	১৬ জুলাই ১৯৪০
অবসান	১৯ ,, ,,

রোগশয্যায় : ১৩৪৭ কার্তিক-অগ্রহায়ণ

৩৩ সংখ্যক কবিতা	২ ডিসেম্বর ১৯৪০
৩৪ সংখ্যক কবিতা	,, ,,
৩৯ সংখ্যক কবিতা	৫ ,, ,,

আরোগ্য : ১৩৪৭ মাঘ - ফাল্গুন

১৩ সংখ্যক কবিতা	৩০ জানুয়ারি ১৯৪১

১৮

'কড়ি ও কোমলে'র কবিমানসের রহস্য-সন্ধানে রচনাবলী সংস্করণে বিধৃত "কবির মন্তব্যে"র অন্তিম অনুচ্ছেদকেই মূলসূত্ররূপে গ্রহণ করতে হবে। এতে যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে আর একটি প্রবল প্রবর্তনা রয়েছে— তা হল জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব। চতুর্দশী-পঞ্চদশী কিশোরী-বধূকে নিয়ে তরুণ কবির নবীন দাম্পত্য-জীবনের লীলাকেই কবি বলেছেন যৌবনের রসোচ্ছ্বাস। আর সদ্য-লোকান্তরিতা কাদম্বরী দেবীর বিয়োগে মৃত্যুজনিত যে অপার বিরহ কবিমানসে আবির্ভূত তারই প্রকাশ ঘটেছে নানা বাণীতে। বিলাপচারী বিচ্ছেদবেদনা থেকে মরণের প্রেক্ষাপটে রচিত জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কবির তত্ত্বচিন্তা তার বিষয়ালম্বন। 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুলিকেও এইভাবেই দ্বিধাবিভক্ত করে দেখতে হবে। বস্তুত, সম্ভোগ-মিলনের আনন্দ এবং করুণ-বিপ্রলম্ভের বেদনার যুগ্মবেণীতে'কড়ি ও কোমলে'র প্রেমচেতনা বিলসিত হয়েছে

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর প্রথম বৎসরে ১২৯১-এর বৈশাখ থেকে চৈত্রের মধ্যে 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছ' (শ্রাবণ, ভারতী) 'আত্মা' (প্রবন্ধ; শ্রাবণ, ভারতী), 'হায়!' (গান, ভাদ্র, ভারতী), 'যোগিয়া' (কার্তিক), 'কোথায়' (পৌষ), 'বিদায়' (চৈত্র) এবং 'সরোজিনী-প্রয়াণ' (ভ্রমণকাহিনী; শ্রাবণ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ, ভারতী),— এই কটি রচনা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বৎসরে প্রকাশিত হয় 'পুষ্পাঞ্জলি' (গীতিগন্ধ-গুচ্ছ, বৈশাখ), 'নূতন' (কবিতা—বৈশাখ), 'বিবিধ প্রসঙ্গ' (গীতিগন্ধ-গুচ্ছ; জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র), রুদ্ধগৃহ (প্রবন্ধ), 'পথপ্রান্তে' (প্রবন্ধ) এবং 'শিউলিফুলের' গাছ (রূপক গন্ধ)। এই সব রচনাবলীর মধ্যে যোগিয়া, কোথায় ও বিদায় কবিতাত্রয় 'কড়ি ও কোমলে' এবং রুদ্ধগৃহ ও পথপ্রান্তে 'বিচিত্র প্রবন্ধে' সংকলিত হয়েছে। 'পুষ্পাঞ্জলি'র কয়েকটি অনুচ্ছেদ পরবর্তীকালে 'লিপিকা'য় নবরূপ লাভ করেছে।

'কড়ি ও কোমলে'র যে সকল কবিতা ও গানে মৃত্যুর আবির্ভাব-জনিত চেতনা ভাষা পেয়েছে সেগুলিকে শোকোচ্ছ্বাস, স্মৃতিচারণ, পুনরাবির্ভাব, ধ্যান ও তত্ত্বচিন্তা— এই কয়টি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা যেতে পারে।

পুরাতন, নূতন, মথুরায়, কোথায়, বসন্ত অবসান, বিরহ, বিলাপ প্রভৃতি কবিতায় কবির শোক বিলাপচারী ভাষায় অভিব্যক্ত। বনের ছায়া, গীতোচ্ছ্বাস প্রভৃতি কবিতায় আছে স্মৃতিচারণ। হৃদয়ের ভাষা, বাঁশি, আকাঙ্ক্ষা, ভুল, গান, যৌবনস্বপ্ন, হৃদয়-আকাশ, অঞ্চলের বাতাস, অস্তমান রবি, অস্তাচলের পরপারে প্রভৃতি কবিতায় জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে বিশ্বভুবনে ও কবিমানসে কাদম্বরী দেবীর পুনরাবির্ভাবের অপূর্ব উপলব্ধি ভাষা পেয়েছে। যোগিয়া, তুমি, কো তুঁহু (প্রথম সংস্করণ) এবং পবিত্র প্রেম প্রভৃতি কাবতায় কবিচিত্ত ধ্যানাবিষ্ট। অন্যান্য কবিতাগুলি মৃত্যু, প্রেম ও জীবন সম্পর্কে কবির তত্ত্বচিন্তারই ছন্দিত বাণীরূপ।

কবির বিলাপচারী শোক উচ্ছ্বসিত হয়েছে 'কোথায়' কবিতায় :

হায়, কোথা যাবে!

অনন্ত অজানা দেশ, নিতান্ত যে একা তুমি,

পথ কোথা পাবে!

হায়, কোথা যাবে!

কঠিন বিপুল এ জগৎ,
খুঁজে নেয় যে যাহার পথ।
স্নেহের পুতলি তুমি সহসা অসীমে গিয়ে
কার মুখে চাবে!
হায়, কোথা যাবে!

* * *

মোরা বসে কাঁদিব হেথায়,
শূন্যে চেয়ে ডাকিব তোমায়;
মহা সে বিজন মাঝে হয়তো বিলাপধ্বনি
মাঝে মাঝে শুনিবারে পাবে,
হায়, কোথা যাবে!

কবিতাটি স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিকতায় অনন্য। এখানে শোকাভিভূত চিত্তের কাতরতা কোনও মণ্ডনকলার অপেক্ষা রাখে নি। সাদাসিধে ভাষাতেই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কবির বিষণ্ণ হৃদয়ের গান বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আশ্রয় করেছে বাঁশির সুর এবং রাধাকৃষ্ণ-লীলার মাথুর-বিপ্রলম্ভের প্রতীককে। কবিমানসে রাধাকৃষ্ণ-লীলার এই প্রতীকী চেতনার উৎসসন্ধানের চেষ্টা 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর' আলোচনা-প্রসঙ্গে করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর প্রথম বৎসরান্তে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহযোগে রবীন্দ্রনাথ 'পদরত্নাবলী' নামে বৈষ্ণবপদাবলীর একখানি সংকলন প্রকাশ করেন, ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন, "কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হন। এই শোক হইতে মুক্ত হইবার জন্যই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ পদাবলী হইতে বাছিয়া বাছিয়া শ্রেষ্ঠ রত্নগুলি সংকলন করিতে প্রবৃত্ত হন।"[৪৬] ডক্টর মজুমদারের অনুমান হয়তো অলীক নয়, বিশেষ করে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর শোকের প্রথম ভাষা খুঁজে পেয়েছিলেন 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছে'— শেলি ও অন্যান্য বিদেশী কবির 'বিষণ্ণ হৃদয়ের গান' প্রভৃতি কবিতায়।

কিন্তু পদরত্নাবলী সম্পাদনের এই হেতুনির্দেশ অভ্রান্ত না হলেও রবীন্দ্রমানসে বৈষ্ণবপদাবলীর প্রভাব অনস্বীকার্য; এবং কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুজনিত শোকানুভূতির প্রকাশে রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রেই রাধাকৃষ্ণ-লীলার প্রতীকটিকে

অপূর্ব ব্যঞ্জনায় সার্থক করে তুলেছেন। 'মথুরায়' কবিতায় কবি বলেছেন, "বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কই ?" এই কবিতার দ্বিতীয় স্তবকটিতে এই প্রতীক-ব্যবহারের রহস্য বিশদীভূত হয়েছে :

এক বার রাধে রাধে ডাক বাঁশি মনোসাধে,
আজি এ মধুর চাঁদে মধুর যামিনী ভায়।
কোথা সে বিধুরা বালা, মলিন মালতীমালা,
হৃদয়ে বিরহ-জ্বালা, এ নিশি পোহায়, হায় !
কবি যে হল আকুল, এ কি রে বিধির ভুল।
মথুরায় কেন ফুল ফুটেছে আজি লো সই।
বাঁশরি বাজাতে গিয়ে বাঁশরি বাজিল কই।

এই কবিতায় বৈষ্ণবের মাথুর-বিরহ নূতন তাৎপর্য পেয়েছে। বৃন্দাবনলীলায় কৃষ্ণের মথুরা-গমনের ফলে ব্রজগোপীগণের বিচ্ছেদবেদনাই মুখ্য উপজীব্য। এখানে মৃত্যুজনিত বিচ্ছেদে কবিচিত্ত নিজেকে মথুরা-প্রবাসী কৃষ্ণের সঙ্গে উপমিত করেছে। কৃষ্ণহৃদয়েরই বিরহজ্বালা কবিতাটিতে ভাষা পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কবি যে হল আকুল, এ কি রে বিধির ভুল।" এই বাক্যটি সংশয়াতীতভাবে প্রমাণ করে যে, কৃষ্ণের রূপকে বিরহী কবিচিত্তই কবিতাটির আলম্বন। 'বসন্ত অবসান' কবিতায়ও কবি বলেছেন, "কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গান।" তাই "কাঁদিছে নীরব বাঁশি।"

বৈষ্ণবসাহিত্যে বংশীধ্বনিই প্রেমের আহ্বান। প্রেমের আহ্বান হিসাবে বাঁশির প্রতীকটি রবীন্দ্রনাথ 'কড়ি ও কোমলে' বারবার ব্যবহার করেছেন। প্রিয়া নেই কিন্তু তাঁর প্রেমের আহ্বান দশদিক থেকে ভেসে আসছে। 'বাঁশি' গানটির কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ওতে কবি বলছেন :

ওগো শোনো কে বাজায়।
বনফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায়॥
অধর ছুঁয়ে বাঁশিখানি চুরি করে হাসিখানি,
বঁধুর হাসি মধুর গানে প্রাণের পানে ভেসে যায়।

'বিরহ' কবিতায়ও প্রিয়াহীন প্রেমের প্রতীক হয়েছে বাঁশি—

ওই বাঁশি-স্বর তার আসে বারবার
সেই শুধু কেন আসে না।

এই হৃদয়-আসন শূন্য যে থাকে
কেঁদে মরে শুধু বাসনা।

'কড়ি ও কোমলে'র প্রথম সংস্করণে যে সাতটি বিলাপ-সংগীত সংকলিত হয়েছিল (বিলাপ, সারাবেলা, আকাঙ্ক্ষায়, তুমি, ভুল, কো তুঁহু এবং গান), তাতেও বাঁশিই মুখ্য প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কবি বলছেন :

ওগো এত প্রেম-আশা প্রাণের তিয়াষা
কেমনে আছে সে পাসরি।
তবে সেথা কি হাসে না চাঁদিনী যামিনী,
সেথা কি বাজে না বাঁশরি।

[বিলাপ

ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে।
আমার ঘরে কেহ নাই যে।
তারে মনে পড়ে যারে চাই যে।
তার আকুল পরান বিরহের গান
বাঁশি বুঝি গেল জানায়ে।

* * *

সারা বিভাবরী কার পূজা করি
যৌবন-ডালা সাজায়ে;
বাঁশি-স্বরে হায় প্রাণ নিয়ে যায়
আমি কেন থাকি হায় রে॥

[গান

শুধু গানেই নয়, সনেটের কলাকৃতিতেও কবি বাঁশির প্রতীকটি ব্যবহার করেছেন। বিরহতন্ময় কবিচিত্তে মৃত্যুর পরপার থেকে প্রিয়ার বার্তা আসছে বংশীধ্বনিতে—

নীরব বাঁশরিখানি বেজেছে আবার।
প্রিয়ার বারতা বুঝি এসেছে আমার
বসন্ত-কানন মাঝে বসন্ত-সমীরে।
তাই বুঝি মনে পড়ে ভোলা গান যত।

তাই বুঝি ফুলবনে জাহ্নবীর তীরে
পুরাতন হাসিগুলি ফুটে শত শত।
তাই বুঝি হৃদয়ের বিস্মৃত বাসনা
জাগিছে নবীন হয়ে পল্লবের মতো।
জগৎ-কমল-বনে কমল-আসনা
কত দিন পরে বুঝি তাই এল ফিরে।

কবিতাটির ভাববিন্যাসে জটিলতা এসেছে। তিনটি মিলের ত্রিবেণীসংগমে প্রেমের আহ্বান, অতীত স্মৃতির উজ্জীবন এবং প্রিয়ার পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু কবিতাটি যে মুখ্যত স্মৃতিচারী বিলাপ-সংগীত তার প্রমাণ রয়েছে শেষের পঙ্‌ক্তি-চতুষ্টয়ে :

সে এল না এল তার মধুর মিলন,
বসন্তের গান হয়ে এল তার স্বর,
দৃষ্টি তার ফিরে এল— কোথা সে নয়ন ?
চুম্বন এসেছে তার— কোথা সে অধর ॥

এই স্মৃতিচারণ-সরণিতেও বাঁশির সুরই বাজছে :

বনের মর্মর মাঝে বিজনে বাঁশরি বাজে,
তারি সুরে মাঝে মাঝে ঘুঘু দুটি গান গায়,
ঝুরু ঝুরু কত পাতা গাহিছে বনের গাথা,
কত না মনের কথা তারি সাথে মিশে যায়। [বনের ছায়া

এই সব কবিতায় বিরহের নিগূঢ় মন্ত্রে 'ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে'।

এই ত্রিভুবন-তন্ময়-করা বিরহে স্বভাবতই কবিমানস স্মৃতির স্বপ্নসরণিতে বারবার আনাগোনা করেছে। 'যোগিয়া' কবিতায় সেই কথাটি অভিব্যক্ত। বহুদিন পরে মেঘ কেটে গিয়ে 'রবির কিরণসুধা আকাশে উথলে' উঠেছে। 'পুলক নাচিছে গাছে গাছে'। এই সুন্দর প্রভাতটি কবিচিত্তে আরেকটি প্রভাতকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। তাঁর বিরহাকাশে বেজে উঠেছে যোগিয়া রাগিণী। কবি বলছেন :

গাছপালা চারিভিতে সংগীতের মাধুরীতে
মগ্ন হয়ে ধরে স্বপ্নছবি।

এ প্রভাত মনে হয় আরেক প্রভাতময়
রবি যেন আর কোনো রবি।
ভাবিতেছি মনে মনে কোথা কোন্ উপবনে
কী ভাবে সে গাইছে না জানি,
চোখে তার অশ্রুরেখা, একটু দেছে কি দেখা,
ছড়ায়েছে চরণ দুখানি।
তার কি পায়ের কাছে বাঁশিটি পড়িয়া আছে—
আলোছায়া পড়েছে কপোলে।
মলিন মালাটি তুলি ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি
ভাসাইছে সরসীর জলে।
বিষাদ-কাহিনী তার সাধ যায় শুনিবার,
কোন্খানে তাহার ভবন।
তাহার আঁখির কাছে যার মুখ জেগে আছে
তাহারে বা দেখিতে কেমন।

শেষের বাক্যটিতে লোকান্তরিতা প্রিয়ার আঁখির সামনে নিজের মুখখানি দেখার বাসনাই সংশয়াত্মক বক্রোক্তির কুহেলিজালে জড়িয়ে আছে।

১৯

বিরহের অশ্রুজলধি পেরিয়ে কবিমানসে প্রিয়ার পুনরাবির্ভাবের রহস্যটি উন্মীলিত হয়েছে 'কড়ি ও কোমলে'র একাধিক কবিতায়। প্রথম স্তরে যে কথা কবির নিজের কাছেও দুর্জ্ঞেয় ছিল তার আভাস কবি খুঁজে পেয়েছেন বিশ্বের প্রেক্ষাপটে। কবি তাঁর নিজের হৃদয়-বেদনাকে ভাষা দিতে পারছেন না, অথচ—

সন্ধ্যাকালে নেমে যায় নীরব তপন
সুনীল আকাশ হতে সুনীল সাগরে।
আমার মনের কথা, প্রাণের স্বপন
ভাসিয়া উঠিছে যেন আকাশের 'পরে।

তাই পরম বিস্ময়ভরে কবি বলছেন :

প্রাণের যে কথাগুলি আমি নাহি জানি,
সে কথা কেমন করে জেনেছে সবাই।
মোর হৃদয়ের গান সকলেই গায়,
গাহিতে পারি নে তাহা আমি শুধু হায়।

[হৃদয়ের ভাষা

শুধু তাঁর হৃদয়ের গানই নয়, হৃদয়ের ধ্যানেও যে মূর্তিটি রয়েছে কবি তাঁরই পুনর্জাগরণ বিশ্বভুবন জুড়ে অনুভব করেছেন। 'যৌবন-স্বপ্ন' কবিতায় কবির যে-যৌবন-স্বপ্নে বিশ্বের আকাশ ছেয়ে আছে সেই অপূর্ব স্বপ্নটির পরিচয় ফুটে উঠেছে কবিতার শেষ সাতটি পঙ্‌ক্তিতে। কবি বলছেন :

প্রতি নিশি ঘুমাই যখন পাশে এসে বসে যেন কেহ
সচকিত স্বপনের মতো জাগরণে পলায় সলাজে।
যেন কার আঁচলের বায় উষায় পরশি যায় দেহ,
শত নূপুরের রুনুঝুনু বনে যেন গুঞ্জরিয়া বাজে।
মদির প্রাণের ব্যাকুলতা ফুটে ফুটে বকুল-মুকুলে ;
কে আমারে করেছে পাগল।— শূন্যে কেন চাই আঁখি তুলে,
যেন কোন্ উর্বশীর আঁখি চেয়ে আছে আকাশের মাঝে।

এই কবিতায় কবি বলেছেন, 'যেন কার আঁচলের বায় উষায় পরশি যায় দেহ', এই ভাবকলিকাটি ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে 'অঞ্চলের বাতাস' সনেটের অষ্টকবন্ধে :

পাশ দিয়ে গেল চলি চকিতের প্রায়,
অঞ্চলের প্রান্তখানি ঠেকে গেল গায়,
শুধু দেখা গেল তার আধখানি পাশ,
শিহরি পরশি গেল অঞ্চলের বায়।
অজানা হৃদয়-বনে উঠেছে উচ্ছ্বাস,
অঞ্চলে বহিয়া গেল দক্ষিণ-বাতাস,
সেথা যে বেজেছে বাঁশি তাই শুনা যায়,
সেথায় উঠিছে কেঁদে ফুলের সুবাস।

মৃত্যুর পরে মরলোকে বিদেহিনী কাদম্বরী দেবীর পুনরুজ্জীবনের দুটি দিক।

একটিতে বিশ্বের নিখিল সৌন্দর্যের মধ্যে তাঁর পুনরাবির্ভাব, অন্যটিতে ফেলে-যাওয়া স্নেহ-প্রেমের মায়ায় পুরাতন আবাসে তাঁর ফিরে-ফিরে আসা। এই দুটি দিকের কথা ভারি সুন্দর করে কবি বলেছেন 'পুরাতন' কবিতায় :

বারেক যে চলে যায়, তারে তো কেহ না চায়,
তবু তার কেন এত মায়া।
তবু কেন সন্ধ্যাকালে জলদের অন্তরালে
লুকায়ে ধরার পানে চায়—
নিশীথের অন্ধকারে পুরানো ঘরের দ্বারে
কেন এসে পুন ফিরে যায়।

এই নিশীথের অন্ধকারে পুরোনো ঘরের দ্বারে এসে বার-বার ফিরে-ফিরে যাওয়ার ভাবানুষঙ্গটি 'চিত্রা'র 'দুঃসময়' কবিতায় করুণতর সুরে বেজে উঠেছে।

২০

পূর্বেই বলা হয়েছে, 'কড়ি ও কোমলে'র কবির মানস-মন্দিরের কেলিকুট্টিমে দুই নারীর অধিষ্ঠান। একজন জীবনসঙ্গিনী, আরেকজন 'কল্পনার সাথী'। জীবনসঙ্গিনীর বরতনুকে পঞ্চদশ বসন্তের একগাছি মালার মতো বুকে তুলে নিয়ে তরুণ দাম্পত্যের দেহরতি "আত্মবিস্মৃত বেআইনী প্রমত্ততায়" অবাধে উৎসারিত হয়েছে। আর কল্পনার সাথীকে নিয়ে কবির মানসরতি এক অনাস্বাদিতপূর্ব কল্পমধুপানে বিভোর হয়ে আছে। ধীরে ধীরে এই 'কল্পনার সাথী' কবির মানস-মন্দিরের কেলিকুট্টিম পেরিয়ে রত্নবেদিতে দেবীর আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। 'কড়ি ও কোমলে'র পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের নাম 'মানসী'। 'কড়ি ও কোমলে'ই কাদম্বরী দেবী কবিমানসে মানসীর আসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে 'কড়ি ও কোমলে'র 'কল্পনার সাথী' ও 'কল্পনামধুপ'— এই দুটি সনেটের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। 'কল্পনার সাথী' কবিতার প্রথম দুটি চরণে কবি বলছেন :

যখন কুসুম-বনে ফির একাকিনী,
ধরায় লুটায়ে পড়ে পূর্ণিমা যামিনী,

এই পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের ভাবানুষঙ্গ 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থে 'জ্যোৎস্না রাত্রে' কবিতায় কবির

দিব্যসৌন্দর্য-স্বপ্নে কুসুমিত হয়েছে। আলোচ্য সনেটে সেই ভাবটিই বীজাকারে প্রকাশিত। এই সনেটের ষট্কবন্ধে কবি বলছেন :

মধ্যাহ্নে একেলা যবে বাতায়নে বসে,
নয়নে মিলাতে চায় সুদূর আকাশ,
কখন আঁচলখানি পড়ে যায় খসে,
কখন হৃদয় হতে উঠে দীর্ঘশ্বাস,
কখন অশ্রুটি কাঁপে নয়নের পাতে,
তখন আমি কি সখী থাকি তব সাথে।

এই অন্তিম পঙ্‌ক্তিমিথুনে 'যোগিয়া' কবিতার বাসনাই ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠেছে। সেখানে কবির জিজ্ঞাসা ছিল—

তাহার আঁখির কাছে
যার মুখ জেগে আছে
তাহারে বা দেখিতে কেমন।—

প্রথমপুরুষীয় এই উৎপ্রেক্ষাই 'কল্পনার সাথী' সনেটে উত্তমপুরুষীয় প্রশ্নাত্মক প্রত্যয়ে অন্তরঙ্গতর হয়েছে।

'কল্পনামধুপ' কবিতাটি 'কল্পনার সাথী'রই দোসর। কল্পনার সাথীতে তুমি-চেতনাই মুখ্য। কল্পনামধুপে মুখ্য আমি-চেতনা। প্রথম-চতুষ্কে কবি বলছেন :

প্রতিদিন প্রাতে শুধু গুন গুন গান,
লালসে অলস-পাখা অলির মতন।
বিকল হৃদয় লয়ে পাগল পরান
কোথায় করিতে যায় মধু অন্বেষণ।

এই মধু-অন্বেষণে শ্রান্ত-দিনমান অবসিত হয়ে আসে সন্ধ্যা। উত্তীর্ণ-সন্ধ্যায় কবিমানসের দশা বর্ণনা করে ষট্কবন্ধে কবি বলেছেন :

কুসুমদলের বেড়া তারি মাঝে ছায়া,
সেথা বসে করি আমি কল্পমধু পান ;
বিজনে সৌরভময়ী মধুময়ী মায়া,
তাহারি কুহকে আমি করি আত্মদান ;
রেণুমাখা পাখা লয়ে ঘরে ফিরে আসি
আপন সৌরভে থাকি আপনি উদাসী ॥

'কড়ি ও কোমল' ও পরবর্তী কাব্য 'মানসী'র কবিমানস এখানে সম্পূর্ণ নির্বারিত হয়েছে—

বিজনে সৌরভময়ী মধুময়ী মায়া
তাহারি কুহকে আমি করি আত্মদান।

* * *

আপন সৌরভে থাকি আপনি উদাসী।

সৌরভময়ী মধুময়ী মায়ার কুহকে কবি আত্মদান করেছেন এবং প্রেমের পুষ্পরেণু পাখায় মেখে কবি আপন সৌরভে আপনি উদাসী হয়ে রয়েছেন। এই কল্পনাই মোহিত সেন -সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থে'র দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় খণ্ডে 'যৌবনস্বপ্ন' শীর্ষক কবিতাগুচ্ছের প্রবেশক-কবিতায় ভাষা পেয়েছে। সেখানে কবি বলছেন :

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরীমৃগ সম।

'কল্পনার সাথী' এবং 'কল্পনামধুপ' সনেটদ্বয়ের বক্তব্যই একত্র সংহতিবদ্ধ হয়েছে 'হৃদয়-আকাশ' সনেটে। তার অষ্টকবন্ধে আছে 'আমি'র কথা, ষট্‌কবন্ধে 'তুমি'। অষ্টকে কবি বলছেন :

আমি ধরা দিয়েছি গো আকাশের পাখি
নয়নে দেখেছি তব নূতন আকাশ।
দুখানি আঁখির পাতে কী রেখেছ ঢাকি
হাসিলে ফুটিয়া পড়ে উষার আভাস।
হৃদয় উড়িতে চায় হোথায় একাকী
আঁখি-তারকার দেশে করিবারে বাস।
ঐ গগনেতে চেয়ে উঠিয়াছে ডাকি
হোথায় হারাতে চায় এ গীত-উচ্ছ্বাস।

কবি তাঁর মানসলক্ষ্মীর নয়নে নূতন আকাশের সন্ধান পেয়ে সেই আঁখি-তারকার দেশে উড়ে যাবার জন্যেই আকুল হয়েছেন। এখানে কবিমানসের উপমান হয়েছে আকাশের পাখি। আর মানসলক্ষ্মীর উপমান পাখির অবাধ

উড্ডয়নের অসীম আকাশ। 'আঁখি-তারকা'র রূপক-অলংকারটি কাদম্বরী দেবীর 'স্নেহময় ছায়াময় সন্ধ্যাসম' আঁখিদুটির কথাই আবার স্মরণ করিয়ে দেয়।[৪৭] ওই দৃষ্টিই সন্ধ্যার কাছে সন্ধ্যার মায়া শিখে সন্ধ্যাসংগীতের কবিমানসে তারা হয়ে ফুটে উঠেছিল। 'ভগ্নহৃদয়ে'র প্রথম উৎসর্গে ওই দৃষ্টির অধিকারিণী হয়েছিলেন কবির মানস-আকাশের ধ্রুবতারা। তাঁকে হারিয়ে কবির চেতনা-বিহঙ্গ সেই আঁখি-তারকার দেশেই উড়ে যাবার জন্যে আকুল হয়েছে। সনেটের ষট্‌কবন্ধে এই কবিবাসনাই বিকশিত—

> তোমার হৃদয়াকাশ অসীম বিজন—
> বিমল নীলিমা তার শান্ত সুকুমার,
> যদি নিয়ে যাই ওই শূন্য হয়ে পার
> আমার দুখানি পাখা কনক-বরন।
> হৃদয় চাতক হয়ে চাবে অশ্রুধার,
> হৃদয়-চকোর চাবে হাসির কিরণ॥

এই কবিতায় বিরহী কবিচিত্ত তার নভোবিহারের উন্মুক্ত আকাশের সন্ধান পেয়েছে। 'বিমল নীলিমা তার শান্ত সুকুমার'। এখন থেকে এই আকাশচারী কল্পনা কবির হৃদয়বাসনাকে আকাশের জ্যোতির্ময়লোকে শুভ্র আলো আর তারই সপ্তবর্ণ দিয়ে গড়া সৌন্দর্যের ইন্দ্রধনুচ্ছটার দিব্যস্বপ্নে বিভোর করে রাখবে। বাসনার এই ঊর্ধ্বায়ন, এই বিশুদ্ধীকরণের সংকেত রয়েছে 'পবিত্র প্রেম' কবিতায়। কবিতাটি এখানে সমগ্রভাবে উদ্ধারযোগ্য :

> ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওরে, দাঁড়াও সরিয়া।
> ম্লান করিয়ো না আর মলিন পরশে।
> ওই দেখো তিলে তিলে যেতেছে মরিয়া,
> বাসনা-নিশ্বাস তব গরল বরষে।
> জান না কি হৃদিমাঝে ফুটেছে যে ফুল,
> ধূলায় ফেলিলে তারে ফুটিবে না আর।
> জান না কি সংসারের পাথার অকূল,
> জান না কি জীবনের পথ অন্ধকার!
> আপনি উঠেছে ওই তব ধ্রুবতারা,
> আপনি ফুটেছে ফুল বিধির কৃপায়

সাধ করে কে আজি রে হবে পথহারা
সাধ করে এ কুসুম কে দলিবে পায় !
যে প্রদীপ আলো দেবে তাহে ফেল শ্বাস,
যারে ভালোবাস তারে করিছ বিনাশ !

এই কবিতার আলম্বনস্বরূপিণী কে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাবে নবম ও ও একাদশ পঙ্‌ক্তি দুটিতে—

আপনি উঠেছে ওই তব ধ্রুবতারা,

* * *

সাধ করে কে আজি রে হবে পথহারা।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ভগ্নহৃদয়ের প্রথম উপহার-কবিতাটি—

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা।[৪৮]

ভগ্নহৃদয়ের এই উপহারটি পরে ব্রহ্মসংগীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। লোকান্তরিতা কাদম্বরী দেবীর প্রতি কবির হৃদয়-বাসনাও ঊর্ধ্বায়িত স্তরে যে ব্রহ্মাস্বাদসহোদর দিব্যপ্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে তারই সাক্ষ্য বহন করছে 'কড়ি ও কোমলে'র 'পবিত্র প্রেম' কবিতাটি।

এই কবিতায় কবিচেতনা ত্রিধাবিভক্ত। এই তিন স্তরে প্রেমের তিনটি উপমান। তা কখনও হৃদয়কাননের ফুল, কখনও সংসারের অকূল পাথারে হৃদয়-আকাশের ধ্রুবতারা, কখনও জীবনের অন্ধকার পথে পথের আলো। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর আঠারো মাস পরে, ১২৯২ সালের অগ্রহায়ণে প্রকাশিত, 'পথপ্রান্তে' প্রবন্ধে প্রেমের এই তিনটি উপমানই ব্যবহৃত হয়েছে। এই প্রবন্ধেই প্রথম কবি প্রেমকে বলেছেন 'পথের আলো'।[৪৯]

২১

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু কবিকে ভেঙে দেয় নি, তাঁকে গড়ে তুলেছে।— It did not break him, it made him। কিন্তু কী অপরিসীম যন্ত্রণার অন্ধকার পেরিয়ে কবি আলোর তীর্থে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তার ইতিহাস তিনি

লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন 'জীবনস্মৃতি'র 'মৃত্যুশোক' অধ্যায়ে। কবির সেই রক্তক্ষরা ইতিহাসটি এখানে পুনরায় স্মরণযোগ্য :

"মৃত্যু যখন মনের চারিদিকে হঠাৎ একটা 'নাই'-অন্ধকারের বেড়া গাড়িয়া দিল, তখন সমস্ত মনপ্রাণ অহোরাত্র দুঃসাধ্য চেষ্টায় তাহারই ভিতর দিয়া কেবলই 'আছে'-আলোকের মধ্যে বাহির হইতে চাহিল।"[৫০]

* * *

"বাড়ির ছাদে একলা গভীর অন্ধকারে মৃত্যুরাজ্যের কোনো-একটা চূড়ার উপরকার একটা ধ্বজপতাকা, তাহার কালো পাথরের তোরণদ্বারের উপরে আঁক-পাড়া কোনো-একটা অক্ষর কিম্বা একটা চিহ্ন দেখিবার জন্য আমি যেন সমস্ত রাত্রিটার উপর অন্ধের মতো দুই হাত বুলাইয়া ফিরিতাম। আবার, সকালবেলায় যখন আমার সেই বাহিরের পাতা বিছানার উপরে ভোরের আলো আসিয়া পড়িত তখন চোখ মেলিয়াই দেখিতাম, আমার মনের চারিদিকের আবরণ যেন স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে ; কুয়াশা কাটিয়া গেলে পৃথিবীর নদী গিরি অরণ্য যেমন ঝলমল করিয়া ওঠে, জীবনলোকের প্রসারিত ছবিখানি আমার চোখে তেমনি শিশিরসিক্ত নবীন ও সুন্দর করিয়া দেখা দিয়াছে।"[৫১]

'কড়ি ও কোমলে'র 'মানব-হৃদয়ের বাসনা' সনেটে নিশীথের একলা গভীর অন্ধকারে কবির বক্ষে মহাকালের শেলবিদ্ধ রক্তক্ষরা বেদনাটি ভাষা পেয়েছে—

নিশীথে রয়েছি জেগে ; দেখি অনিমিখে,
লক্ষ হৃদয়ের সাধ শূন্যে উড়ে যায়।
কত দিক হতে তারা ধায় কত দিকে
কত না অদৃশ্য-কায়া ছায়া আলিঙ্গন
বিশ্বময় কারে চাহে করে হায় হায়।
কত স্মৃতি খুঁজিতেছে শ্মশান-শয়ন ;
অন্ধকারে হেরো শত তৃষিত নয়ন
ছায়াময় পাখি হয়ে কার পানে যায়।
ক্ষীণশ্বাস মুমূর্ষুর অতৃপ্ত বাসনা।
ধরণীর কূলে কূলে ঘুরিয়া বেড়ায়।
উদ্দেশে ঝরিছে কত অশ্রুবারিকণা
চরণ খুঁজিয়া তারা মরিবারে চায়।

পরবর্তী সনেট 'সিন্ধুগর্ভে'র মধ্যেও এই অনুভূতিই সঞ্চারিত হয়েছে—

ঝরে প্রাণ, ঝরে গান, ঝরে প্রেমধারা
পূর্ণ করিবারে চায় আকাশ-সাগর।
সহসা কে ডুবে যায় জলবিম্বপারা,
দু-একটি আলোরেখা যায় মিলাইয়া,
তখন ভাবিতে বসি কোথায় কিনারা
কোন্ অতলের পানে ধাই তলাইয়া।
নিম্নে জাগে সিন্ধুগর্ভ স্তব্ধ অন্ধকার।

কিন্তু এই 'নাই'-অন্ধকারের মধ্যেই কবিমানসে 'আছে'-আলোকের জ্যোতির্ময় শতদলটি বিকশিত হয়ে উঠেছে। 'অস্তমান রবি' ও 'অস্তাচলের পরপারে'— এই দুটি সনেটে আছে সেই ইতিহাস। 'অস্তাচলের পরপারে' কবিতায় সন্ধ্যাসূর্যের উদ্দেশে কবি বলছেন :

আমার এ গান তুমি যাও সাথে করে
নূতন সাগরতীরে দিবসের পানে।
সায়াহ্নের কূল হতে যদি ঘুমঘোরে
এ গান উষার কূলে পশে কারো কানে
সারা রাত্রি নিশীথের সাগর বাহিয়া
স্বপনের পরপারে যদি ভেসে যায়।
প্রভাত-পাখিরা যবে উঠিবে গাহিয়া
আমার এ গান তারা যদি খুঁজে পায়।
গোধূলির তীরে বসে কেঁদেছে যে জন
ফেলেছে আকাশে চেয়ে অশ্রুজল কত,
তার অশ্রু পড়িবে কি হইয়া নূতন
নবপ্রভাতের মাঝে শিশিরের মতো।
সায়াহ্নের কুঁড়িগুলি আপনা টুটিয়া
প্রভাতে কি ফুল হয়ে উঠে না ফুটিয়া।

এই কবিতাটি প্রথমেই 'পুষ্পাঞ্জলি'-'লিপিকা'র 'সন্ধ্যা ও প্রভাতে'র কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। সেখানে কবির প্রার্থনা ছিল, "সূর্যদেব, তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত, এদের তুমি মিলিয়ে দাও। এর ছায়া

ওর আলোটিকে একবার কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন করুক, এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে চলে যাক।"[৫২]

'অস্তাচলের পরপারে' সনেটটি এই একই ভাবানুষঙ্গের কাব্যরূপ। গোধূলির তীরে বসে যে-অশ্রু ঝরেছে, নব-প্রভাতের শিশিরবিন্দুতে রূপান্তরিত হয়েই তা সার্থক হয়ে উঠবে। সায়াহ্নের কুঁড়িগুলি ফুল হয়ে ফুটে উঠবে প্রভাতে।

কবিমানসের সেদিনকার চেতনা অন্তরঙ্গতম ভাষা পেয়েছে 'সত্য' শীর্ষক সনেট-যুগ্মকে। এই সনেট-যুগ্মকের 'সত্য' শিরোনামার তাৎপর্য কবিতার বাচ্যার্থে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ১২৯২ সালের কার্তিকের 'বালকে' 'রুদ্ধগৃহ' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তার অন্তিম অনুচ্ছেদে ছিল—

"তবে এ গৃহ রুদ্ধ রাখিও না— দ্বার খুলিয়া দাও। কারাবাসী শোক, স্মৃতি ও মৃত্যু ছাড়া পাইয়া মুহূর্তের মধ্যে পলাইয়া যাইবে। সূর্যের আলো দেখিয়া মানুষের সাড়া পাইয়া চকিত হইয়া ভয় প্রস্থান করিবে। সুখ এবং দুঃখ, শোক এবং উৎসব, জন্ম এবং মৃত্যু পবিত্র সমীরণের মতো ইহার বাতায়নের মধ্যে চিরদিন যাতায়াত করিতে থাকিবে। সমস্ত জগতের সহিত ইহার যোগ হইয়া যাইবে"।[৫৩]

কবির এই বক্তব্য ভারতীগোষ্ঠীর অগ্রজ কবি অক্ষয় চৌধুরীর মনে যে জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করেছিল তারই ফলে অগ্রহায়ণের 'বালকে' 'উত্তর-প্রত্যুত্তর' বিতর্কের উদ্ভব হয়। কিন্তু সেখানে কবি তাঁর অন্তরের গভীরতম সত্যকে প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হয়েছেন। কবির সত্য কবির কাব্যেই অকুণ্ঠরূপে প্রকাশ পায়। এই বিতর্কের আট বৎসর পরে একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "জীবনে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায়, কিন্তু কবিতায় কখনও মিথ্যা কথা বলি নে— সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান।"[৫৪]

'কড়ি ও কোমলে'র কবিমানসের এই "গভীর সত্য"টিই 'সত্য' সনেট-যুগ্মকে প্রকাশিত। প্রথম পঙ্‌ক্তি-চতুর্দশে কবি বলছেন :

> ভয়ে ভয়ে ভ্রমিতেছি মানবের মাঝে
> হৃদয়ের আলোটুকু নিবে গেছে বলে,
> কে কী বলে তাই শুনে মরিতেছি লাজে,
> কী হয় কী হয় ভেবে ভয়ে প্রাণ দোলে।

"আলো" "আলো" খুঁজে মরি পরের নয়নে,
"আলো" "আলো" খুঁজে খুঁজে কাঁদি পথে পথে,
অবশেষে শুয়ে পড়ি ধূলির শয়নে
ভয় হয় একপদ অগ্রসর হতে।
বজ্রের আলোক দিয়ে ভাঙো অন্ধকার,
হৃদি যদি ভেঙে যায় সেও তবু ভালো,
যে-গৃহে জানালা নাই সে তো কারাগার,
ভেঙে ফেলো আসিবেক স্বরগের আলো।
হায় হায় কোথা সেই অখিলের জ্যোতি।
চলিব সরল পথে অশঙ্কিত গতি ॥

কবিতাটি পড়লেই এর সঙ্গে 'রুদ্ধগৃহে'র অন্তিম অনুচ্ছেদের ভাবসাদৃশ্য স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। রুদ্ধ কারাগৃহের দ্বার মুক্ত করে দিলেই সূর্যের আলো সেখানে প্রবেশের সুযোগ পাবে।—

যে-গৃহে জানালা নাই সে তো অন্ধকার,
ভেঙে ফেলো আসিবেক স্বরগের আলো।

'সত্যে'র দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি-চতুর্দশে কবি 'অসীম সুন্দর'কে সম্বোধন করে তাঁর কাছে তাঁর অন্তরের ঐকান্তিক প্রার্থনাটি নিবেদন করেছেন—

আমার হৃদয়-দীপ আঁধার হেথায়,
ধূলি হতে তুলি এরে দাও জ্বালাইয়া,
ওই ধ্রুবতারাখানি রেখেছ যেথায়
সেই গগনের প্রান্তে রাখো ঝুলাইয়া।
চিরদিন জেগে রবে, নিবিবে না আর,
চিরদিন দেখাইবে আঁধারের পার ॥

এই ষট্‌কবন্ধ কবির শেষ-জীবনের 'আকাশপ্রদীপ' কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতাটির কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু সে-প্রসঙ্গ যথাসময়ে পুনরালোচিত হবে। আপাতত কাদম্বরী দেবীর লোকান্তরগমনের পরে কবিমানসে বিলসিত এই আলো-আঁধারি-লীলার সত্যরূপটি কাব্যের ঋজু শুভ্র ঋত ভাষাতেই প্রকাশিত হয়েছে।

মৃত্যুর মন্থনদণ্ডে হৃদয়সিন্ধু মথিত করে কবি 'মরণ-পীড়িত চিরজীবী প্রেম'কেই শুধু অন্তরে পেলেন না, সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুস্নাত অনাসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন বিশ্ব-ভুবনের সত্যরূপটিকেও। "আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা বড়ো মনোহর।" ৫৫

'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুচ্ছের শেষে অষ্টাদশাক্ষরা চারটি সনেটের একটি সনেট-পরম্পরা আছে। তার নাম 'চিরদিন'। এই সনেট-পরম্পরার আরম্ভ কবির নবলব্ধ জীবনজিজ্ঞাসা দিয়ে—

> কোথা রাত্রি, কোথা দিন, কোথা ফুটে চন্দ্র সূর্য তারা,
> কে বা আসে, কে বা যায়, কোথা বসে জীবনের মেলা,
> কে বা হাসে কে বা গায়, কোথা খেলে হৃদয়ের খেলা,
> কোথা পথ, কোথা গৃহ, কোথা পান্থ, কোথা পথহারা ?

এই অন্তহীন জীবনজিজ্ঞাসায় কবির মনে প্রশ্ন জেগেছে, এত ভাঙাগড়া, এত আনাগোনা, এত গান, এত তান, এত কান্না, এত কলরব, সবই 'চিরদিনে'র 'গভীর অসীম গর্ভে নির্বাসিত নির্বাপিত' হবার জন্যেই কি পুঞ্জীভূত হচ্ছে? এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ও জীবনের সবই কি তা হলে কেবল মায়া, কেবল মরীচিকামাত্র ? মর্ত্যজীবনের এই অনিত্য সুখদুঃখের তরঙ্গভঙ্গ কি অনন্তপার সিন্ধুসলিলে ক্ষণকালের অর্থহীন বুদ্‌বুদবিলাসমাত্র ?—

> এ প্রাণ, প্রাণের আশা, টুটে কি অসীম শূন্যতায়।
> বিশ্বের উঠিছে গান ? বধিরতা বসি সিংহাসনে ?
> বিশ্বের কাঁদিছে প্রাণ, শূন্যে ঝরে অশ্রুবারিধার ?
> যুগযুগান্তের প্রেম কে লইবে, নাই ত্রিভুবনে ?
> চরাচর মগ্ন আছে নিশিদিন আশার স্বপনে—
> বাঁশি শুনি চলিয়াছে, সে কি হায় বৃথা অভিসার ?
> বলো না সকলি স্বপ্ন, সকলি এ মায়ার ছলন,
> বিশ্ব যদি স্বপ্ন দেখে সে স্বপন কাহার স্বপন ?
> সে কি এই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকার ?

এই জীবন-জিজ্ঞাসারই উত্তর কবি খুঁজে পেয়েছেন চতুর্থ সনেটে। এই উত্তরের মধ্যেই কবিপ্রেমিকের বাসনা বিশ্বসত্যের দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হল। কবিদৃষ্টিতে সমুদ্ভাসিত এই বিশ্বসত্যেরই অবিস্মরণীয় বাণীরূপ হল চতুর্থ সনেটটি। কবি বলছেন :

ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতিপ্রাণ।
জগৎ আপনা দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান।
অসীমে উঠিছে প্রেম, শুধিবারে অসীমের ঋণ—
যত দেয় তত পায়, কিছুতে না হয় অবসান।
যত ফুল দেয় ধরা তত ফুল পায় প্রতিদিন—
যত প্রাণ ফুটাইছে ততই বাড়িয়া উঠে প্রাণ।
যাহা আছে তাই দিয়ে ধনী হয়ে ওঠে দীনহীন,
অসীম জগতে এ কি পিরিতির আদান-প্রদান।

অসীম জগতের এই পিরিতির আদান-প্রদানই সেদিনকার কবিদৃষ্টিতে জীবন-তত্ত্বের অন্তর্নিহিত লীলার স্বরূপ। এই কবিতায় অভিব্যক্ত প্রাণ ও প্রতি-প্রাণের খুঁজে-ফেরার তত্ত্বটি শেলির **Psyche-Epipsyche** তত্ত্বেরই সহোদর। এই তত্ত্বের ভিত্তিমূলে দাঁড়িয়েই কবি জীবনতত্ত্বের নবীন সৌধটি গড়ে তুলেছেন। সনেটের ষট্‌কবন্ধে তারই প্রকাশ—

কাহারে পূজিছে ধরা শ্যামল যৌবন-উপহারে,
নিমেষে নিমেষে তাই ফিরে পায় নবীন যৌবন।
প্রেমে টেনে আনে প্রেম, সে প্রেমের পাথার কোথা রে।
প্রাণ দিলে প্রাণ আসে, কোথা সেই অনন্ত জীবন।
ক্ষুদ্র আপনারে দিলে, কোথা পাই অসীম আপন,
সে কি ওই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকারে!

শেষ বাক্যের বিস্ময়চিহ্নের কাকুবক্রোক্তিতে কবির জিজ্ঞাসা প্রতিষ্ঠার নিঃসংশয় সত্যের ভিত্তিভূমি লাভ করেছে। ক্ষুদ্র-আপনাকে বিসর্জন দিয়ে অসীম-আপনাকে পাওয়ার ক্ষেত্র 'প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকার' নয়। যে-অসীম সুন্দরের পূজায় মর্ত্যপৃথিবী নিজের শ্যামল যৌবন উপহার দিয়ে নিমেষে নিমেষে নবীন যৌবন ফিরে পায় সেই প্রাণময় প্রেমময় চিরসুন্দরের জ্যোতির্ময়

বিশ্বলোকেই প্রেমের জন্যে আত্মোৎসর্জনকারী প্রাণ অনন্ত জীবনের সন্ধান পাবে। তমসাবৃত মৃত্যুর বৈতরণী পেরিয়ে জ্যোতির্ময় বিশ্বজীবনেই যে অমর প্রেমের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়— এই প্রতীতিতেই 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের উপসংহার রচিত হয়েছে। মৃত্যুস্নান সমাপন করে কবির প্রেম দিব্যকান্তিতে সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

২৩

'কড়ি ও কোমল' কাব্যে কবির প্রেমকেন্দ্রিক জীবনচেতনার আলোচনা সমাপ্ত করার পূর্বে একবার 'জীবনস্মৃতি'র অন্তিম অনুচ্ছেদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক। 'কড়ি ও কোমলে' এসেই কেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতির' পাঠকদের কাছে বিদায়গ্রহণ করেছিলেন এবার তার কারণটিও বুঝতে পারা যাবে। 'কড়ি ও কোমল'কে কবি বলেছেন জীবনের 'খাসমহলের দরজা'। কবি বলছেন :

"জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে-সমস্ত ভালোমন্দ সুখদুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে, তাহাকে কেবলমাত্র ছবির মতো করিয়া হালকা করিয়া দেখা আর চলে না। এখানে কত ভাঙাগড়া, কত জয়পরাজয়, কত সংঘাত ও সম্মিলন। এই-সমস্ত বাধা বিরোধ ও বক্রতার ভিতর দিয়া আনন্দময় নৈপুণ্যের সহিত আমার জীবনদেবতা যে একটি অন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন তাহাকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইবার শক্তি আমাদের নাই। সেই আশ্চর্য পরম রহস্যটুকুই যদি না দেখানো যায়, তবে আর-যাহাকিছুই দেখাইতে যাইব তাহাতে পদে পদে কেবল ভুল বুঝানোই হইবে।"[৫৬]

এই উক্তিতে রবীন্দ্রনাথ যে ভাঙাগড়া, জয়পরাজয়, সংঘাত ও সম্মিলনের কথা বলেছেন, তারই রহস্য অনাবৃত হয়েছে 'কড়ি ও কোমলে'র 'মরণপীড়িত চিরজীবী প্রেমে'র বিচিত্রভাষী কবিতাগুলিতে। কাদম্বরী দেবীর প্রতি কবির অনুরাগ এবং তাঁর মৃত্যুজনিত বিরহযন্ত্রণার ফলেই কবিমানসের ভাঙাগড়া,

জয়পরাজয়, সংঘাত ও সম্মিলন। এই সমস্ত বাধা বিরোধ ও বক্রতার ভিতর দিয়ে কবির জীবনদেবতার যে একটি অন্তরতম অভিপ্রায় বিকশিত হয়ে উঠেছে তার কেন্দ্রবিন্দুতে বিরাজমানা রয়েছেন বিদেহিনী কাদম্বরী দেবী। অমরাবতীর বাতায়নবর্তিনী সেই মর্ত্যপ্রতিমাই 'কড়ি ও কোমলে'র কবির হৃদয়সিন্ধু মন্থনের অধিনেত্রী। তাই 'কড়ি ও কোমলে' পেঁছে কাদম্বরী দেবীকে কবির জীবন-দেবতার মানবীমূর্তিরূপে গ্রহণ করা প্রায় অনিবার্য হয়ে ওঠে।

২৪

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পরে কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'মানসী'। রচনাকাল ১২৯৪ বৈশাখ থেকে ১২৯৭ কার্তিক। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১২৯৭ সালের শেষার্ধে। অর্থাৎ কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ বৎসরে কবিমানসে কাদম্বরী-প্রেম যে রূপ গ্রহণ করেছে তারই সাক্ষ্য বহন করছে এই কাব্যগ্রন্থ।

'মানসী'র নামকরণটি তাৎপর্যপূর্ণ। এর একটি অর্থ এই হতে পারে যে, এই গ্রন্থে যে প্রেমোপলব্ধি কাব্যরূপ লাভ করেছে তার আলম্বনস্বরূপিণী কোনো বাস্তবী নারী নয়, তা কবির মানসলোকনিবাসিনী কাল্পনিক নারী। এই সিদ্ধান্তের কিঞ্চিৎ আনুকূল্য করেছে প্রমথ চৌধুরীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের সেই সময়কার একখানি চিঠি। তাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

"মানুষের মনে ঈশ্বরের মত অসীম আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু ঈশ্বরের মত অসীম ক্ষমতা নেই— কেউবা বলচে, আছে— বলে বহির্জগতে চেষ্টা করে বেড়াচ্ছে— কেউ বা জানে, নেই— তাই আকাঙ্ক্ষারাজ্যে বসেই অর্ধ-নিরাশ্বাস-ভাবে কল্পনাপুত্তলী গড়িয়ে তাকে পূজো করচে। একেই বল ভালবাসা? আমার ভালবাসার লোক কই? আমি ভালবাসি অনেককে— কিন্তু মানসীতে যাকে খাড়া করেচি সে মানসেই আছে— সে Artist-এর হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা। ক্রমে সম্পূর্ণ হবে কি?"[৫৭]

"মানসীতে যাকে খাড়া করেছি সে মানসেই আছে"— অর্থাৎ মানসী-কাব্যের প্রেমের কবিতাগুলির আলম্বনস্বরূপিণী কবির "কল্পনাপুত্তলী" মাত্র, বাস্তব জগতের কোনো নারী নয়,— এই ধরনের যুক্তি কেউ কেউ গড়ে

তোলবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, কবির জীবনই এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সাক্ষী। রবীন্দ্রনাথ যে-যুগে এই চিঠিখানি লিখেছিলেন সে-যুগে কাদম্বরী দেবী সম্পর্কে তাঁর সুগভীর অনুরাগের কথা স্বভাবতই চিঠিপত্রের ভাষায় প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে যাঁকে অবলম্বন করে মানসীর ব্যক্তিগত প্রেমের কবিতাগুলি গড়ে উঠেছে তিনি তখন মৃত্যুর পরপারে, লোকলোচনের অন্তরালে চলে গেছেন। তাঁর অধিষ্ঠান তখন কবির মানসলোকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই তিনি মানসী। পরিণত বয়সে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের 'মানসী' অধ্যাপনাকালে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কবি তাঁর কাব্যরচনায় জীবনের দৈনন্দিন সুখদুঃখের মধ্যে যা পান সেইটেকেই দৈনন্দিন গণ্ডির থেকে পার করে নিয়ে চিরন্তনের সুরে দেন বেঁধে। এই চিরন্তনের মধ্যে নিজের জীবনের অনুভূতিকে প্রকাশ করাই কবির ধর্ম।" (মানসীকাব্য পাঠের ভূমিকা, 'প্রবাসী', ১৩৪৭)[৫৮]

কাব্যসৃষ্টি সম্বন্ধে কবিকথিত এই সাধারণ তত্ত্বই মানসী সম্পর্কে বিশেষ ভাবে সত্য। দৈনন্দিন সুখদুঃখের মধ্যে পাওয়া অনুভূতিকে দৈনন্দিন গণ্ডির থেকে পার করে নিয়ে চিরন্তনের সুরে যখন বেঁধে দেওয়া হয় তখন ব্যক্তিগত অনুভূতিই বিশ্বগত সর্বজনীনতা লাভ করে। কাব্যের এই সাধারণীকৃতির ফলেই কবির মনে হয় "আমার সে নয়, সবার সে আজ।" এই অর্থেই কবিপ্রিয়া কাব্যলোকে "আর্টিস্টের হাতে রচিত···প্রতিমা।" কাব্যসৃষ্টির এই রহস্যকে— এই মানসীতত্ত্বকে— রবীন্দ্রনাথ 'চৈতালি'র 'মানসী' 'কল্পনা'র 'মানসপ্রতিমা' এবং 'সানাই'য়ের 'মানসী' (২২ মে ১৯৪০) কবিতায় ভাষা দিয়েছেন। 'চৈতালি'তে কবি বলেছেন, নারী শুধু বিধাতার সৃষ্টিই নয়, পুরুষও তাকে নিজের অন্তরের সৌন্দর্য দিয়ে অনেকখানি গড়েছে—

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী।
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে।

* * *

সঁপিয়া তোমার 'পরে নূতন মহিমা
অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা।

পড়েছে তোমার 'পরে প্রদীপ্ত বাসনা,
অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা।

পুরুষের প্রদীপ্ত বাসনা দিয়ে গড়া 'মানসপ্রতিমা'কে 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থে ইমনকল্যাণে বন্দনা করে কবি গানের ভাষায় বলেছেন :

মম হৃদয়-রক্ত রঞ্জনে, তব
চরণ দিয়েছি রাঙিয়া,
অয়ি সন্ধ্যা-স্বপন-বিহারী।
তব অধর এঁকেছি সুধাবিষে মিশে
মম সুখদুখ ভাঙিয়া ;
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম বিজন-জীবন-বিহারী।

আশি বছর বয়সে, 'সানাই' কাব্যগ্রন্থের 'মানসী' কবিতায়ও কবি বলেছেন :

বাস্তব মোরে বঞ্চনা করে
পালায় চকিত নৃত্যে—
তারি ছায়া যবে রূপ ধরি আসে
বাঁধা পড়ি যায় চিত্তে।
তারার আলোকে ভরে সেই সাকী
মদিরোচ্ছল পাত্র,
নিবিড় রাতের মুগ্ধ মিলনে
নাই বিচ্ছেদ মাত্র।[৫৯]

বাস্তব জীবনে যে পলাতকা, তারই ছায়া যখন কবিমানসে মূর্তিমতী হয়ে ওঠে তখনই এই মানসী বিচ্ছেদহীন চিরমিলনের সূত্রে বাঁধা পড়ে। 'মানসী' কাব্যগ্রন্থেও মৃত্যুর বিচ্ছেদ-ব্যবধানকে তুচ্ছ করে কাদম্বরী দেবীর মানসীমূর্তির সঙ্গে কবিমানসের বিরহ-মিলন-লীলার রহস্যময় কাহিনী অভিব্যক্ত হয়েছে। কবির ধ্যানতন্ময়তায় মানসী বাস্তবীরূপে প্রেমের বিচিত্র আস্বাদনের আলম্বন-স্বরূপিণী হয়েছেন।

'সাধনা' পত্রিকায় ১৩০২ সালের ভাদ্র মাসে 'অপূর্ব রামায়ণ' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'পঞ্চভূতে'র অন্তর্ভুক্ত এই প্রবন্ধটি 'মানসী'র কাব্য আস্বাদনে বিশেষ সহায়ক হবে। 'অপূর্ব রামায়ণে' রবীন্দ্রনাথ বলছেন :

"জগৎরচনাকে যদি কাব্য হিসাবে দেখা যায় তবে মৃত্যুই তাহার সেই প্রধান রস, মৃত্যুই তাহাকে যথার্থ কবিত্ব অর্পণ করিয়াছে।

*　　　　*　　　　*

"যেদিকে মৃত্যু সেই দিকেই জগতের অসীমতা। সেই অনন্ত রহস্যভূমির দিকেই মানুষের সমস্ত কবিতা, সমস্ত সংগীত, সমস্ত ধর্মতন্ত্র, সমস্ত তৃপ্তিহীন বাসনা সমুদ্রপারগামী পক্ষীর মতো নীড় অন্বেষণে উড়িয়া চলিয়াছে।

*　　　　*　　　　*

"সাহিত্য সংগীত এবং সমস্ত ললিতকলা, মনুষ্যহৃদয়ের সমস্ত নিত্যপদার্থকে মৃত্যুর পরকালপ্রান্ত হইতে ইহজীবনের মাঝখানে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। বলিতেছে, পৃথিবীকে স্বর্গ, বাস্তবকে সুন্দর এবং এই ক্ষণিক জীবনকেই অমর করিতে হইবে।"[৬০]

মৃত্যুর সঙ্গে কাব্য ও ললিতকলার এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে প্রবন্ধের উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপূর্ব-রামায়ণ-কথা অনবদ্য ভাষায় বর্ণনা করে বলেছেন :

"রাজা রামচন্দ্র— অর্থাৎ মানুষ— প্রেম নামক সীতাকে নানা রাক্ষসের হাত হইতে রক্ষা করিয়া আনিয়া নিজের অযোধ্যাপুরীতে পরমসুখে বাস করিতেছিলেন। এমন সময় কতকগুলি ধর্মশাস্ত্র দল বাঁধিয়া এই প্রেমের নামে কলঙ্ক রটনা করিয়া দিল। বলিল, উনি অনিত্য পদার্থের সহিত একত্র বাস করিয়াছেন, উঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। বাস্তবিক অনিত্যের ঘরে রুদ্ধ থাকিয়াও এই দেবাংশজাত রাজকুমারীকে যে কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারে নাই সে-কথা এখন কে প্রমাণ করিবে? এক, অগ্নিপরীক্ষা আছে, সে তো দেখা হইয়াছে— অগ্নিতে ইহাকে নষ্ট না করিয়া আরও উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে। তবু শাস্ত্রের কানাকানিতে অবশেষে এই রাজা প্রেমকে একদিন মৃত্যুতমসার তীরে নির্বাসিত করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে মহাকবি এবং

তাঁহার শিষ্যবৃন্দের আশ্রয়ে থাকিয়া এই অনাথিনী, কুশ ও লব, কাব্য এবং ললিতকলা নামক যুগল-সন্তান প্রসব করিয়াছেন। সেই দুটি শিশুই কবির কাছে রাগিণী শিক্ষা করিয়া রাজসভায় আজ তাহাদের পরিত্যক্তা জননীর যশোগান করিতে আসিয়াছে। এই নবীন গায়কের গানে বিরহী রাজার চিত্ত চঞ্চল এবং তাঁহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এখনও উত্তরকাণ্ড সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই। এখনও দেখিবার আছে— জয় হয় ত্যাগপ্রচারক প্রবীণ বৈরাগ্যধর্মের, না, প্রেমমঙ্গল-গায়ক দুটি অমর শিশুর।"[৬১]

রবীন্দ্রজীবনে উত্তরকাণ্ড সম্পূর্ণ শেষ হবার পর দেখা গেছে, প্রেমমঙ্গল-গায়ক দুটি অমর শিশুরই জয় হয়েছে। কিন্তু মানসীর যুগে ত্যাগপ্রচারক প্রবীণ বৈরাগ্যধর্মের সঙ্গে প্রেমমঙ্গল-গায়ক দুটি অমর শিশুর দ্বন্দ্ব পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান ছিল।

প্রমথ চৌধুরীকে লেখা সেই যুগের একখানি চিঠি এই বিষয়ে আলোকপাত করবে। প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন, 'মানসী'তে "একটা despair এবং resignation-এর ভাব প্রবল"। তারই হেতু বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কবি বলছেন :

"...এক-একবার মনে হয় আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চলছে। একটা আমাকে সর্বদা বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করছে, আর-একটা আমাকে কিছুতে বিশ্রাম করতে দিচ্ছে না। আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করছে— সেইজন্যে এক দিকে বেদনা আর-এক দিকে বৈরাগ্য।"...[৬২]

২৬

এই বেদনা ও বৈরাগ্যের আলো-আঁধারি-লীলা 'মানসী'র ব্যক্তিগত প্রেমের কবিতাগুলিতে সুপরিস্ফুট। মৃত্যুজনিত বিরহ, এবং বিরহের আত্যন্তিকতায় স্বপ্ন ও সত্যের ব্যবধান-বিলুপ্ত-করা মিলনাকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষাপট রচনা করেছে উদ্দীপনাময়ী বর্ষাপ্রকৃতি। 'বর্ষার দিনে' কবিতাটি তাই সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য। রামগিরিতে নির্বাসিত অলকানিবাসী যক্ষ আষাঢ়ের প্রথম দিনে আকাশে মেঘসঞ্চার হতে দেখে তার বিরহিণী প্রিয়ার কথা স্মরণ করে বিচলিত হয়েছিল।

অনুরূপ অনুভূতি বিরহী রবীন্দ্রচিত্তকেও একদা বিচলিত করেছে। সে-যুগের আরেকখানি পত্রে তিনি লিখছেন, "বর্ষাকালে সকল লোকেরই কিছু না কিছু বিরহের দশা উপস্থিত হয়, এমন-কি প্রণয়িনী কাছে থাকলেও হয়, কবি নিজেই লিখেছেন—

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনিজনে, কিংপুনর্দূরসংস্থে।

অর্থাৎ মেঘলা দিনে প্রণয়িনী গলায় লেগে থাকলেও সুখী লোকের মন উদাসীন হয়ে যায়, দূরে থাকলে তো কথাই নেই।"...৬৩

এই বর্ষা-বিরহই 'বর্ষার দিনে' কবিতার উপজীব্য। কবি বলছেন—

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায়।
এমন মেঘস্বরে বাদল-ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়।

সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জন চারি ধার।
দুজনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখী,
আকাশে জল ঝরে অনিবার।
জগতে কেহ যেন নাহি আর।

সপ্তমাত্রিক ধ্বনিপ্রধান ছন্দে গ্রথিত এই কবিতাটিতে কবিচিত্তের কুণ্ডলীকৃত বিরহবেদনা গুমরে গুমরে উঠেছে। এই ছন্দই প্রাকৃত ভাষার মন্দাক্রান্তা ছন্দ। বিদ্যাপতিও রাধা-বিরহকে এই ছন্দেই একদিন ভাষা দিয়েছিলেন।

আলোচ্য কবিতাটিতে প্রধান লক্ষ্য করবার বিষয় হল এই যে, এখানে কবি আর তাঁর মানসী "দুজনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখী।" অথচ এই কবিতায় কবির মিলনাকাঙ্ক্ষার পাত্রী যে তাঁর স্বকীয়া প্রেয়সী নন তার আভাস বহন করছে নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিমিথুনগুলি :

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব।

* * *

বলিতে বাজিবে না নিজ কানে,
চমক লাগিবে না নিজ প্রাণে।

* * *

তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার,
নামাতে পারি যদি মনোভার

* * *

আছে তো তার পরে বারো মাস—
উঠিবে কত কথা, কত হাস।

* * *

যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়

বলাই বাহুল্য, সার্থক সাধারণীকৃতির ফলে এ কবিতায় কবির বিশেষ বিরহবেদনা সকল মানুষের নির্বিশেষ বিরহে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু তবু এ জীবনে যে কথা বলা গেল না, মৃত্যুর ব্যবধানে দাঁড়িয়ে সেই কথাটি বলবার লগ্ন এনে দিয়েছে বর্ষণমুখরিত 'তপনহীন ঘন তমসা'। তাই "এই বর্ষার অপরাহ্নে ক্ষুদ্র আত্মকোটরের মধ্যে অবরুদ্ধ" বন্দী "সৌন্দর্যের স্বাধীনতাক্ষেত্রে মুক্তি" পেয়েছে।[৬৪] মৃত্যুর অনুশাসন লঙ্ঘন করে দুটি হৃদয় মুখোমুখি এসে বসেছে। সমাজ-সংসার হয়ে উঠেছে মিথ্যে। অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করার এই সঞ্জীবনী-মন্ত্রেই 'মানসী'র বিরহসংগীত অভিমান-ভরা মিলনমাধুর্যে মধুস্বাদী হয়ে উঠেছে।

২৭

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুদিন হল ৮ই বৈশাখ। তাঁর মৃত্যুর পর প্রতি বৎসর বৈশাখের এই দিনগুলি কবিচিত্তের হাহাকারে ভরে উঠত। অতীতের নানা স্মৃতি উদ্দীপন-বিভাব-রূপে কবিচিত্তে ক্রিয়াশীল হত। এই মৃত্যুর ন-বৎসর পরে (৩০ এপ্রিল ১৮৯৩) ইন্দিরা দেবীকে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "পুরোনো স্মৃতিগুলো মদের মতো— যত বেশিদিন মনের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে থাকে, ততই তার বর্ণ এবং স্বাদ এবং নেশা যেন মধুর হয়ে আসে।… বুড়ো বয়সে…জ্যোৎস্নারাত্রের স্থির জলাশয়ের মতো আমাদের অচঞ্চল মনে

পূর্বস্মৃতির ছায়া এমনি পরিষ্কার স্পষ্টভাবে পড়ে যে বর্তমান ব্যাপারের সঙ্গে তার প্রভেদ বোঝা শক্ত।”[৬৫]

এই চিঠিও বৈশাখ মাসের ১৪/১৫ তারিখে লেখা। এর থেকে কবির মানসরহস্য সম্পর্কে দুটি সূত্র পাওয়া যাচ্ছে। প্রথম : পুরনো স্মৃতিগুলো যত বেশিদিন মনের মধ্যে সঞ্চিত হতে থাকে ততই, কবির মনে হয়েছে, তার বর্ণ এবং স্বাদ এবং নেশা মধুরতর হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় : বুড়ো বয়সে মনের দর্পণে স্মৃতির ছায়া এমন পরিষ্কার স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বর্তমান ব্যাপারের সঙ্গে তার প্রভেদ বোঝা শক্ত হয়।

মানসীর ব্যক্তিগত প্রেমের কবিতাগুলির অর্থোদ্ধারের সময় এই দুটি সূত্রের কথা মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন। আরেকটি কথাও এইসঙ্গে মনে রাখতে হবে। কবি তাঁর মানসীর সঙ্গে এমনভাবে মান-অভিমান করছেন যেন মনে হয় দুজনে মুখোমুখি বসে আছেন। এই অপূর্ব 'ভাবসম্মিলনের'র কথা বলতে গিয়ে আমরা প্রথম খণ্ডে বলেছি, কবির এই অনুভূতি উত্তররামচরিতের কবি-কল্পনাকেও হার মানিয়েছে। 'মেঘদূতে'র কবি বলেছিলেন, প্রেমাবিষ্টের চোখে চেতন-অচেতনের ব্যবধান ঘুচে যায়। রবীন্দ্রনাথের চেতনায় সম্ভব-অসম্ভবের ব্যবধানও যেন ঘুচে গেছে। অতীত-বর্তমানে ভাগ-করা কালপরিধির গণ্ডি হয়েছে বিলুপ্ত, ইহলোক ও পরলোকের সীমান্তরেখা গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে।[৬৬]

'মানসী'র যে কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনা প্রত্যক্ষ- বা পরোক্ষ-ভাবে ভাষা পেয়েছে সেই কবিতাগুলিকে কালানুক্রম অনুসারে পুনর্বিন্যস্ত করলে কবিমানসে বিলসিত বিরহমিলন-লীলাকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করা সহজতর হবে।—

পত্র	১৮৮৭	বৈশাখ
ভুলে		”
ভুল-ভাঙা		”
বিরহানন্দ		জ্যৈষ্ঠ
শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা		আষাঢ়
নিষ্ফল কামনা		১৩ অগ্রহায়ণ
বিচ্ছেদের শান্তি		১৪ ”

সংশয়ের আবেগ		১৫	অগ্রহায়ণ
তবু			
নিষ্ফল প্রয়াস		১৮	
হৃদয়ের ধন			
নিভৃত আশ্রম			
নারীর উক্তি		২১	„
পুরুষের উক্তি		২৩	„
শূন্য গৃহে	১৮৮৮	১১	বৈশাখ
নিষ্ঠুর সৃষ্টি		১৩	„
জীবনমধ্যাহ্ন		১৪	„
শ্রান্তি		১৬	„
বিচ্ছেদ		১৯	„
আকাঙ্ক্ষা		২০	„
মানসিক অভিসার		২১	„
একাল ও সেকাল		২২	বৈশাখ
পত্রের প্রত্যাশা		২৩	„
সুরদাসের প্রার্থনা		২৩	
প্রকাশ-বেদনা	১৮৮৯	৬	বৈশাখ
মায়া		১	জ্যৈষ্ঠ
বর্ষার দিনে		৩	„
মেঘের খেলা		৭	„
ভালো করে বলে যাও		„	„
ধ্যান		২৬	শ্রাবণ
পূর্বকালে		২	ভাদ্র
অনন্ত প্রেম		„	„
ক্ষণিক মিলন		৯	„
আত্মসমর্পণ		১১	„
আশঙ্কা		১৪	„
উপহার	১৮৯০	৩০	বৈশাখ

মেঘদূত	৮ জ্যৈষ্ঠ
অহল্যার প্রতি	১২ „
উচ্ছৃঙ্খল	৫ ভাদ্র
বিদায়	আশ্বিন
সন্ধ্যায়	৭ কার্তিক
মৌন ভাষা	১০ „

২৮

১৮৮৭ সনের কবিতাবলীর প্রথমে রয়েছে বৈশাখ মাসে বন্ধুবর শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা একখানি 'পত্র'। 'কড়ি ও কোমলে'র আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি, দু-বছর আগে শ্রীশচন্দ্রের সহযোগে রবীন্দ্রনাথ 'পদরত্নাবলী' প্রকাশ করেন (বৈশাখ ১২৯২)। স্বভাবতই এই পত্রে বৈষ্ণব কবিকে অনুসরণ করে কবি তাঁর নিজের বিরহব্যথাকে ভাষা দিয়ে বলছেন :

শ্যামল তমালতল, নীল যমুনার জল,
আর দুটি ছলছল্ নলিননয়ন।
এ ভরা বাদর-দিনে কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে!
কাননের পথ চিনে মন যেতে চায়।
বিজন যমুনাকূলে বিকশিত নীপমূলে
কাঁদিয়া পরান বুলে বিরহব্যথায়।

অন্তরে এই বিরহব্যথা নিয়ে কবিমানস অভিসারে বেরিয়েছে তার মানসীর উদ্দেশে। 'পদাঙ্কদূতে'র কবি বলেছিলেন :

অত্রৈবাস্তে মুররিপুরিতি ভ্রান্তিদূতীসহায়া
ত্যক্ত্বা গেহং ঝটিতি যমুনা-মঞ্জু-কুঞ্জং জগাম।

এখানেই কৃষ্ণ আছেন এই ভেবে বিরহিণী রাধা গৃহ পরিত্যাগ করে সত্বর যমুনার মঞ্জু কুঞ্জে গমন করলেন। এই অভিসারে ভ্রান্তিদূতীই তাঁর সহায় হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মানস-অভিসারেও ভ্রান্তিদূতীই তাঁর সহায়। বৈশাখের এই দিনগুলিতে তাঁর মন ফিরে আসে জোড়াসাঁকোর প্রাসাদমালায়। ওর একটি রুদ্ধগৃহ কবিমানসীর স্মৃতি বুকে নিয়ে বিধবার মতো বসে আছে। তারই

আশেপাশে কবির মন ঘুরে বেড়ায়। কবি ভুলে গিয়েছেন যাঁর আহ্বানে এখানে আসা তিনি আর নেই। তাই ভ্রান্তিবশেই বলছেন :

কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া,
এসেছি ভুলে।
তবু একবার চাও মুখপানে
নয়ন তুলে।

* * *

বেলকুঁড়ি দুটি করে ফুটি-ফুটি
অধর-খোলা।
মনে পড়ে গেল সেকালের সেই
কুসুম তোলা।

* * *

সেদিন যে গেছে ভুলে গেছি, তাই
এসেছি ভুলে।

* * *

শুধু মনে পড়ে হাসিমুখখানি
লাজে বাধো-বাধো সোহাগের বাণী,
মনে পড়ে সেই হৃদয়-উছাস
নয়নকূলে।
তুমি যে ভুলেছ ভুলে গেছি, তাই
এসেছি ভুলে।

কাননের ফুল এরা তো ভোলে নি,
আমরা ভুলি!

* * *

চাঁপা কোথা হতে এনেছে ধরিয়া
অরুণকিরণ কোমল করিয়া,
বকুল ঝরিয়া মরিবারে চায়
কাহার চুলে!

কেহ ভোলে কেউ ভোলে না যে, তাই
এসেছি ভুলে।

কিন্তু এই স্বপ্ন ও মায়ায় বিজড়িত ভুল ভাঙতেও বিলম্ব হয় না। তাই 'ভুল-ভাঙা' কবিতায় কবি বলেন :

বুঝেছি আমার নিশার স্বপন
হয়েছে ভোর।
মালা ছিল, তার ফুলগুলি গেছে,
রয়েছে ডোর।

* * *

বসন্ত নাহি এ ধরার আর
আগের মতো,
জ্যোৎস্নাযামিনী যৌবনহারা,
জীবনহত।

* * *

বাঁশি বেজেছিল, ধরা দিনু যেই
থামিল বাঁশি।
এখন কেবল চরণে শিকল
কঠিন-ফাঁসি।

তাই কবির মনে হয়েছে, ভ্রান্তিবশে মিলনের প্রত্যাশায় 'বিরহ-তপোবন' পরিত্যাগ করে আসা তাঁর ভালো হয় নি। 'ভুলে' ও 'ভুল-ভাঙা' কবিতার কয়েকদিন পরে, জ্যৈষ্ঠ মাসে লেখা 'বিরহানন্দ' কবিতায় কবি বলছেন, ত্রিভুবন-তন্ময়-করা বিরহই তাঁর ভালো ছিল। বিরহের ধ্যানে আকাশ-ভুবনে তিনি তাঁর মানসীর সঙ্গ লাভ করেছেন :

আকাশে চাহিতাম গাহিতাম একাকী,
মনের যত কথা ছিল সেথা লেখা কি!
দিবসনিশি ধ'রে ধ্যান ক'রে তাহারে
নীলিমাপরপার পাব তার দেখা কি!
তটিনী অনুখন ছোটে কোন্ পাথারে,
আমি যে গান গাই তারি ঠাঁই শেখা কি!

বিরহে তারি নাম শুনিতাম পবনে,
তাহারি সাথে থাকা মেঘে-ঢাকা ভবনে

মুকুল সুকুমার যেন তার পরশে,
চাঁদের চোখে ক্ষুধা তারি সুধা স্বপনে।

বিরহের এই ধ্যানতন্ময়তার ফলে এই কবিতায় 'সে' কখন কবির অগোচরে 'তুমি' হয়ে উঠেছে তা কবিও যেন বুঝতে পারেন নি। এই 'তুমি'র স্বপ্নে কবির দিনরাত্রি কিভাবে কাটত তার কথায় তিনি বলেছেন :

সারাটা দিনমান রচি গান কত-না,
তোমারি পাশে রহি যেন কহি বেদনা।

* * *

কখনো সারা রাত ধরি হাত দুখানি
রহি গো বেশবাসে কেশপাশে মরিয়া।

মানসীর মিলনপ্রত্যাশার দাবানলে এই বিরহ-তপোবন দগ্ধ হয়েছে মনে করে কবিচিত্ত হাহাকার করে উঠেছে :

বিরহ সুমধুর হল দূর কেন রে!
মিলন দাবানলে গেল জ্বলে যেন রে।

কিন্তু এই চিন্তাও তো ভ্রান্ত। মিলনের স্বপ্ন বুকে বয়ে বেড়ায় বলেই তো বিরহ সুমধুর হয়ে ওঠে! তাই আষাঢ় মাসে 'শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা'য় কবি গেয়ে ওঠেন :

আবার মোরে পাগল ক'রে
দিবে কে!

কেন না-

অনেক দিন পরানহীন
ধরণী
বসনাবৃত খাঁচার মতো
তামসঘনবরনী।

জীবন চলে আঁধার জলে
আলোকহীন তরণী।
অনেক দিন পরানহীন
ধরণী।

তাই কবি "বিরাগ-ভরা বিবেকে" পাষাণের মতো হৃদয় নিয়ে কাপড়ঢাকা অন্ধকার খাঁচায় আবদ্ধ পাখির মতো নিষ্প্রাণ জীবন যাপনে জর্জরিত হয়ে বলছেন, "আবার মোরে পাগল ক'রে দিবে কে!" কেন না একবার তার সোনার কাঠির স্পর্শেই মায়া-কারায় বিভোর ঘুমের শিকলি কেটে 'জগত-জাগা জাগরণ'

২৯

১৮৮৭ সনে আর-একগুচ্ছ কবিতা কবি লিখলেন অগ্রহায়ণ মাসে। নিষ্ফল কামনা, বিচ্ছেদের শান্তি, সংশয়ের আবেগ, তবু, নিষ্ফল প্রয়াস, হৃদয়ের ধন, নিভৃত আশ্রম, নারীর উক্তি, পুরুষের উক্তি।

এ সব কবিতায় বিরহবিদ্ধ কবিচিত্তের বিশুদ্ধ আবেগের প্রকাশ অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে মননসঞ্জাত তত্ত্বচিন্তাও অশ্রুসিন্ধুর বুকে হঠাৎ-ভেসে-ওঠা শ্যামল দ্বীপের মতো এখানে-সেখানে দেখা দিয়েছে। 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটি এই শ্রেণীর একটি অবিস্মরণীয় কবিতা। বিরহের বহ্নিজ্বালায় দগ্ধ হয়ে কবি যে-সত্যে উপনীত হয়েছেন তার প্রথম কাব্যরূপ হল 'নিষ্ফল কামনা'। আমরা 'মানসী' আলোচনার উপসংহারে এই কাব্যে প্রকাশিত প্রেমতত্ত্বের বিচারপ্রসঙ্গে কবিতাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করব।

'নিষ্ফল কামনা'র পরদিন লেখা 'বিচ্ছেদের শান্তি'। কবি বলছেন, "সেই ভালো, তবে তুমি যাও।" কেন না, কাছে থেকে "পলে পলে প্রেমের মরণ" দেখার চেয়ে বিস্মৃতিও সহস্রগুণে কাম্য :

আমি রহি এক ধারে, তুমি যাও পরপারে,
মাঝখানে রহুক বিস্মৃতি।
একেবারে ভুলে যেয়ো, শতগুণে ভালো সেও—
ভালো নয় প্রেমের বিকৃতি।

প্রেমের বিকৃতির চেয়ে প্রেমের বিস্মৃতিও বরং ভালো। এই চেতনারই পরিপূরক কবিতা হল 'তবু'। 'তবু' বিশুদ্ধ শেক্‌স্‌পীরীয় রীতির একটি সার্থক সনেট। আগের দিন লেখা 'বিচ্ছেদের শান্তি' কবিতায় কবি বলেছিলেন, পলে পলে প্রেমের মরণ দেখার চেয়ে একেবারে ভুলে যাওয়াও ভালো। কিন্তু 'তবু' কবিতায় কবি ঠিক উলটো কথা বলেছেন। বলছেন, পুরাতন প্রেম যদি একদিন দূরস্মৃত কাহিনীমাত্রে পর্যবসিত হয়, যদি সেই স্মৃতি জাগ্রত হলে চোখের কোণে একবিন্দু অশ্রুও দেখা না দেয়, 'তবু মনে রেখো'। এই সনেটটিতে বোধ হয় বিপ্রলব্ধ প্রেমের চূড়ান্ত প্রার্থনা কবিকণ্ঠে ভাষা পেয়েছে :

তবু মনে রেখো, যদি মনে প'ড়ে আর
আঁখিপ্রান্তে দেখা নাহি দেয় অশ্রুধার।

এই সনেটটি যে রবীন্দ্রনাথের বিরহী-চিত্তের মর্মলোক নির্বারিত করেছে— তার নিঃসংশয় প্রমাণ হিসাবে বলা যায় যে, এই সনেটটিকে কবি একটি গানের সুরে অমর করে রেখেছেন। এবং তাঁর শেষজীবনেও 'তবু মনে রেখো' গানটি কবির বোধ করি সবচেয়ে প্রিয় গানের অন্যতম ছিল। উত্তীর্ণপ্রৌঢ়ত্বে কবির কণ্ঠে যখন সুর হারিয়ে গেছে তখনও তিনি পুরনো দিনের যে-সব গান প্রায়ই গাইতেন, 'তবু মনে রেখো' তাদেরই একটি।

ভাবতে বিস্ময় লাগে কবি যেদিন 'তুমি' লিখেছেন সেদিনই লিখেছেন 'সংশয়ের আবেগ'। 'মানসী'র অনেক কবিতাই অস্ফুট আকারে পরবর্তী কাব্য 'সোনার তরী'-'চিত্রা'র বহু বিখ্যাত কবিতার ভাববীজ বক্ষে ধারণ করে আছে। 'সংশয়ের আবেগ' এমনি একটি কবিতা। কবি তাঁর মানসীকে সম্বোধন করে বলেছেন, "ভালোবাস কি না বাস বুঝিতে পারি নে, / তাই কাছে থাকি।" প্রেমিক-কবি তাঁর 'সর্বগ্রাসী' চোখ মেলে মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন, তাঁর মনের সংশয় বিদূরিত করার মতো সেখানে কোনো উত্তর খুঁজে পান কিনা। তৃতীয় স্তবকে বলছেন :

জানি যদি ভালোবাস চির-ভালোবাসা,
জনমে বিশ্বাস—
যেথা তুমি যেতে বল সেথা যেতে পারি,
ফেলি নে নিশ্বাস।

তরঙ্গিত এ হৃদয়, তরঙ্গিত সমুদয়
বিশ্বচরাচর
মুহূর্তে হইবে শান্ত, টলমল প্রাণ
পাইবে নির্ভর।

বলাই বাহুল্য, এই স্তবকটি সোনার তরীর 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতাটির পূর্বাভাস বহন করে আনছে। চতুর্থ স্তবকে মানসী কবির 'হৃদয়দেবতা' হয়ে উঠেছেন। বিক্ষুব্ধ হৃদয়তরঙ্গ শান্ত হলে পরম নির্ভরতায় কবি তাঁর হৃদয়দেবতার চরণে পুষ্প-অর্ঘ্য দিয়ে বাসনার তীব্র জ্বালা থেকে মুক্ত হবেন—

বাসনার তীব্র জ্বালা দূর হয়ে যাবে,
যাবে অভিমান।
হৃদয়-দেবতা হবে, করিব চরণে
পুষ্প-অর্ঘ্য দান।
দিবানিশি অবিরল লয়ে শ্বাস অশ্রুজল
লয়ে হাহুতাশ
চির ক্ষুধাতৃষা লয়ে আঁখির সম্মুখে
করিব না বাস।

এই স্তবকটিতে 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতার ভাববীজ সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে। বাসনার তীব্রজ্বালা দূর হয়ে গেলে বাসনা বিশুদ্ধীভূত প্রেম পথের আলো হয়ে উঠবে :

তোমার প্রেমের ছায়া আমারে ছাড়ায়ে
পড়িবে জগতে,
মধুর আঁখির আলো পড়িবে সতত
সংসারের পথে।

'তবু' সনেটটি রচনার পরে কবি তাঁর তৎকালীন প্রেমচেতনাকে ভাষা দিয়েছেন আরও তিনটি সনেটে। 'নিষ্ফল প্রয়াস', 'হৃদয়ের ধন' এবং 'নিভৃত আশ্রম'। একই দিনে (১৮ অগ্রহায়ণ) এই তিনটি সনেট লেখা। প্রেমচেতনা, সৌন্দর্যচেতনা এবং জীবনদেবতা-চেতনার দ্বন্দ্বসমুখ এই তিনটি সনেট-পরম্পরা রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনার বিবর্তনের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করছে। প্রিয়ার দেহে সৌন্দর্য-সন্ধানের নিষ্ফল প্রয়াস প্রথম দুটি সনেটের বিষয়ালম্বন। যে-

সৌন্দর্যের জন্যে পৃথিবী পাগল হয়েছে, নিজের প্রস্ফুটিত তনুবল্লরীতে নারী নিজে কি সেই সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন ?—

মধুরাতে ফুলপাতে করিয়া শয়ন
বুঝিতে কি পার নিজ মধু-আলিঙ্গন ?

এই দুটি পঙ্‌ক্তিতে কবি প্রশ্নচ্ছলে যে সত্যে উপনীত হয়েছেন, সনেটের শেষ দুটি পঙ্‌ক্তিতে তাই বাণীবদ্ধ হয়েছে—

দেখো শুধু ছায়াখানি মেলিয়া নয়ন ;
রূপ নাহি ধরা দেয়— বৃথা সে প্রয়াস।

দ্বিতীয় সনেটে কবিপ্রেমিকের নিজের মনও এই প্রতীতিকেই সমর্থন করছে। প্রেমিকের আকাঙ্ক্ষা ছিল—

অধরের হাসি লব করিয়া চুম্বন,
নয়নের দৃষ্টি লব নয়নে আঁকিয়া,
কোমল পরশখানি করিয়া বসন
রাখিব দিবসনিশি সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া।

কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই পূর্ণ হবার নয়, তাই কবিতাটির ষট্‌কবন্ধে কবি বলছেন—

নাই, নাই,— কিছু নাই, শুধু অন্বেষণ।
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া।
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে— শ্রান্ত করে হিয়া।
প্রভাতে মলিন মুখে ফিরে যাই গেহে—
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে !

তাই হৃদয়ের ধনকে দেহের মধ্যে পাওয়ার বৃথা চেষ্টা না করে হৃদয়-আসনে প্রতিষ্ঠিত করার ঐকান্তিক আগ্রহই ভাষা পেয়েছে 'নিভৃত আশ্রম' কবিতায়। মানসী-প্রিয়া যে ক্রমশ কবির ধ্যানের দেবতা— তাঁর জীবনদেবতা— হয়ে উঠছেন তারই সাক্ষ্য বহন করছে 'নিভৃত আশ্রম' সনেটটি। এই রচনাটির অপরিসীম গুরুত্বের কথা ভেবে এখানে কবিতাটিকে সমগ্রভাবেই উদ্ধার করছি—

সন্ধ্যায় একেলা বসি বিজন ভবনে

অনুপম জ্যোতির্ময়ী মাধুরীমুরতি
স্থাপনা করিব যত্নে হৃদয়-আসনে।
প্রেমের প্রদীপ লয়ে করিব আরতি।
রাখিয়া দুয়ার রুধি আপনার মনে
তাহার আলোকে রব আপন ছায়ায়,
পাছে কেহ কুতূহলে কৌতুকনয়নে
হৃদয়দুয়ারে এসে দেখে হেসে যায়।
ভ্রমর যেমন থাকে কমলশয়নে,
সৌরভসদনে, কারো পথ নাহি চায়,
পদশব্দ নাহি গণে, কথা নাহি শোনে,
তেমনি হইব মগ্ন পবিত্র মায়ায়।
লোকালয়-মাঝে থাকি রব তপোবনে,
একেলা থেকেও তবু রব সাথি-সনে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তিনটি মিলের মালা গেঁথে কবি এই কাব্যচতুর্দশীর অঙ্গসজ্জা করেছেন। কবিতার ভাব দ্বন্দ্বমুক্ত একটি অখণ্ড সংকল্পকে প্রকাশ করছে বলে অষ্টকবন্ধের পরে পেত্রার্কান সনেটের মতো কোনো আবর্তন-সন্ধি নেই। কবির হৃদয়-আসনে জ্যোতির্ময়ী মাধুরীমূর্তি প্রতিষ্ঠার সংকল্প-বাক্য উচ্চারিত হয়েছে এই কবিতায়। কবি প্রেমের প্রদীপ নিয়েই সেই দেবী-প্রতিমার আরতি করবেন। কমলশয়নে নিষণ্ণ ভ্রমরই হয়েছে কবিমানসের সার্থক উপমান। কমলদলে আবদ্ধ ভ্রমরের মতোই তিনি সৌরভসদনের পবিত্র মায়ায় নিমগ্ন হবেন। লোকালয়ের মধ্যেই রচিত হবে তাঁর প্রেমের তপোবন। সেখানে "একেলা থেকেও তবু রব সাথি-সনে।" শেষ সংকল্প-বাক্যটি কবির সারাজীবনের নিঃসঙ্গ ধ্যানতন্ময়তারই পূর্বাভাস।

৩০

১৮৮৮ সনের বৈশাখের কবিতা শুরু হয়েছে 'শূন্য গৃহে' কবিচিত্তের হাহাকার দিয়ে। স্রষ্টার কাছে দুরন্ত অভিমান-ভরা জিজ্ঞাসাই কবিতাটির মর্মবাণী—

কে তুমি দিয়েছ স্নেহ মানব-হৃদয়ে,
কে তুমি দিয়েছ প্রিয়জন!
বিরহের অন্ধকারে কে তুমি কাঁদাও তারে,
তুমিও কেন গো সাথে কর না ক্রন্দন

* * *

কাল ছিল প্রাণ জুড়ে, আজ কাছে নাই—
নিতান্ত সামান্য এ কি নাথ?
তোমার বিচিত্র ভবে কত আছে কত হবে,
কোথায় কি আছে, প্রভু, হেন বজ্রপাত?

এই বজ্রপাতের আঘাত বুকে নিয়ে কবিমানসে বিচিত্র ভাবনা-বাসনা বিলসিত হচ্ছে। তারই কাব্যরূপ হল— নিষ্ঠুর সৃষ্টি, জীবনমধ্যাহ্ন, শ্রান্তি, বিচ্ছেদ, আকাঙ্ক্ষা। একুশে বৈশাখ লিখলেন 'মানসিক অভিসার' কবিতাটি। বিরহী কবি কল্পনা করছেন, তাঁর মানসীও তাঁরই সঙ্গে মিলনের প্রত্যাশায় মানসিক অভিসারে বেরিয়েছেন।—

ত্যজি তার তনুখানি, কোমল হৃদয়
বাহির হয়েছে যেন দীর্ঘ অভিসারে;
সম্মুখে অপার ধরা কঠিন নিদয়;
একাকিনী দাঁড়ায়েছে তাহারি মাঝারে।

হয়তো বা এখনি সে এসেছে হেথায়
মৃদুপদে পশিতেছে এই বাতায়নে;
মানসমুরতিখানি আকুল আমায়
বাঁধিতেছে দেহহীন স্বপ্ন-আলিঙ্গনে।

তারি ভালোবাসা, তারি বাহু সুকোমল,
উৎকণ্ঠ চকোরসম বিরহতিয়াষ,
বহিয়া আনিছে এই পুষ্পপরিমল—
কাঁদায়ে তুলিছে এই বসন্তবাতাস।

বৈশাখের এই বিরহবিলাপ, এই মিলনাকাঙ্ক্ষা কিন্তু জ্যৈষ্ঠের রুদ্রবহ্নিতে দগ্ধ

হয়ে জলদর্চিতনু তপস্যার মূর্তিতে দেখা দিয়েছে। কবি লিখেছেন 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতাটি ১৮৮৮ সনের কবিতা-গুচ্ছের সর্বশেষে লেখা হয়েছে সুরদাসের প্রার্থনা এই কবিতায় কবির প্রেমচেতনা জীবনদেবতা-চেতনায় উন্নীত হয়েছে।

১৮৮৯ সনের কবিতাগুলি ক্রমশ ব্যক্তিসীমাকে পেরিয়ে অসীমের কোটিকে স্পর্শ করে চলেছে। দেখা দিয়েছে 'অনন্ত প্রেমে'র স্বপ্ন। কিন্তু এই নৈর্ব্যক্তিক সীমাহীনতায়ও কবির বিশুদ্ধীভূত প্রেমচেতনা তাঁর হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিতা জীবনদেবতারূপিণী মানসীর ধ্যাননিমগ্নতাকেই ভাস্বর করে রেখেছে। 'ধ্যান' কবিতায় কবি বলছেন :

নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া
স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া
বরণ করি—
তুমি আছ মোর জীবন মরণ
হরণ করি।

তোমার পাইনে কূল,
আপনা মাঝারে আপনার প্রেম
তাহারো পাইনে তুল।

* *

তুমি যেন এই আকাশ উদার,
আমি যেন এই অসীম পাথার,
আকুল করেছে মাঝখানে তার
আনন্দপূর্ণিমা।
তুমি প্রশান্ত চিরনিশিদিন—
আমি অশান্ত, বিরামবিহীন,
চঞ্চল অনিবার—
যত দূর হেরি দিগ্‌দিগন্তে
তুমি আমি একাকার।

এই 'তুমি-আমি-একাকার'-করা ধ্যানের মন্ত্রেই কবিমানসী ক্রমশ কবির জীবনদেবতার রূপ পরিগ্রহ করেছেন।

আমি এ কেবল মিছে বলি,
শুধু আপনার মন ছলি।
কঠিন বচন শুনায়ে তোমারে
আপন মর্মে জ্বলি।
থাক্ তবে থাক্ ক্ষীণ প্রতারণা,
কী হবে লুকায়ে বাসনা বেদনা,
যেমন আমার হৃদয়-পরান
তেমনি দেখাব খুলি।

বলাই বাহুল্য, কবিতার প্রারম্ভে অভিব্যক্ত এই একান্ত-ব্যক্তিগত সুরটি কবিতার উৎস সম্পর্কে পাঠকচিত্তের প্রতীতিকে সমস্ত সংশয় থেকে মুক্তিদান করে। কবি বলছেন :

আমি মনে করি যাই দূরে,
তুমি রয়েছ বিশ্ব জুড়ে।
যত দূরে যাই ততই তোমার
কাছাকাছি ফিরি ঘুরে।
চোখে চোখে থেকে কাছে নহ তবু,
দূরেতে থেকেও দূর নহ কভু,
সৃষ্টি ব্যাপিয়া রয়েছ তবুও
আপন অন্তঃপুরে।

এই স্তবকটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 'চিত্রা'র নাম-কবিতাটির কথা অনিবার্যভাবে পাঠকের মনে পড়বে :

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে,
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
* *
অন্তর মাঝে তুমি শুধু এক একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।

এই দুটি কবিতা একসঙ্গে মিলিয়ে পড়লে এই বিশ্বাস অবশ্যম্ভূত হয়ে পড়ে যে,

ছুটি কবিতার 'তুমি' একই নারী ; কেবল তফাত এই যে, প্রথম কবিতায় সেই নারীসত্তার বিশেষ রূপটি হারিয়ে যায় নি, কিন্তু দ্বিতীয় কবিতায় তিনি নির্বিশেষ রূপেই উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছেন। 'আত্মসমর্পণে'র অন্তিম স্তবকে কবিপ্রেমিক বলছেন :

> তবে লুকাব না আমি আর
> এই ব্যথিত হৃদয়ভার।
> আপনার হাতে চাব না রাখিতে
> আপনার অধিকার।
> বাঁচিলাম প্রাণে তেয়াগিয়া লাজ,
> বদ্ধ বেদনা ছাড়া পেল আজ,
> আশা-নিরাশায় তোমারি যে আমি
> জানাইনু শতবার।

মানসীর কাছে কবির এই আত্মনিবেদন একদিকে যেমন তাঁর প্রেমচেতনার ঐকান্তিক অনুরক্তিকেই প্রকাশ করছে, অন্যদিকে তেমনি, কবিভক্তের চিত্তে দেবীপ্রতিমা-প্রতিষ্ঠার ইতিহাসকেও উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছে।

৩১

'মানসী'র শেষ কবিতাগুচ্ছ রচিত হয়েছে ১৮৯০ সনে। 'উপহার', 'মেঘদূত', 'অহল্যার প্রতি', 'উচ্ছৃঙ্খল', 'বিদায়', 'সন্ধ্যায়' ও 'মৌন ভাষা'—এই কবিতাসপ্তক দিয়ে মানসীর শেষ সপ্তপদী সমাপ্ত হয়েছে। 'উপহার' কবিতাটি 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের উপহার। প্রথম খণ্ডে আমরা বলেছি কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশে ওটি রবীন্দ্রনাথের নবম গ্রন্থোৎসর্গ।[৬৭] ওতে কবিমানসে বহির্ভুবন আর অন্তর্ভুবনের মিলনে প্রেমচেতনার প্রস্ফুরণের রসরহস্যটি ধরা পড়েছে। বহির্বিশ্বে রয়েছে 'কত গন্ধ গান দৃশ্য'। এরা যেন 'সঙ্গীহারা সৌন্দর্য'। সেই সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের ব্যথাভরা কান্না কবিহৃদয়ের দ্বারে এসে তার 'মোহ মন্ত্র-গানে' 'কবির গভীর প্রাণে' 'বিরহী ভাবনা'কে উজ্জীবিত করে তোলে। তারই ফলে কবির 'মূর্তিমতী মর্মের কামনা' অন্তঃপুরবাস ছেড়ে 'সলজ্জ চরণে' আসে বেরিয়ে। অন্তর-বাহিরের সেই ব্যাকুলিত মিলনেই 'কবির একান্ত সুখোচ্ছ্বাস।'

সেই আনন্দ-মুহূর্তগুলিকেই কবি বলছেন, তাঁর 'সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ'। সেই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশকেই কবি তুলে দিচ্ছেন তাঁর মানসলোকনিবাসিনী মানসসুন্দরীর করকমলে। এই 'উপহার' কবিতাটি শুধু 'মানসী' কাব্য-গ্রন্থেরই ভূমিকা নয়, মানসীর উদ্দেশে কবির সারা জীবনের প্রেমনিবেদনেরও ভূমিকা।

'মেঘদূত' আর 'অহল্যার প্রতি কবিতাযুগলে প্রেমচেতনা পরোক্ষভাবে ক্রিয়াশীল। কালিদাসের মেঘদূত রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় কাব্য। মেঘদূতের বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথের বহু গদ্য-পদ্য রচনার আলম্বন। তার মধ্যে 'মানসী'র 'মেঘদূত' কবিতা এবং 'প্রাচীন সাহিত্যে'র 'মেঘদূত' প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দুটি রচনার মধ্যে কবির ভাব ও ভাবনার একটি নিগূঢ় যোগসূত্রও রয়েছে। দুটি লেখার রচনাকালের মধ্যেও ব্যবধান খুব বেশি নয়। কবিতাটি লেখা ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৮৯০, আর প্রবন্ধটি ১২৯৮ বঙ্গাব্দে। অর্থাৎ ব্যবধান বৎসরখানেকের। কবিতাটিই আগে লেখা হয়েছে। ওতে কবির যে বক্তব্য ছিল তাই বিশদীভূত হয়েছে প্রবন্ধটিতে। বলাই বাহুল্য, দুটি রচনাতেই রবীন্দ্রনাথের বিরহী-চিত্তের আলো-আঁধারি-লীলা পরিদৃশ্যমান।

'মেঘদূত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ম্যাথু আর্নল্ডের ভাষা কণ্ঠে নিয়ে বলেছেন, "মানুষেরা এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত, পরস্পরের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রুলবণাক্ত সমুদ্র।" এই তত্ত্বকেই ব্যাখ্যা করে কবি বলেছেন, "কেবল অতীত বর্তমান নহে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি, সে আপনার মানস-সরোবরের অগম তীরে বাস করিতেছে, সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার পথ নাই। আমিই বা কোথায় আর তুমিই বা কোথায়। মাঝখানে একেবারে অনন্ত। কে তাহা উত্তীর্ণ হইবে।"৬৮

"আমরা প্রত্যেকে নির্জন গিরিশৃঙ্গে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া উত্তরমুখে চাহিয়া আছি—মাঝখানে আকাশ এবং মেঘ এবং সুন্দরী পৃথিবীর রেবা সিপ্রা অবন্তী উজ্জয়িনী, সুখ-সৌন্দর্য-ভোগ-ঐশ্বর্যের চিত্রলেখা; যাহাতে মনে করাইয়া দেয়, কাছে আসিতে দেয় না; আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে, নিবৃত্তি করে না।"৬৯

এই দুটি উদ্ধৃতাংশে কবিবিরহীর দৃষ্টিতে প্রেমচেতনার সঙ্গে নিসর্গচেতনার

সম্পর্কটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। "আমিই বা কোথায় আর তুমিই বা কোথায়। মাঝখানে একেবারে অনন্ত। কে তাহা উত্তীর্ণ হইবে।" "মাঝখানে আকাশ এবং মেঘ এবং সুন্দরী পৃথিবীর···সুখ-সৌন্দর্য-ভোগ-ঐশ্বর্যের চিত্রলেখা; যাহাতে মনে করাইয়া দেয়, কাছে আসিতে দেয় না, আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে, নিবৃত্তি করে না।" এই উক্তি দুটির আলোকে কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের তত্ত্বরূপটি যেন নূতন অর্থ ও তাৎপর্য লাভ করেছে।

কালিদাসের মেঘদূতে একটি নির্বাসিত যক্ষের বিচ্ছেদবেদনা ভাষা পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে বিশেষের সাধারণীকৃত রূপ। যেদিন কালিদাস তাঁর মেঘদূত রচনা করেন, রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করেছেন,

সেদিন সে উজ্জয়িনীপ্রাসাদশিখরে
কী না জানি ঘনঘটা, বিদ্যুৎ-উৎসব,
উদ্দাম পবনবেগ, গুরুগুরু রব।

'গম্ভীর নির্ঘোষ সেই মেঘসংঘর্ষে'র ফলে কবিচিত্তে জেগে উঠেছিল 'সহস্র বর্ষের অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদক্রন্দন।' মেঘদূতের মেঘমন্দ্র শ্লোকে 'বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক' স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। তারপর :

কত কাল ধ'রে
কত সঙ্গীহীন জন, প্রিয়াহীন ঘরে,
বৃষ্টিক্লান্ত বহুদীর্ঘ লুপ্ততারাশশী
আষাঢ়সন্ধ্যায়, ক্ষীণ দীপালোকে বসি
ওই ছন্দ মন্দ মন্দ করি উচ্চারণ
নিমগ্ন করেছে নিজ বিজনবেদন!

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তিনিও রুদ্ধগৃহে একলা বসে মেঘদূত পাঠ করেছেন; তাঁর গৃহত্যাগী মন মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে আসন রচনা করে দেশ-দেশান্তরে উড়ে চলেছে। এইভাবে বিরহী কবিহৃদয় মেঘরূপে দেশে দেশে ভ্রমণ শেষ করে উত্তরণ করেছে "কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে"। লক্ষ্মীর বিলাসপুরী— সেই অমর ভুবনে বিরহিণী প্রিয়তমা— সৌন্দর্যের আদিসৃষ্টি— একাকিনী প্রতীক্ষমাণা। রবীন্দ্রনাথ বলছেন,

কবি, তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হয়ে যায়
রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা;

লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক, যেথা
চিরনিশি যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া
অনন্তসৌন্দর্য-মাঝে একাকী জাগিয়া।

রবীন্দ্র-জীবনে কালিদাসের মেঘদূতপাঠের এই হল ফলশ্রুতি। অনন্তসৌন্দর্যলোকে তিনি আবিষ্কার করেছেন তাঁর বিরহিণী প্রিয়াকে। আসলে কবিমানসে প্রতিষ্ঠিতা কবিমানসীরই প্রতিবিম্ব পড়েছে মেঘদূতের কাব্য-দর্পণে। নিখিল বিশ্বের বেদনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে কবির ব্যক্তিহৃদয়ের বিরহবেদনা।

'অহল্যার প্রতি' কবিতাটিতে কবিমানসের সৃষ্টিলীলা নিগূঢ় রহস্যে সমাবৃত। রামায়ণের কাহিনীলব্ধ রূপকল্পটিকে আশ্রয় করে কবি রূপ দিয়েছেন তাঁর তন্ময়ীভূত চিত্তের ধ্যানলব্ধ সৌন্দর্যমূর্তিটিকে। কবিকৃতি হিসাবে কবিতাটি সার্থক নয়, ওর প্রেরণা দ্বিধাবিভক্ত। প্রথম ভাগে রয়েছে তাঁর মর্তচেতনা—যার অন্য নাম 'সর্বানুভূতি'। 'জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা'র উপলব্ধি এই ভাগের কাব্যবিষয়। দ্বিতীয় ভাগে আছে রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে সঞ্জীবিতা অহল্যার নবজন্মের রূপরহস্য :

অপূর্ব রহস্যময়ী মূর্তি বিবসন,
নবীন শৈশবে স্নাত সম্পূর্ণ যৌবন—
পূর্ণস্ফুট পুষ্প যথা শ্যামপত্রপুটে
শৈশবে যৌবনে মিশে উঠিয়াছে ফুটে
এক বৃন্তে। বিস্মৃতিসাগর-নীলনীরে
প্রথম উষার মতো উঠিয়াছ ধীরে।

'অপার রহস্যতীরে' 'চিরপরিচয়মাঝে' এই 'নবপরিচয়' একটি হারানো মূর্তিকে নূতন করে পাওয়ারই রহস্য দিয়ে ঘিরে আছে। এখানে রবীন্দ্রনাথের চোখে সৌন্দর্যের 'পেগান'-দৃষ্টিই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কবির প্রেমচেতনা যে-সব স্তর পেরিয়ে সৌন্দর্যচেতনায় ভাস্বরতা পেয়েছে তারই একটি স্তর 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় শিলীভূত হয়ে আছে।

'মানসী' যুগের বিরহ-বিপ্রলম্ভ যে-সব কবিতায় নিখাদে ঝংকৃত হয়েছে সেগুলির মধ্যে 'উচ্ছৃঙ্খল' কবিতাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে উপলব্ধিতে কবি নিজের এই বিশেষণটি রচনা করেছেন সে উপলব্ধি পরবর্তী জীবনে অমন বেদনাঘন রূপ নিয়ে আর কখনো দেখা দেয় নি বলেই কবিতাটির গুরুত্ব অপরিসীম। মানসীর 'ভুলে' 'ভুল-ভাঙা' কবিতায়ও কবির প্রেমচেতনা ব্যক্তিসীমায় উৎসারিত; কিন্তু 'উচ্ছৃঙ্খল' এবং তারই পরিপূরক হিসাবে একই দিনে লেখা 'আগন্তুক' কবিতায় কবি যেন নিজের তৎকালীন ভারসাম্যচ্যুত মত্তদশাকে অলজ্জ অসংকোচে অবারিত করেছেন। কবি বলছেন, তোমরা আমার দিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছ, আমাকে চিনতে পারবে না, বুঝতে পারবে না। কেন না, 'জগৎ জুড়িয়া নিয়মের পাশ', তার মধ্যে 'অনিয়ম শুধু আমি'।

কোথা হতে এত বেদনা বহিয়া
এসেছে পরান মম
বিধাতার এক অর্থবিহীন
প্রলাপবচনসম!

* *

আমি কেবল কাতর গীত।
কেহ বা শুনিয়া ঘুমায় নিশীথে,
কেহ জাগে চমকিত।
কত-যে বেদনা সে কেহ বোঝে না,
কত-যে আকুল আশা,
কত-যে তীব্র পিপাসাকাতর ভাষা।

নিজের এই 'তীব্র পিপাসাকাতর ভাষা'কে কাব্যরূপ দিতে গিয়ে কবি নিরাবেগ স্রষ্টার প্রশান্তিলোকে পৌঁছতে পারেন নি বলে কবিতাটি কাব্য হিসাবে সার্থক হতে পারে নি। বিরহের উচ্ছ্বাস ওতে উদ্দাম ভাষাবেগে উচ্ছৃঙ্খল। কিন্তু কবিমানসের কড়চা হিসাবে কবিতাটি মূল্যবান। নিজের এই ছন্নছাড়া সৃষ্টিছাড়া অবস্থা কেন হয়েছে তার কথা বলতে গিয়ে কবি বলছেন—

মহাসুন্দর একটি নিমেষ
ফুটেছে কাননশেষে।
আমি তারি পানে ধাই, ছিঁড়ে নিতে চাই,
ব্যাকুল বাসনাসংগীত গাই,
অসীম কালের আঁধার হইতে
বাহির হইয়া এসে।
শুধু একটি মুখের এক নিমেষের
একটি মধুর কথা,
তারি তরে বহি চিরদিবসের
চিরমনোব্যাকুলতা।

ত্রিশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করে, 'মৃত্যুশোকে'র সাত বৎসর পরেও, কবির হৃদয়াবেগ কতকটা বল্গাহীন উদ্দামতায় অসংযত ছিল তারই প্রমাণ এই 'ব্যাকুল বাসনাসংগীত'টি। 'শুধু একটি মুখের এক নিমেষের / একটি মধুর কথা'র জন্যে কবি 'চিরদিবসের / চিরমনোব্যাকুলতা' বহন করে চলেছেন, এই স্বীকৃতিতে তাঁর মর্মলোক নিঃশেষে নির্বারিত হয়েছে।

'মাহ ভাদরে'র এই উদ্দামতা আশ্বিনে শরৎকালীন প্রশান্তি লাভ করেছে। 'বিদায়' কবিতাটি তারই সাক্ষী। 'বিদায়' 'সোনার তরী'র 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র পূর্বাভাস বহন করে এনেছে। কবি বলছেন,

অকূল সাগর-মাঝে চলেছে ভাসিয়া
জীবনতরণী। ধীরে লাগিছে আসিয়া
তোমার বাতাস, বহি আনি কোন্ দূর
পরিচিত তীর হতে কত সুমধুর
পুষ্পগন্ধ, কত সুখস্মৃতি, কত ব্যথা,
আশাহীন কত সাধ, ভাষাহীন কথা।
সম্মুখেতে তোমারি নয়ন জেগে আছে
আসন্ন আঁধার-মাঝে অস্তাচল-কাছে
স্থির ধ্রুবতারাসম ; সেই অনিমেষ
আকর্ষণে চলেছি কোথায়, কোন দেশ
কোন্ নিরুদ্দেশ-মাঝে !···

কবিতাটি কবির স্বগত-উক্তি বলেই প্রসাদগুণে প্রাঞ্জল। এরই আলোকে সোনার তরীর 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র কর্ণধারকে চিনতে পারলে তাঁকে আর রহস্যময়ী 'বিদেশিনী' বলে মনে হবার কোনো হেতু থাকে না। 'শুধু নিরুদ্দেশ যাত্রা'র বিদেশিনীই নয়, 'মানসসুন্দরী'রও অনেক ভাবানুষঙ্গ ওর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। খুঁজে পাওয়া যাবে 'চিত্রা'র 'আবেদন' কবিতার অনির্বাণ দীপশিখাটিকে। কবি তাঁর সারাজীবনের ধ্রুবতারা, তাঁর মর্মলোকনিবাসিনী মানসসুন্দরীকে সম্বোধন করে বলছেন,

…অবশেষে যবে একদিন,
বহুদিন পরে— তোমার জগৎ-মাঝে
সন্ধ্যা দেখা দিবে…
সেইদিন এইখানে আসিয়ো আবার।

* * *

…দেখিবে তা হলে
আমার সে বিদায়ের শেষ চেয়ে-দেখা
এইখানে রেখে গেছে জ্যোতির্ময় রেখা।
সে অমর অশ্রুবিন্দু সন্ধ্যাতারকার
বিষণ্ণ আকার ধরি উদিবে তোমার
নিদ্রাতুর আঁখি-'পরে ; সারা রাত্রি ধ'রে
তোমার সে জনহীন বিশ্রামশিয়রে
একাকী জাগিয়া রবে।…

'বিদায়ে'র এই দৃষ্টিপ্রদীপই কবি পুনরায় জ্বালাতে চেয়েছেন চিত্রার 'আবেদন' কবিতায়—

অনিমেষে
যে প্রদীপ জ্বলে তব শয্যা-শিরোদেশে
সারা সুপ্তনিশি, সুরনরস্বপ্নাতীত
নিদ্রিত শ্রীঅঙ্গপানে স্থির অকম্পিত
নিদ্রাহীন আঁখি মেলি— সে প্রদীপখানি
আমি জ্বালাইয়া দিব গন্ধতৈল আনি

'বিদায়' কবিতায় কবির 'অশ্রুবিন্দু' হয়েছিল সন্ধ্যার তারা। কার্তিকে লেখা 'সন্ধ্যায়' কবিতায় কবিমানসী হয়েছেন সন্ধ্যার আকাশ। 'ওগো, তুমি অমনি সন্ধ্যার মতো হও।'—

এসো তুমি চুপে চুপে শ্রান্তিরূপে নিদ্রারূপে
এস তুমি নয়ন-আনত।
এসো তুমি ম্লান হেসে দিবাদগ্ধ আয়ুশেষে
মরণের আশ্বাসের মতো

* * *

রাখো এ কপালে মম নিদ্রার আবেশ-সম
হিমস্নিগ্ধ করতলখানি।
বাক্যহীন স্নেহভরে অবশ দেহের 'পরে
অঞ্চলের প্রান্ত দাও টানি।

বলাই বাহুল্য, এই বাগ্‌ভঙ্গি দীর্ঘত্রিপদীবন্ধে লেখা 'কল্পনা'র 'অশেষ' কবিতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তা ছাড়া 'সন্ধ্যাসংগীতে'র 'উপহারে'র সঙ্গে যে মানসীর 'সন্ধ্যায়' কবিতাটি একই সূত্রে গাঁথা সে কথা আর নূতন করে ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন হয় না। 'সন্ধ্যাসংগীতে'র 'স্নেহময়, ছায়াময়, সন্ধ্যাসম আঁখি'ই 'মানসী'র যুগে কবির 'জীবনতীরে' 'একাকিনী' এসে দাঁড়িয়েছেন।

১৮৯০ সনের লেখা কবিমানসীর উদ্দেশে নিবেদিত কবিতাসপ্তকের শেষ কবিতা হল 'মৌন ভাষা'। মুখরতা নয়, আঁখির নীরবতায় ধ্রুবতারকার মৌন নির্দেশই কবির চরম কাম্য :

এসো তবে বসি হেথা, বলিয়ো না কোনো কথা।
নিশীথের অন্ধকারে ঘিরে দিক্ দুজনারে—
আমাদের দুজনের জীবনের নীরবতা।
দুজনের কোলে বুকে আঁধারে বাড়ুক সুখে
দুজনের এক শিশু জনমের মনোব্যথা।

মানসীর এ সব কবিতায় কবির প্রেমচেতনা ব্যক্তিসীমায় বিরাজিত থেকেই

কবির অন্তরতর সত্তাকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। 'তুমি' সম্বোধনে উত্তম-পুরুষের বাচনিকে লেখা কবির এই কবিতাগুলি তাঁর অতি অন্তরঙ্গ ও অকুণ্ঠিত মানসীপ্রশস্তি।

৩৪

'মানসী'র কবিমানসে বিলসিত প্রেমচেতনা ব্যক্তিসীমা অতিক্রম করে যে সাধারণীকৃত রূপ পরিগ্রহণ করেছে তার স্বরূপ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই মানসী-প্রেমের আলোচনা পূর্ণতা পাবে। বলাই বাহুল্য, এই বিশ্লেষণে দেখা যাবে কবির প্রেমচেতনা সীমার কোটি থেকে অসীমের কোটিতে উন্নীত হয়েছে। কবিমানসে গড়ে উঠেছে প্রেমের একটি পরমতত্ত্ব। 'মানসী'র 'পূর্বকালে', 'অনন্ত প্রেম', নিষ্ফল কামনা' এবং 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতাচতুষ্টয়ে রবীন্দ্র-প্রেমচেতনা এই পরমতত্ত্বে উত্তীর্ণ হয়েছে।

১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দের ২ ভাদ্র 'পূর্বকালে' ও 'অনন্ত প্রেম' কবিতা দুটি রচিত। প্রেমের যুগলতত্ত্ব এই পরস্পরপরিপূরক কবিতাযুগলের আলম্বন। প্রেম মানবহৃদয়ের চিরন্তন ধর্ম। এই চিরপুরাতন বিরহ-মিলন-লীলায় কবিমানসে একটি জিজ্ঞাসা জেগে উঠেছে। এতদিন এত লোক প্রাণমন দিয়ে ভালো-বেসেছে, এত কবি এত প্রেমের শ্লোক রচনা করেছে, তার মধ্যে কবি অথবা কবিপ্রিয়ার আসন কোথায় ছিল? কবির ধারণা, তাঁর প্রিয়াই সবার হৃদয় অধিকার করে ছিলেন। কেন না—

তোমা ছাড়া কেহ কারে
বুঝিতে পারি নে ভালো কি বাসিতে পারে।

কবিও তাঁর যথার্থ দোসরের প্রতীক্ষায়—

ছিনু বুঝি বসে কোন্ এক পাশে
পথপাদপের ছায়
সৃষ্টিকালের প্রত্যুষ হতে
তোমারি প্রতীক্ষায়—

এই প্রতীক্ষা সার্থক হয়ে উঠল যেদিন কবি পেলেন তাঁর মানসীর সন্ধান। তাঁর হৃদয়ের অনাদি বিরহবেদনা থেকেই প্রেমের জন্ম হল। তাই মিলনের

সুখ বিরহের অশ্রুধারায় পরিস্নাত হয়ে এক অপূর্ব উপলব্ধিতে পর্যবসিত হয়েছে—

অনাদি বিরহবেদনা ভেদিয়া
ফুটেছে প্রেমের সুখ
যেমনি আজিকে দেখেছি তোমার মুখ।
সে অসীম ব্যথা অসীম সুখের
হৃদয়ে হৃদয়ে রহে,
তাই তো আমার মিলনের মাঝে
নয়নে সলিল বহে।
এ প্রেম আমার সুখ নহে, দুখ নহে॥

একই ছন্দে একই স্তবকবন্ধনে গ্রথিত 'অনন্ত প্রেম' কবিতাটি 'পূর্বকালে'রই ত্রিকাল-প্রসারিত রূপ, তারই উপসংহার। কবি বলছেন,

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শত রূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।

প্রথম স্তবকের এই সংশয় তৃতীয় স্তবকে পৌঁছে ধ্রুববিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়েছে। কবি বলছেন,

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হতে।
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহবিধুর নয়নসলিলে
মিলন মধুর লাজে।
পুরাতন প্রেম নিত্যনূতন সাজে।

সকল প্রেমের মধ্যে একই প্রেমের আবির্ভাব ঘটে, এবং নূতন প্রেমের মধ্যে সেই পুরাতন প্রেমই নিত্য-নূতন সাজে দেখা দেয়— এই উপলব্ধিকেই আমরা বলেছি রবীন্দ্র-প্রেমচেতনার পরম তত্ত্ব। প্লেটোর সৌন্দর্যচেতনার প্রথমে

দেখা দেয় সুন্দরের বিশিষ্ট রূপ। তার পরের স্তরে ঘটে সৌন্দর্যের বিশ্বরূপ-দর্শন। সবশেষে হয় অরূপ সুন্দরের আবির্ভাব। সেই পরম সুন্দরের উৎসমূল থেকেই উৎসারিত হয় রূপময় বিশ্বের নিখিল সৌন্দর্য। রবীন্দ্রনাথের প্রেম-চেতনায়ও প্রেমের বিশিষ্ট রূপ বিশ্বজনীন রূপ থেকেই উৎসারিত। সবশেষে এই সর্বজনীন সর্বকালীন 'যুগল প্রেমের স্রোত' 'অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হতে'ই উৎসারিত বলে বিশ্বসিত। সীমার কোটিতে বিলসিত সমস্ত প্রেমই অসীমের কোটিতে অবস্থিত প্রেমস্বরূপের উদ্দেশে অনন্ত অভিসারযাত্রায় ঊর্ধ্বগামী। প্লেটোনিক প্রেমে দীক্ষিত শেলি প্রেমকে বলেছেন ঐশ্বরিক বিধান—

Nothing in the world is single ;
All things by a law divine
In one spirit meet and mingle.

রবীন্দ্রনাথের 'অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হতে' ভাসমান যুগলপ্রেমের স্রোত শেলি-কল্পিত প্রেমের দর্শনেরই অনুরূপ বিশ্ববিধান।

৩৫

প্রেমচেতনার এই যুগলতত্ত্ব— আত্মার সঙ্গে প্রতি-আত্মার এই চিরপুরাতন বিরহ-মিলন-লীলা— শেলির কাব্যে যা Psyche-Epipsyche তত্ত্বে প্রকাশিত —তা ভারতীয় তান্ত্রিক ও সহজিয়া সাধনায় মিথুনতত্ত্ব বা যুগলতত্ত্বরূপে পরিচিত। এঁরা এক অদ্বয় পরমানন্দতত্ত্বে বিশ্বাসপরায়ণ। এই অদ্বয় আনন্দতত্ত্বের দুটি ধারা বর্তমান। পুরুষ ও প্রকৃতি -রূপে প্রকাশিত এই দুটি ধারা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবার ফলে আবার এক অখণ্ড তত্ত্বের ভিতরে গভীরভাবে মিলিত হয়ে যে চরম তত্ত্ব রচনা করে তাই অদ্বয় তত্ত্ব। এই রূপত দুই অথচ স্বরূপত এক তত্ত্বের নামই যুগলতত্ত্ব।[৭০]

রবীন্দ্রনাথ কোন্ সূত্র থেকে এই যুগলতত্ত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন বলা শক্ত। কিন্তু একুশ বৎসর বয়সে 'সন্ধ্যাসংগীতে'র যুগে তিনি 'যথার্থ দোসর' প্রবন্ধে (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮) এই তত্ত্বকেই ভাষা দিয়ে বলেছেন, "এ জগৎ মিলের রাজ্য, প্রতি বর্ণের মিল আছে, প্রতি সুরের মিল আছে, প্রতি হৃদয়েরও মিল আছে। এ জগৎ মিত্রাক্ষরের কবিতা।" "একটি হৃদয়ের জন্য একটি হৃদয় গঠিত হইয়া

আছেই। তাহারা পরস্পর পরস্পরের জন্য। শতক্রোশ ব্যবধানে, এমন কি, জগৎ হইতে জগতান্তরের ব্যবধানেও তাহাদের মধ্যে একটা আকর্ষণ থাকে। …ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাহারা বিচ্ছিন্ন, কিন্তু তাহারা বিবাহিত। তাহাদের অনন্ত দাম্পত্য।" ৭১

মানসীর যুগে পৌঁছে রবীন্দ্রমানসে যে প্রেমাদর্শ গড়ে উঠেছে তার মূলকথা হল যথার্থ দোসরের সঙ্গে এই অনন্ত আত্মিক মিলন। 'নিষ্ফল কামনা'য় এই আত্মিক মিলনেরই জয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে। 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের প্রেমকাব্যে অপরিসীম গুরুত্ব বক্ষে ধারণ করে আছে। মৃত্যুস্নাত প্রেমকে কবি সারাজীবন যে দার্শনিক পরিকল্পনায় ধ্যান করেছেন তারই প্রথম সার্থক বাণীরূপ 'নিষ্ফল কামনা'। অমিল মুক্তবন্ধ তানপ্রধান ছন্দের উনআশি চরণে রচিত এই কবিতাকে রবীন্দ্র-প্রেমাদর্শের প্রথম সুদৃঢ় স্তম্ভ বলা যেতে পারে। 'অনল-ভরা দুরন্ত বাসনা'য় 'অতল আকাঙ্ক্ষাপারাবারে' প্রাণমন ডুবিয়ে দিয়ে যথার্থ দোসরের সন্ধান মিলবে না, এই কথাই কবিতার প্রথমার্ধে উচ্চারিত হয়েছে।

দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে
চেয়ে আছি দুটি আঁখি-মাঝে।
খুঁজিতেছি, কোথা তুমি,
কোথা তুমি!
যে অমৃত লুকানো তোমায়
সে কোথায়!
অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড়-তিমিরতলে, কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্যশিখা।
তাই চেয়ে আছি।

* *

তোমার আঁখির মাঝে,

হাসির আড়ালে,
বচনের সুধাস্রোতে,
তোমার বদনব্যাপী
করুণ শান্তির তলে
তোমারে কোথায় পাব—
তাই এ ক্রন্দন।

কবি বলছেন, 'বৃথা এ ক্রন্দন। / বৃথা এ অনল-ভরা দুরন্ত বাসনা।' কেন না, 'ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব, / কেহ নহে তোমার আমার!' মানবজীবন শতদলের মতোই 'বিশ্বজগতের তরে, ঈশ্বরের তরে' বিকশিত হয়ে উঠছে। অসীমের পথে তার অনন্ত যাত্রা। বাসনার বন্ধন সেই অনন্ত যাত্রার পথে বিঘ্ন-স্বরূপ। এইজন্যই বাসনাময় প্রেম চিরযাত্রী জীবনের পরিপন্থী। তাই রবীন্দ্রদৃষ্টিতে যথার্থ প্রেম হল প্রেরণা। অনন্তের পথে যুগলযাত্রায় অন্তহীন প্রেরণা। প্রিয়জনের চলার পথকে আলোকিত করা, তাকে অনুক্ষণ এগিয়ে চলার নিত্য প্রেরণা দেওয়াই হল যথার্থ প্রেমের স্বরূপ। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর কয়েক মাস পরে, ১২৯২ সালের অগ্রহায়ণের 'বালকে' 'পথপ্রান্তে' প্রবন্ধে রবীন্দ্রমানসের এই প্রেমাদর্শ প্রথম ভাষা পেয়েছিল। তাতে কবি বলেছেন, "প্রেম আমাদিগকে ভিতর হইতে বাহিরে লইয়া যায়, আপন হইতে অন্যের দিকে লইয়া যায়, এক হইতে আর একের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়।" "পথ দেখাইবার জন্যই সকলে আসিয়াছে, পথের বাধা হইবার জন্য কেহ আসে না!" আমরা এই প্রেরণাময় প্রেমচেতনার বিশ্লেষণ কবিমানসীর প্রথম খণ্ডে 'আত্ম-বিসর্জন' অধ্যায়ে করেছি।[৭২] 'নিষ্ফল কামনা'য় এই তত্ত্বেরই প্রথম কাব্যরূপ পাওয়া গেল। কবি বলছেন,

সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,
এ কী দুঃসাহস।
কী আছে বা তোর,
কী পারিবি দিতে!
আছে কী অনন্ত প্রেম?
পারিবি মিটাতে
জীবনের অনন্ত অভাব?

মহাকাশ-ভরা
এ অসীম জগৎ-জনতা,
এ নিবিড় আলো-অন্ধকার,
কোটি ছায়াপথ, মায়াপথ,
দুর্গম উদয়-অস্তাচল,
এরই মাঝে পথ করি
পারিবি কি নিয়ে যেতে
চিরসহচরে
চিররাত্রিদিন
একা অসহায় ?

মহাকাশ-ভরা কোটি ছায়াপথ মায়াপথ পেরিয়ে এই যে অনন্ত যাত্রা, তাতে প্রেমিক তার যথার্থ দোসরের চির-সহচর। আত্মার সঙ্গে প্রতি-আত্মার এই চিরযাত্রার নামই প্রেম। এই প্রেমচেতনারই অন্তিম স্তরে প্রেমিক তার যথার্থ দোসরের কর্ণধারে রূপান্তরিত হয়। 'সমুখে শান্তিপারাবার' সংগীতে কবির কর্ণধার হয়েছেন তাঁর 'চিরসাথি', আর তাঁর প্রেম হয়েছে সেই চিরযাত্রার চিরপাথেয়।[৭৩]

৩৬

'মানসী'-পর্বের সবচেয়ে স্মরণীয় প্রেমের কবিতা হল 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতাটি প্রেমিক-ভক্তের হৃদয়ে দেবীপ্রতিষ্ঠার রূপক। মনোময়ী প্রীতিরতির মর্মনিবাসিনী বাসনার বিশুদ্ধীকরণের আত্মিক ইতিহাস। এই খণ্ডের প্রস্তাবনায় আমরা অসম্প্রয়োগবিষয়া রতির আলোচনার উপসংহারে বলেছি, রবীন্দ্র-মানসে তাঁর মানসলক্ষ্মীর প্রতি অনুরাগ গঙ্গা যমুনা-প্রবাহের মতো প্রীতি ও ভাবরতির যুগলধারায় প্রবহমান। কখনও তা যুক্তবেণী, কখনও তা মুক্তবেণী। কখনও প্রীতিই মুখ্য। তখন কবির অনুরাগ মানস-বিপ্রলম্ভের বিচিত্রলীলায় বিলসিত। আর যখন ভাবই মুখ্য হয়ে উঠেছে তখন মানসসুন্দরী দেখা দিয়েছেন দেবীমূর্তিতে।[৭৪] মানস-বিপ্রলম্ভের বিচিত্র লীলার ক্ষেত্রেও বিশুদ্ধীভূত অনুরাগ যে প্রেয়সীকে দেবীতে রূপান্তরিত করতে পারে তারই মনস্তাত্ত্বিক ইতিহাস বহন করেছে 'সুরদাসের প্রার্থনা'।

'স্থরদাসের প্রার্থনা' কবিতায় মধ্যযুগীয় ভক্ত-কবির কিংবদন্তিকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মমানসের রহস্যলীলাকেই উন্মীলিত করেছেন। আমরা 'সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে (প্রকাশ : চৈত্র ১৩৬৪) বলেছিলাম, " 'মানসী'তেই কবির মানসলক্ষ্মী তাঁর হৃদয়মন্দিরের কেলিকুট্টিম থেকে রত্নবেদীতে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিতা হয়েছেন। 'মানসী'র নিভৃত আশ্রম' সনেটে সেই দেবীপ্রতিষ্ঠারই বোধনমন্ত্র উচ্চারিত হল। কিন্তু এই দেবীপ্রতিষ্ঠারও একটি ইতিহাস আছে। কামনামুক্ত নিষ্কলুষ প্রেমের পবিত্র সলিলে ভক্ত-প্রেমিকের আত্মশুদ্ধির ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ একটি রূপকের সাহায্যে সে ইতিহাস কাব্যচ্ছন্দে গ্রথিত করেছেন। মানসীর 'স্থরদাসের প্রার্থনা' কবিতায় সেই ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথই স্থরদাস।"[৭৫] ড. শুভ্রাংশু মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রকাব্যের পুনর্বিচার' গ্রন্থে (প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ ১৩৬৯) আমার কবিমানসী-তত্ত্বকে মূলত সমর্থন করে বলেছেন, "...মানসীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'স্থরদাসের প্রার্থনা'। অন্তর ও বাহির যখন তিক্ততায় ভরে উঠেছে, আত্মজীবনের ও স্বদেশের গ্লানি ও ব্যর্থতায় সমস্ত মন সমাচ্ছন্ন ;...তখন অবসন্ন মন বেদনায় ও অনুতাপে আবার ফিরে এল মানসী-কল্পনায়। রূপকের মাধ্যমে স্তরে স্তরে অনাবৃত হল কবির সমগ্র অন্তরিতিহাস। অনাবৃত হল 'অসহন বহ্নি-দহনে'র নিভৃত উৎসমূল।"[৭৬] প্রবীণ সমালোচক অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবীন্দ্র সৃষ্টি-সমীক্ষা' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "স্থরদাসের কাহিনীতে কবির জীবন-প্রক্ষেপ অনুমানের বিষয়, উহার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই।"..."স্থরদাস ঠিক কবির প্রতীক নয়। কিন্তু মানসীযুগের কবিমানসের সমস্যার কিয়দংশ তাহার মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে।"[৭৭]

কাজেই এ সম্পর্কে, অর্থাৎ স্থরদাসের রূপক অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ নিজেরই অন্তরের কথা বলেছেন (অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথই স্থরদাস), এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পুনরালোচনা একান্ত প্রয়োজন। প্রথমেই লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে, 'মানসী'তেই কবি প্রথম বিশেষভাবে রূপকাশ্রয়ী কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। মানসীর দুটি উল্লেখযোগ্য রূপক হল গুরুগোবিন্দ ও স্থরদাস। প্রথম কবিতায় 'মানসী'-পর্বের কবিমানসে স্বদেশপ্রেমচেতনা ভাষা পেয়েছে। দ্বিতীয় কবিতায় ধরা পড়েছে 'মানসী'-পর্বের প্রেমচেতনা। 'গুরুগোবিন্দ'

কবিতায় শিখগুরুর ইতিহাস অনাবৃত করে যেমন কবি নিজেরই তাৎকালিক মনোভাবকে ব্যক্ত করেছেন, তেমনি 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতায় অনাবৃত হয়েছে মানসীপ্রেম সম্পর্কে কবির ঐকান্তিক অভিলাষ। আরো লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থে' বিষয়ানুসারী শ্রেণী-বিন্যাসের সময় 'সুরদাসের প্রার্থনা' 'কথা' বা 'কাহিনী' -শ্রেণীতে বিন্যস্ত হয় নি, 'আঁখির অপরাধ' নামে প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যেই স্থান পেয়েছে।

সুরদাসের প্রার্থনা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে-কাহিনীকে একটি অখণ্ড তাৎপর্যে কাব্যসুষমা দান করেছেন তার সঙ্গে মধ্যযুগের ভক্তকবির বিশেষ কোনো মিল আছে বলে মনে হয় না। 'ভক্তমাল' অনুসারে সুরদাস জন্মান্ধ ছিলেন। এ সম্পর্কে স্বর্গত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবিরশ্মি' গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।[৮৭] তাতে তিনি হিন্দি 'নবরত্নমালা' গ্রন্থের নিম্নলিখিত কিংবদন্তিটিও উদ্ধার করেছেন :

"এক কিংবদন্তী হৈ কি সুরদাস জব অন্ধ ন থে, তব এক জুবতী-কো দেখ কর্ উস্ পর্ আসক্ত হো গয়ে থে। মগর্ পীছে প্রকৃতিস্থ হো-কর্ য়হ দোষ নেত্র-কো সমঝ, তুরংত দো সুইয়াসে অপনে অপনে দোনো নেত্র ফোড়্ ডালে।"

এই সামান্য সংকেত থেকেই হয়তো রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ কবিতাটি গড়ে তুলেছেন। 'আঁখির অপরাধ' শিরোনামার ইঙ্গিতটি অবশ্য এখানে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু হিন্দি 'নবরত্নমালা' গ্রন্থের কিংবদন্তির প্রামাণিকতা সর্বজনগ্রাহ্য নয়। বরং বিল্বমঙ্গলের অনুরূপ কিংবদন্তি সমধিক প্রচলিত। তবে সুরদাসই হোন, আর বিল্বমঙ্গল ঠাকুরই হোন, মধ্যযুগীয় কাহিনীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। মধ্যযুগীয় কাহিনীতে ভক্ত-সাধকের জীবনে নারীর প্রতি বাসনাময় আকর্ষণ ধিক্কৃত হয়েছে, সাধক শেষ পর্যন্ত তাঁর চিত্তকে নিঃশেষে নিবিষ্ট করেছেন তাঁর ইষ্টদেবতার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রেয়সী-নারীই শেষ পর্যন্ত ভক্ত প্রেমিকের ধ্যানের দেবতা হয়ে উঠেছেন। সেই নারীর মধ্যেই তিনি দেখতে পেয়েছেন তাঁর ইষ্টদেবতাকে। কাজেই সুরদাসের কল্পিত কাহিনীটি কবিতার বহিরঙ্গ কাঠামোমাত্র। তা ছাড়া 'সুরদাসের প্রার্থনা' রচনার পনেরো মাস পরে কবি 'পূর্বকালে' এবং 'অনন্ত প্রেম' কবিতায় বলেছেন 'অতি পুরাতন বিরহ-মিলন-লীলা'র মধ্যে তাঁর মানসীকেই তিনি বারবার খুঁজে পেয়েছেন।—

যত শুনি সেই অতীত কাহিনী,
প্রাচীন প্রেমের ব্যথা,
অতি পুরাতন বিরহমিলন-কথা,
অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে
দেখা দেয় অবশেষে
কালের তিমির-রজনী ভেদিয়া
তোমারি মুরতি এসে
চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে।

'অনন্ত প্রেমে'র এই রসরহস্য কবিতাটির অন্তিম স্তবকেও বিধৃত। 'সকল প্রেমের স্মৃতি, / সকল কালের সকল কবির গীতি' শেষ পর্যন্ত একটি প্রেমের মধ্যেই এসে মিলিত হয়েছে। আর সেই প্রেমের আলম্বনস্বরূপিণী হলেন তাঁরই মানসলক্ষ্মী কাদম্বরী দেবী। কবিচিত্তে এই দেবী-প্রতিমা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস কিন্তু 'সুরদাসের প্রার্থনা'রও বহুপূর্ব থেকেই রচিত হয়েছে। 'ভগ্নহৃদয়ে'র প্রথম উৎসর্গ-কবিতায় (ভারতী, কার্তিক ১২৭৮) কবি বলেছিলেন,

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা।
* * *
ও মু'খানি সদা মনে জাগিতেছে সংগোপনে
আঁধার হৃদয়-মাঝে দেবীর প্রতিমা-পারা।

'ভগ্নহৃদয়ে'র দ্বিতীয় উপহারেও দেবী-সম্বোধনে কবি তাঁর প্রতি ঐকান্তিক অনুরক্তির কথা পুনরায় বলেছেন—

হয়ত জান না, দেবি, অদৃশ্য বাঁধন দিয়া
নিয়মিত পথে এক ফিরাইছ মোর হিয়া।
গেছি দূরে, গেছি কাছে, সেই আকর্ষণ আছে,
পথভ্রষ্ট হই নাকো তাহারি অটল বলে,
নহিলে হৃদয় মম ছিন্ন ধূমকেতু সম
দিশাহারা হইত সে অনন্ত আকাশ-তলে।

উদ্ধৃতাংশের শেষ দুটি পঙ্‌ক্তির তাৎপর্য সুরদাসের প্রার্থনার প্রেক্ষাপটে

উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে। কবিচিত্তে তাঁর মানসলক্ষ্মীর দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠার কথা মানসীরও দুটি কবিতাতে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। শুধু দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠার কথাই নয়, 'সংশয়ের আবেগ' (১৫ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭), 'নিভৃত আশ্রম' (১৮ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭) এবং 'সুরদাসের প্রার্থনা' (২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮)— এই তিনটি কবিতার বিষয়বস্তু এক এবং অভিন্ন। 'সংশয়ের আবেগ' এবং 'নিভৃত আশ্রমে' উত্তমপুরুষের বাচনিকে কবি যে কথা বলেছেন 'সুরদাসের প্রার্থনা'য় রূপকাশ্রিত ভাষায় তারই বিস্তারিত প্রকাশ ঘটেছে। 'সংশয়ের আবেগ' কবিতার আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। কবিমানসী এখানে কবির 'হৃদয়-দেবতা' হয়ে উঠেছেন—

বাসনার তীব্র জ্বালা দূর হয়ে যাবে,
যাবে অভিমান,
হৃদয়-দেবতা হবে, করিব চরণে
পুষ্প-অর্ঘ্য দান।

আমরা বলেছি 'সংশয়ের আবেগে'র এই স্তবকে সুরদাসের প্রার্থনার ভাববীজ সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে। 'নিভৃত আশ্রমে' সে-বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। আমরা বলেছি, এই কবিতায় কবির হৃদয়-আসনে জ্যোতির্ময়ী মাধুরীমূর্তি প্রতিষ্ঠার সংকল্পবাক্য উচ্চারিত হয়েছে। সুরদাসের প্রার্থনায় কবি প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহকেই ষোড়শোপচারে পূজা করেছেন।

এবার কবিতাটির বাণীবিশ্লেষণ করে তার ভাববস্তুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে। কবিতাটির আরম্ভ একটি নাটকীয় উক্তিতে—

ঢাকো ঢাকো মুখ টানিয়া বসন,
আমি কবি সুরদাস।
দেবী, আসিয়াছি ভিক্ষা মাগিতে
পুরাতে হইবে আশ।
অতি-অসহন বহ্নি-দহন
মর্মমাঝারে করি যে বহন,
কলঙ্ক-রাহু প্রতি পলে পলে
জীবন করিছে গ্রাস।

তারপরেই শুরু হয়েছে কবির দেবীবন্দনা—

পবিত্র তুমি, নির্মল তুমি,
তুমি দেবী, তুমি সতী,
কুৎসিত দীন অধম পামর
পঙ্কিল আমি অতি।
তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই শক্তি,
হৃদয়ে আমার পাঠাও ভক্তি
পাপের তিমির পুড়ে যায় জ্বলে,
কোথা সে পুণ্য-জ্যোতি।
দেবের করুণা মানবী আকারে,
আনন্দধারা বিশ্বমাঝারে,
পতিতপাবনী গঙ্গা যেমন
এলেন পাপীর কাজে।
তোমার চরিত রবে নির্মল,
তোমার ধর্ম রবে উজ্জ্বল,
আমার এ পাপ করি দাও লীন
তোমার পুণ্যমাঝে।

এখানে কবি যে-পাপের কথা বলছেন, তা সবিকারা প্রীতিরতিরই স্বরূপ-লক্ষণ। একান্তভাবে মনোময়ী হলেও তা অন্তরে লীলাবিলাস-সম্প্রয়োগের বাসনাকে পোষণ করে রাখে। কবি তাঁর অন্তর্লোকে সংগুপ্ত সেই বাসনার কথাই বলেছেন তৃতীয় স্তবকে—

জান কি আমি এ পাপ-আঁখি মেলি
তোমারে দেখেছি চেয়ে,
গিয়েছিল মোর বিভোর বাসনা
ওই মুখপানে ধেয়ে,
* *
মোহ-চঞ্চল সে লালসা মম
কৃষ্ণবরন ভ্রমরের সম
ফিরিতেছিল কি গুনগুন কেঁদে
তোমার দৃষ্টিপথে ?

বলাই বাহুল্য, উত্তমপুরুষের বাচনিকে অমন অকপট ভাষায় 'মোহচঞ্চল সে লালসা'র কথা বলা সম্ভব ছিল না। মুখ্যত এই কারণেই কবি তাঁর আত্মকথা বলার জন্যে সুরদাসের কাহিনীকেই আশ্রয় করেছেন। কবিতার প্রথমাংশ সমাপ্ত হয়েছে আবেগের নাট্যশিখরে সমারূঢ় হয়ে—

আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত
প্রভাতরশ্মিসম ;
লও, বিঁধে লও বাসনাসঘন
এ কালো নয়ন মম।
এ আঁখি আমার শরীরে তো নাই
ফুটেছে মর্মতলে ;
নির্বাণহীন অঙ্গারসম
নিশিদিন শুধু জ্বলে।
সেথা হতে তারে উপাড়িয়া লও
জ্বালাময় দুটো চোখ,
তোমার লাগিয়া তিয়াষ যাহার
সে আঁখি তোমারি হ'ক !

শেষের পঙ্‌ক্তিটিতে বিরোধাভাস দেখা দিয়েছে। বাসনাসঘন কালো নয়ন দুটিকে অন্ধ করে দেবার জন্যে কবিপ্রেমিক ছুরি তুলে দিচ্ছেন দেবীর হাতে, অথচ বলছেন, 'তোমার লাগিয়া তিয়াষ যাহার / সে আঁখি তোমারি হ'ক।' আসলে এই অন্ধত্বও রূপকমাত্র। রূপমুগ্ধ দৃষ্টিকে বহির্ভুবন থেকে সংহরণ করে অন্তর্লোকে প্রোজ্জ্বল করে তোলার কথাই এই 'প্রভাতরশ্মিসম' 'তীক্ষ্ণ দীপ্ত' ছুরির রূপকে বলা হয়েছে। সহজিয়া প্রেমিকের ভাষায় ওরই অন্য নাম বাহির দুয়ারে কপাট লাগিয়ে ভিতর দুয়ার খুলে দেওয়া। রূপের জগৎ থেকে এই দৃষ্টি-সংহরণকে বলা যেতে পারে প্রেমের বিরূপাক্ষ-সাধনা। কবিতার দ্বিতীয়াংশে তার কথাই বলা হয়েছে—

অপার ভুবন, উদার গগন,
শ্যামল কাননতল,
বসন্ত অতি মুগ্ধ মুরতি,
স্বচ্ছ নদীর জল,

বিবিধবরন সন্ধ্যা-নীরদ,
গ্রহতারাময়ী নিশি,
বিচিত্রশোভা শস্যক্ষেত্র
প্রসারিত দূরদিশি,
সুনীল গগনে ঘনতর নীল
অতিদূর গিরিমালা,
তারি পরপারে রবির উদয়
কনক-কিরণ-জ্বালা,
চকিততড়িৎ সঘন বরষা,
পূর্ণ ইন্দ্রধনু,
শরৎ-আকাশে অসীম বিকাশ
জ্যোৎস্না শুভ্রতনু,
লও, সব লও, তুমি কেড়ে লও,
মাগিতেছি অকপটে,
তিমিরতুলিকা দাও বুলাইয়া
আকাশ-চিত্রপটে !

দেবীর কাছে কবিভক্তের এই প্রার্থনা— 'তিমিরতুলিকা দাও বুলাইয়া / আকাশচিত্রপটে'— তাঁর রূপমোহগ্রস্ত বিভোর সাধনা থেকে মুক্তিকামনারই প্রতীক। তিনি বলছেন—

ইহারা আমারে ভুলায় সতত
কোথা নিয়ে যায় টেনে !
মাধুরী-মদিরা পান করে শেষে
প্রাণ পথ নাহি চেনে।
সবে মিলে যেন বাজাইতে চায়
আমার বাঁশরি কাড়ি,
পাগলের মতো রচি নব গান,
নব নব তান ছাড়ি।

ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে
ভুবনমোহিনী মায়া,
যৌবনভরা বাহুপাশে তার
বেষ্টন করে কায়া।

তার ফলে এই রূপের মায়ায় মুগ্ধ হয়ে ভক্তকবি ভুলেছেন তাঁর ইষ্টদেবতাকে—

শ্লথ হয়ে আসে হৃদয়তন্ত্রী
বীণা খসে যায় পড়ি
নাহি বাজে আর হরিনামগান
বরষ বরষ ধরি।

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর এই রূপের জগৎ ঈশ্বরে পরমানুরক্তির পথে বাধা বলেই সুরদাস ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করে দিতে চেয়েছেন। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রমানসেও অমনি একটি সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রেমের প্রতি ঐকান্তিক অনুরক্তিবশে তাঁর হৃদয় চাইছে 'নিভৃত আশ্রমে' অনুক্ষণ সেই জ্যোতির্ময়ী মূর্তির ধ্যান করতে। অথচ প্রতিমুহূর্তে বহির্ভুবন তাঁর রূপমুগ্ধ কবিমানসকে আকর্ষণ করছে। এই আকর্ষণ-বিকর্ষণলীলার রহস্য প্রথম প্রকাশিত হয়েছে 'কড়ি ও কোমলে'র 'পুরাতন' ও 'নূতন' কবিতায়। 'পুরাতন' কবিতায় কবি বলেছেন, 'হেথা হতে যাও, পুরাতন।' কেন না, 'হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে'। 'নূতন' কবিতায় বলেছেন, 'ঘোর ঝটিকার রাতে দারুণ অশনিপাতে' যে-গিরিশিখর বিদীর্ণ হয়েছে, 'বিশাল পর্বত কেটে, পাষাণ-হৃদয় ফেটে' যে ঘোর গহ্বর প্রকাশিত হয়েছে, সেখানেও 'প্রভাতে পুলকে ভাসি, বহিয়া নবীন হাসি' সূর্যকর প্রকাশিত হচ্ছে। শুধু সূর্যকরই নয়, বিদীর্ণ গহ্বর আবার লতায় পাতায় ফুলে ফলে পূর্ণ হয়ে উঠেছে—

আনে হাসি, আনে গান, আনে রে নূতন প্রাণ
সঙ্গে করে আনে রবিকর,
অশোক শিশুর প্রায় এত হাসে এত গায়
কাঁদিতে দেয় না অবসর

এই চেতনাই 'সুরদাসের প্রার্থনা'য় স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। কবি বলছেন, 'পারি

সে ভাসিতে / কেবলি মুরতিস্রোতে', তাই তাঁর প্রার্থনা 'লহো মোরে তুলে আলোকমগন / মুরতিভুবন হতে।' কেন না,

আঁখি মেলে মোর সীমা চলে যাবে
একাকী অসীম ভরা,
আমারই আঁধারে মিলাবে গগন,
মিলাবে সকল ধরা।
আলোহীন সেই বিশাল হৃদয়ে
আমার বিজন বাস,
প্রলয়-আসন জুড়িয়া বসিয়া
রব আমি বারো মাস।

কিন্তু এই 'বিশ্ববিলোপ বিমল আঁধারে' রূপের জগৎ যখন অবলু
তখনি তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের পথে পাওয়া মানসলক্ষ্মীর মূর্তিও তো য
এখানেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে বাহির-দুয়ারে কপাট লাগিয়ে
খোলার তত্ত্বরহস্য। কবিতার শেষাংশে কবির মানসলোকে
প্রতিষ্ঠার এই রহস্যটি অনবদ্য কাব্যছন্দে গ্রথিত হয়েছে—

এখন যেমন রয়েছ দাঁড়ায়ে
দেবীর প্রতিমা সম,
স্থির গম্ভীর করুণ নয়নে
চাহিছ হৃদয়ে মম,
বাতায়ন হতে সন্ধ্যা-কিরণ
পড়েছে ললাটে এসে,
মেঘের আলোক লভিছে বিরাম
নিবিড়তিমির কেশে,
শান্তিরূপিণী এ মুরতি তব
অতি অপূর্ব সাজে
অনলরেখায় ফুটিয়া উঠিবে
অনন্তনিশি-মাঝে।
চৌদিকে তব নূতন জগৎ
আপনি সৃজিত হবে,

এ সন্ধ্যা-শোভা তোমারে ঘিরিয়া
চিরকাল জেগে রবে।

* *

সে নব জগতে কাল-স্রোত নাই,
পরিবর্তন নাহি,
আজি এই দিন অনন্ত হয়ে
চিরদিন রবে চাহি।

সেই পরিবর্তনহীন অনন্ত মুহূর্তে কবির মানসলক্ষ্মীই হবেন তাঁর জীবনদেবতা—

তোমাতে হেরিব আমার দেবতা,
হেরিব আমার হরি,
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব
অনন্ত বিভাবরী।

এই হল রবীন্দ্রমানসে দেবীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার অমর কাহিনী। কাদম্বরী দেবীর কবিভক্ত এই কবিতায় বিশ্বজগৎকে বিসর্জন দিয়ে তাঁর মানসলক্ষ্মীকেই জীবনের দেবতারূপে বরণ করে নিয়েছেন। রূপময় বিশ্বের সৌন্দর্য আর প্রাণময় বিশ্বের প্রেমের এই দ্বন্দ্বে এখানে প্রেমেরই জয়ধ্বনি ঘোষিত হয়েছে। কবি এই ধ্যানতন্ময়তায় উপনীত হয়ে একটি সংকট থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু এই উত্তরণের মধ্যেই আবার দেখা দিয়েছে নূতন সংকট। 'সুরদাসের প্রার্থনা'র চোদ্দ মাস পরে, ১৪ ভাদ্র ১৮৮৯ তারিখে লেখা 'আশঙ্কা' কবিতায় এই নূতন সংকট ভাষা পেয়েছে—

কে জানে এ কি ভালো?
আকাশভরা কিরণধারা আছিল মোর তপনতারা,
আজিকে শুধু একেলা তুমি আমার আঁখি-আলো,
কে জানে এ কি ভালো?

কত না শোভা, কত না সুখ কত না ছিল অমিয়-মুখ,
নিত্য-নব পুষ্পরাশি ফুটিত মোর দ্বারে;
ক্ষুদ্র আশা, ক্ষুদ্র স্নেহ, মনের ছিল শতেক গেহ,
আকাশ ছিল, ধরণী ছিল আমার চারিধারে;

কোথায় তারা, সকলে আজি তোমাতেই লুকালো।
কে জানে এ কি ভালো ?

এই প্রশ্নের উত্তর, এই সংকটের সমাধান পাওয়া যাবে 'সোনার তরী' কাব্যে। কিন্তু 'আশঙ্কা' কবিতায় 'সুরদাসের প্রার্থনা'র পরবর্তী স্তরের কবিমানস-রহস্যই উন্মোচিত হয়েছে। এই কবিতা পাঠের পর আর সংশয়ের অবকাশমাত্র থাকে না যে রবীন্দ্রনাথই সুরদাস।

৩৭

'মানসী' থেকে 'সোনার তরী'তে উত্তরণের পরে কবির কাদম্বরীচেতনার বিকাশ ঘটেছে 'মানসসুন্দরী' কবিতায়। 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতায় কবিচিত্তে দেবীপ্রতিষ্ঠার আত্মিক ইতিহাস রচিত হয়েছে। কবিমানসী সেখানে জীবনদেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিতা হয়েছেন। 'সুরদাসের প্রার্থনা'র সাড়ে-চার বৎসর পরে 'মানসসুন্দরী' লেখা হয়েছে। 'মানসসুন্দরী'তে কবির অন্তর্যামী জীবনদেবতাই আবার প্রেয়সী মানবীমূর্তিতে দেখা দিয়েছেন।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগবে, তাহলে কি বাসনার বিশুদ্ধীকরণ ব্যর্থ হল ? কবিমানসের এই রসরহস্যের সন্ধানে আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমেই যে-কথা বলেছিলাম, এখানে পুনরায় তা স্মরণ করা প্রয়োজন। আমরা বলেছিলাম, কাদম্বরীপ্রেমেই রবীন্দ্র-কবিমানস আত্মার অতল গভীরতায় তলিয়ে যেতে পেরেছে। কবি নিজেই বলেছেন, মহাসমুদ্রের ইঙ্গিতবাহিনী সেই প্রেমই তাঁর আত্মার নিভৃত-গভীরে জ্বেলে রেখেছে চিরবিরহের প্রদীপশিখা। সেই শিখার আলোকে কাদম্বরী দেবীর মানবীমূর্তিটি যেমন চির-উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে, তেমনি সেই আলোকেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাঁর নবনব সৌন্দর্যমূর্তি এবং অন্তর্যামী-রূপিণী দেবীমূর্তি। দান্তের চেতনায় বেয়াত্রিচে কিভাবে বিরাজমানা ছিলেন তার কথা বলতে গিয়ে জাক্ মারিতাঁ বলেছেন, "She is both herself and what she signifies"। রবীন্দ্রনাথের বেয়াত্রিচেও একটি বিশেষ মানবীমূর্তিতেই কবিমানসে চিরপ্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। তার ফলে কাদম্বরী দেবীর প্রতি কবির মানস-বিপ্রলম্ভ একদিকে যেমন চিরদিনই প্রেমচেতনার বিচিত্র স্তরে নিত্যবিলসিত ছিল, অন্যদিকে তেমনি তিনিই 'জগতের মাঝে' 'বিচিত্ররূপিণী',

এবং অন্তর-মাঝে 'অন্তরবাসিনী' লীলাসঙ্গিনী হয়ে কবিচেতনাকে দিব্যানুভূতির নবনব ঘাটে বহন করে নিয়ে গেছেন।[৭৯]

'মানসসুন্দরী' জীবনদেবতার প্রেয়সী মূর্তি। কবি বলেছেন:

গৃহের বনিতা ছিলে— টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়।

বলাকার 'ছবি' কবিতায় কবি তাঁকে বলেছেন, 'কবির অন্তরে তুমি কবি'। কবির জীবনদেবতা কবির কাব্যের কারয়িত্রী প্রতিভা। সেই অর্থেই তিনি 'বিশ্বের কবিতা'। গৃহের বনিতা কি করে বিশ্বের কবিতা হলেন তার ইতিহাস মানসসুন্দরীতে পাওয়া যাবে। কবির সাত বৎসর বয়সে তাঁর মানসস্বপ্নে কাদম্বরী দেবী আবির্ভূতা হয়েছিলেন। বাল্য-কৈশোরে তিনিই ছিলেন কবির খেলার সাথি— a playmate। কবির যৌবনলগ্নে তিনিই হয়ে উঠলেন তাঁর মানস-আকাশের ধ্রুবতারা— Guardian-angel। 'মানসসুন্দরী' কবিতায় কবি তাঁকে বলছেন, তাঁর জীবনের 'প্রথম প্রেয়সী'— তাঁর 'ভাগ্য-গগনের সৌন্দর্যের শশী'; তাঁর সঙ্গে নিজের বাল্যলীলার কাহিনীটি কবিকণ্ঠেই শোনা যাক—

মনে আছে কবে কোন্ ফুল্লযূথীবনে
বহুবাল্যকালে, দেখা হত দুই জনে
আধো-চেনাশোনা? তুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরার অস্থির
এক বালকের সাথে কী খেলা খেলাতে
সখী, আসিতে হাসিয়া, তরুণ প্রভাতে
নবীন বালিকা-মূর্তি, শুভ্রবস্ত্র পরি
উষার কিরণধারে সদ্য স্নান করি
বিকচ কুসুমসম ফুল্ল মুখখানি
নিদ্রাভঙ্গে দেখা দিতে, নিয়ে যেতে টানি
উপবনে কুড়াতে শেফালি। বারে বারে
শৈশব-কর্তব্য হতে ভুলায়ে আমারে,
ফেলে দিয়ে পুঁথিপত্র, কেড়ে নিয়ে খড়ি,

দেখায়ে গোপন পথ দিতে মুক্ত করি
পাঠশালা-কারা হতে ; কোথা গৃহকোণে
নিয়ে যেতে নির্জনেতে রহস্য-ভবনে ;
জনশূন্য গৃহছাদে আকাশের তলে
কী করিতে খেলা, কী বিচিত্র কথা ব'লে
ভুলাতে আমারে, স্বপ্নসম চমৎকার
অর্থহীন, সত্য মিথ্যা তুমি জান তার।
দুটি কর্ণে দুলিত মুকুতা, দুটি করে
সোনার বলয়, দুটি কপোলের 'পরে
খেলিত অলক; দুই স্বচ্ছ নেত্র হতে
কাঁপিত আলোক, নির্মল নির্ঝর-স্রোতে
চূর্ণরশ্মিসম। দোঁহে দোঁহা ভালো করে
চিনিবার আগে, নিশ্চিন্ত বিশ্বাসভরে
খেলাধুলা ছুটাছুটি দু-জনে সতত,
কথাবার্তা বেশবাস বিথান বিতত।

তারপরে একদিন জীবনের বনে যৌবনবসন্তে যখন 'প্রথম মলয় বায়ু ফেলেছে নিশ্বাস', তখন খেলাক্ষেত্র হতে অন্তরলক্ষ্মী এলেন অন্তরে। বাল্যের 'খেলার সঙ্গিনী' কিভাবে যৌবনলগ্নে জীবনের 'অধিষ্ঠাত্রী দেবী' হলেন তার কথা বলতে গিয়ে কবি বলেছেন :

সুন্দর শাহানা রাগে বংশীর সুস্বরে
কী উৎসব হয়েছিল আমার জগতে,
যেদিন প্রথম তুমি পুষ্পফুল্ল পথে
লজ্জামুকুলিত মুখে রক্তিম অম্বরে
বধূ হয়ে প্রবেশিলে চিরদিন তরে
আমার অন্তর-গৃহে—

'অন্তর-গৃহে' পদটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতো। বলাই বাহুল্য, এ-মিলন প্রাণের মিলন। 'যথার্থ দোসরে'র সঙ্গে চিরদিনের আত্মার রাখিবন্ধন। এখানে আবার স্মরণ করতে হবে 'যথার্থ দোসর' প্রবন্ধে কবির বক্তব্যটি—

"একটি হৃদয়ের জন্য একটি হৃদয় গঠিত হইয়া আছেই। তাহারা পরস্পর পরস্পরের জন্য। শত-ক্রোশ ব্যবধানে, এমন কি, জগৎ হইতে জগতান্তরের ব্যবধানেও তাদের মধ্যে একটা আকর্ষণ থাকে!... ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাহারা বিচ্ছিন্ন, কিন্তু তাহারা বিবাহিত। তাহাদের অনন্ত দাম্পত্য।" এই উদ্ধৃতির মধ্যেই 'বধূ হয়ে' কবির 'অন্তর-গৃহে' চিরদিনের জন্যে মানসসুন্দরীর প্রবেশের তাৎপর্যটি ধরা পড়েছে। 'অন্তর-গৃহে'র ভাবানুষঙ্গকে বিশ্লেষণ করে কবি বলেছেন—

যে গুপ্ত আলয়ে
অন্তর্যামী জেগে আছে সুখদুঃখ লয়ে,
যেখানে আমার যত লজ্জা আশা ভয়
সদা কম্পমান, পরশ নাহিকো সয়
এত সুকুমার।

কবিমানসের সেই সুকুমার গুপ্ত আলয়ে মানসসুন্দরী হলেন তাঁর 'মর্মের গেহিনী'—

ছিলে খেলার সঙ্গিনী
এখন হয়েছ মোর মর্মের গেহিনী,
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

এমনি করেই গৃহের বনিতা হলেন বিশ্বের কবিতা। খেলার সঙ্গিনী হলেন জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তখন তাঁর দিকে তাকিয়ে কবির আর বিস্ময়ের সীমা রইল না—

সে অবধি প্রিয়ে,
রয়েছি বিস্মিত হয়ে তোমারে চাহিয়ে
কোথাও না পাই সীমা। কোন্ বিশ্বপার
আছে তব জন্মভূমি? সংগীত তোমার
কত দূরে নিয়ে যাবে, কোন্ কল্পলোকে
আমারে করিবে বন্দী, গানের পুলকে
বিমুগ্ধ কুরঙ্গসম।

কবির এই উপলব্ধিতে তাঁর মানসসুন্দরী হয়ে উঠেছেন সৌন্দর্যলোকে তাঁর

মানসপ্রয়াণের অধিনেত্রী— তাঁর তরণীর কর্ণধার। 'সোনার তরী'র শেষ কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র আভাস এখানে ভেসে এসেছে। অবশ্য 'মানস-সুন্দরী'র এই অংশ আর 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতার মধ্যে পার্থক্যও কম নয়। মানসসুন্দরীকে কবি বলছেন :

এই যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হয়ে কর্ণধার
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী, দশ দিশি
অস্ফুট কল্লোলধ্বনি চিরদিবানিশি
কী কথা বলিছে কিছু নারি বুঝিবারে,
এর কোনো কূল আছে ? সৌন্দর্য-পাথারে
যে বেদনা-বায়ুভরে ছুটে মন-তরী,
সে বাতাসে, কত বার মনে শঙ্কা করি
ছিন্ন হয়ে গেল বুঝি হৃদয়ের পাল ;
অভয় আশ্বাসভরা নয়ন বিশাল,
হেরিয়া ভরসা পাই ; বিশ্বাস বিপুল
জাগে মনে— আছে এক মহা উপকূল
এই সৌন্দর্যের তটে, বাসনার তীরে
মোদের দোঁহার গৃহ।

'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় সৌন্দর্যপ্রয়াণই মুখ্য, আর মানসসুন্দরীতে বাসনার তীরে 'মোদের দোঁহার গৃহে'র প্রতি আকর্ষণই প্রধান।

সমুদ্রের মাঝখানে এক মহা-উপকূলে সৌন্দর্যের তটে এই 'দোঁহার গৃহে'র কল্পনাটি অনিবার্যভাবেই শেলির 'এপিসাইকিডিয়নে'র আয়োনিয়ান দ্বীপে কবির কল্পগৃহটির কথা মনে করিয়ে দেয়। বস্তুত, মানসসুন্দরী রবীন্দ্রনাথের এপিসাইকিডিয়ন। শেলির এই অসামান্য কবিতাটি রবীন্দ্রমানসে কী প্রভাব বিস্তার করেছিল তা এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে আলোচনা করা হয়েছে। মানস-সুন্দরী প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, 'প্রভাতসংগীতে'র যুগে রবীন্দ্রনাথ শেলির এপিসাইকিডিয়নের শেষাংশটি 'সম্মিলন' শিরোনামায় অনুবাদ করেছিলেন। কাদম্বরী দেবীর জীবদ্দশায় এপিসাইকিডিয়নের এই অনুবাদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা প্রথম খণ্ডে আত্মবিসর্জন অধ্যায়ে বলেছি

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পরে তাঁর ভক্তকবির 'বিষণ্ণ হৃদয়ের গান' বিদেশী ফুলের গুচ্ছেই প্রথম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। শেলির কবিতার মধ্যেই সেদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিষণ্ণ হৃদয়ের বিলাপসংগীতের প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন।

'সম্মিলনে' রবীন্দ্রনাথ এপিসাইকিডিয়নের ৫২৯ লাইন (The ring-dove, in the embowering ivy...) থেকে ৫৯১ লাইন (I pant, I sink, I tremble, I expire !) পর্যন্ত অনুবাদ করেছিলেন। এই অংশে শেলি তাঁর মানসসুন্দরী— তাঁর আত্মার দোসর— এমিলিয়া ভিভিয়ানিকে নিয়ে তাঁর দ্বীপ-স্বর্গে কল্পিত মিলনের যে-স্বপ্নকামনা রচনা করেছিলেন, তাকেই ভাষা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের মধ্য দিয়েই তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক—

সুখের আবাসে সেই কাটাব জীবন,
দুজনে উঠিব মোরা, দুজনে বসিব,
নীল আকাশের নিচে ভ্রমিব দুজনে,

* *

অথবা দাঁড়াব মোরা সমুদ্রের তটে।
উপল-মণ্ডিত সেই স্নিগ্ধ উপকূল
তরঙ্গের চুম্বনেতে উচ্ছ্বাসে মাতিয়া
থর থর কাঁপে আর জ্বল জ্বল জ্বলে !
যত সুখ আছে সেথা আমাদের হবে,
আমরা দুজনে সেথা হব দুজনের,
অবশেষে বিজন সে দ্বীপের মাঝারে
ভালোবাসা, বেঁচে থাকা, এক হয়ে যাবে।

* *

দুজনে দুজন আর রব না আমরা,
এক হোয়ে যাব মোরা দুইটি শরীরে।
দুইটি শরীর ? আহা তাও কেন হল ?
যেমন দুইটি উল্কা জ্বলন্ত শরীর,
ক্রমশ দেহের শিখা করিয়া বিস্তার

স্পর্শ করে, মিশে যায়, এক দেহ ধরে,
চিরকাল জ্বলে তবু ভস্ম নাহি হয়,
দুজনেরে গ্রাস করি দোঁহে বেঁচে থাকে ;
মোদের যমক-হৃদে একই বাসনা,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে বাড়িয়া বাড়িয়া,
তেমনি মিলিয়া যাবে অনন্ত মিলনে।
এক আশা রবে শুধু দুইটি ইচ্ছায়
এক ইচ্ছা রবে শুধু দুইটি হৃদয়ে,
একই জীবন আর একই মরণ,
একই স্বরগ আর একই নরক,
এক অমরতা কিম্বা একই নির্বাণ !

বলাই বাহুল্য, ইংরেজি ভাষায় বিধৃত বাসনার উত্তাপ বাংলা অনুবাদে অনেকখানি স্তিমিত হয়ে এসেছে। তবু ওতে ইন্দ্রিয়বাসনা রোমান্টিক কবিকল্পনায় অনুরঞ্জিত হয়ে যে-সৌকুমার্য লাভ করেছে তারই আনুরূপ্য খুঁজে পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের মানসসুন্দরীতে।

৩৮

তরুণ কবিচিত্তে কাদম্বরীপ্রেম ছিল একান্তই মনোময়ী রতি। কিন্তু অসম্প্রয়োগবিষয়া প্রীতিরতির মর্মকোষে সংগুপ্ত অতৃপ্ত বাসনাও তার মধ্যে ওতপ্রোত ছিল। সেই বাসনার বিশুদ্ধীকরণ যে ঘটেছিল তার প্রমাণ 'মানসী' কাব্যের একাধিক কবিতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। কিন্তু বিশুদ্ধীকরণের অর্থ পরিনির্বাণ নয়। বাসনার উর্ধ্বায়ন, বাসনার অন্তরায়ণ। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পরে সেই চির-অতৃপ্ত বাসনা মানসসুন্দরী কবিতায় বল্‌গাহীন উদ্দামতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। শেলি তাঁর কবিতায় তাঁর আত্মার দোসরের সঙ্গে একাত্মীকরণের স্বপ্নকে— তাঁর আত্মিক প্রেমকে— বাসনাদীপ্ত বহ্নিবাণীতে প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যে শেলির কল্পনার দ্বারা উজ্জীবিত হয়েছিলেন সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু যিনি জীবনের অধিষ্ঠাত্রী হয়ে—কবির অন্তরে কবি হয়ে— তাঁর হৃৎপদ্মে দেবীর আসন গ্রহণ

করেছেন সেই 'কবিতা, কল্পনা-লতা'কে অবলম্বন করে বাসনার এই উর্ধ্বায়ন শুধু শেলির অনুপ্রেরণাতেই সম্ভব হয়েছিল বলে মনে হয় না। তরুণ রবীন্দ্রনাথের কবিগুরু বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' কাব্য আসলে সরস্বতীমঙ্গল। কিন্তু বিহারীলাল বলেছেন, 'মৈত্রীবিরহ, প্রীতিবিরহ ও সরস্বতীবিরহ—যুগপৎ এ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ' হয়েই তিনি সারদামঙ্গল রচনা করেন। বিহারী-লালের দৃষ্টিতে দেবী সরস্বতীই তাঁর প্রিয়া হয়ে উঠেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও সারদামঙ্গল কাব্যকে বলেছেন প্রেমকাব্য। বলেছেন, "আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সংগীত এরূপ সহস্রধার উৎসের মতো কোথাও উৎসারিত হয় নাই। এমন নির্মল সুন্দর ভাষা, এমন ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।"[৮০]

বিহারীলালের কবিমানসে মৈত্রীবিরহ, প্রীতিবিরহ ও সরস্বতীবিরহের মধ্যে ব্যবধান ঘুচে গিয়েছিল, রবীন্দ্রমানসে কাদম্বরী দেবী একাধারে প্রেম ও কবিতার প্রেরণাস্বরূপিণী। সীমার কোটিতে—প্রেমচেতনায়—যিনি গৃহের বনিতা, অসীমের কোটিতে উন্নীত হয়ে—সৌন্দর্যচেতনায়—তিনিই বিশ্বের কবিতা। প্রেমচেতনায় কিন্তু জীবদ্দশাতে কবির বাসনাবৃন্তে বিকশিত হয়েও যিনি অপ্রাপণীয়া ছিলেন মৃত্যুর পরে তাঁর সঙ্গে 'জগতান্তরের ব্যবধান' রচিত হয়েছে। মৃত্যুরচিত এই অনতিক্রম্য ব্যবধানকে অস্বীকার করে চিরবিরহী কবি মিলনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছেন। বৈষ্ণবের ভাষায় ওরই নাম ভাবসম্মিলন। কবি বলছেন:

আজ শুধু কূজন গুঞ্জন
তোমাতে আমাতে; শুধু নীরবে ভুঞ্জন
এই সন্ধ্যা-কিরণের সুবর্ণ মদিরা,—
যতক্ষণ অন্তরের শিরা-উপশিরা
লাবণ্য-প্রবাহভরে ভরি নাহি উঠে,
যতক্ষণে মহানন্দে নাহি যায় টুটে
চেতনাবেদনাবন্ধ, ভুলে যাই সব
কী আশা মেটে নি প্রাণে, কী সংগীতরব
গিয়েছে নীরব হয়ে, কী আনন্দসুধা

অধরের প্রান্তে এসে অন্তরের ক্ষুধা
না মিটায়ে গিয়াছে শুকায়ে।

জীবনের এই বঞ্চনা, এই অতৃপ্তি কবি ভুলতে চাইছেন স্বপ্নমিলনের মধ্যে। মনোময়ী রতির এই মানস সম্ভোগ মৃত্যুখণ্ডিত চিরজীবী প্রেমেরই বিজয়-বৈজয়ন্তী।

৩৭

মানসসুন্দরীতে কবি বিরহের স্বর্গলোক রচনা করেছেন। জগতের নদীগিরি সকলের শেষে 'রবিহীন মণিদীপ্ত' সেই 'প্রদোষের দেশে' তাঁর মানস-অভিসার জন্মমৃত্যুশাসিত মর্ত্যসীমাকে চূর্ণ করেছে। স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে মৃত্যু যে সেতু নির্মাণ করে দিয়েছে সেই সেতু-পথেই চলছে দুজনের সকৌতুক চকিত মিলন :

এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে ; স্বর্গ হতে মর্ত্যভূমি
করিছ বিহার ; সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল ; ঊষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা ; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার, তলতল ছলছলে
ললিত যৌবনখানি ,

কখন অজ্ঞাতে আসি ছুঁয়ে যাও প্রাণ
সকৌতুকে ; করি দাও হৃদয় বিকল,
অঞ্চল ধরিতে গেলে পালাও চঞ্চল
কলকণ্ঠে হাসি', অসীম আকাঙ্ক্ষারাশি
জাগাইয়া প্রাণে, দ্রুতপদে উপহাসি'
মিলাইয়া যাও নভোনীলিমার মাঝে।
কখনো মগন হয়ে আছি যবে কাজে
স্খলিতবসন তব শুভ্র রূপখানি

নগ্ন বিদ্যুতের আলো নয়নেতে হানি
চকিতে চমকি চলি যায়।

নিত্যবিরহের মধ্যে এই নিত্যমিলন রবীন্দ্র-প্রেমচেতনার এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল 'যথার্থ দোসরে'র সঙ্গে অনন্ত-দাম্পত্যের কল্পনা। সে দাম্পত্য জন্মজন্মান্তরের। মানসসুন্দরীকে সম্বোধন করে কবি তাঁর এই নিগূঢ় প্রতীতিকে ভাষা দিয়ে বলছেন:

মানসীরূপিণী ওগো, বাসনা-বাসিনী,
আলোকবসনা ওগো, নীরবভাষিণী,
পরজন্মে তুমিই কি মূর্তিমতী হয়ে
জন্মিবে মানব-গৃহে নারীরূপ লয়ে
অনিন্দ্যসুন্দরী ?

এই সম্বোধনবাক্যের 'মানসীরূপিণী' এবং 'বাসনাবাসিনী' শব্দ দুটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। কবি বলছেন:

সেই তুমি
মূর্তিতে দিবে কি ধরা ? এই মর্ত্যভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে ?
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সর্ব ঠাঁই হতে সর্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ—ধরণীর একধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মুরতি ?

তারপর কবি কল্পনা করছেন, পরজন্মে দুজনের দেখা হলে তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে চিরপ্রেমের আলোকে চিনতে পারবেন কি করে—

জানি, আমি জানি, সখী,
যদি আমাদের দোঁহে হয় চোখোচোখি
সেই পরজন্ম-পথে,—দাঁড়াব থমকি,
নিদ্রিত অতীত কাঁপি উঠিবে চমকি
লভিয়া চেতনা। জানি মনে হবে মম
চিরজীবনের মোর ধ্রুবতারাসম
চিরপরিচয়-ভরা ঐ কালো চোখ।

আমার নয়ন হতে লইয়া আলোক,
আমার অন্তর হতে লইয়া বাসনা
আমার গোপন প্রেম করেছে রচনা
ওই মুখখানি। তুমিও কি মনে মনে
চিনিবে আমারে। আমাদের দুইজনে
হবে কি মিলন। দুটি বাহু দিয়ে বালা
কখনো কি এই কণ্ঠে পরাইবে মালা
বসন্তের ফুলে। কখনো কি বক্ষ ভরি
নিবিড় বন্ধনে, তোমারে হৃদয়েশ্বরী,
পারিব বাঁধিতে। পরশে পরশে দোঁহে
করি বিনিময়, মরিব মধুর মোহে
দেহের দুয়ারে?

অর্থাৎ এ জীবনে যে বাসনা কোনোদিনই তৃপ্ত হল না, পরজন্মে মধুর মিলনে তাই সার্থক হয়ে উঠবে, নিত্য-বিরহের মধ্যে এই নিত্য-মিলনের বিশ্বাসই প্রেমের শিখাকে চির-উজ্জ্বল করে রেখেছে। শুধু মিলনের আনন্দই নয়, যা এজন্মে সম্ভব হয় নি তাই পরজন্মে সত্য হয়ে উঠবে। এপিসাইকিডিয়নের ভাষায় "ভালোবাসা—বেঁচে থাকা—এক হয়ে যাবে।" তারই কল্পিত চিত্র অঙ্কন করে কবিতাটি ভাবের চরম শিখরে আরোহণ করেছে—

জীবনের প্রতিদিন
তোমার আলোক পাবে বিচ্ছেদবিহীন,
জীবনের প্রতিরাত্রি হবে সুমধুর
মাধুর্যে তোমার, বাজিবে তোমার সুর
সর্ব দেহে মনে? জীবনের প্রতি সুখে
পড়িবে তোমার শুভ্র হাসি, প্রতি দুখে
পড়িবে তোমার অশ্রুজল, প্রতি কাজে
রবে তব শুভহস্ত দুটি, গৃহমাঝে
জাগায়ে রাখিবে সদা সুমঙ্গল জ্যোতি।

এই আদর্শ দাম্পত্যচিত্র রচনা করেই কবিতাটি সমাপ্ত হয়েছে। উপসংহারে কবি তাঁর দেশকাল-অনালিঙ্গিত স্বপ্নাভিসার শেষ করে আবার নেমে এসেছেন

তাঁর পদ্মার গৃহনৌকোয়। রজনী গভীর হয়েছে, দীপ নিবে এসেছে। পদ্মার সুদূর পারে পশ্চিম আকাশে সায়াহ্নের শেষ স্বর্ণলেখা মিলিয়ে গেছে। কবি যেন এক চিরবাঞ্ছিত মিলনের সুখস্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছেন। বলছেন:

কী কথা বলিতেছিনু, কী জানি, প্রেয়সী,
অর্ধ-অচেতনভাবে মনোমাঝে পশি
স্বপ্নমুগ্ধ-মতো। কেহ শুনেছিলে সে কি,
কিছু বুঝেছিলে প্রিয়ে, কোথাও আছে কি
কোনো অর্থ তার। সব কথা গেছি ভুলে,
শুধু এই নিদ্রাপূর্ণ নিশীথের কূলে
অন্তরের অন্তহীন অশ্রু-পারাবার
উদ্বেলিয়া উঠিয়াছে হৃদয়ে আমার
গভীর নিস্বনে।

অন্তরের এই অন্তহীন অশ্রুপারাবারে নিমজ্জিত হয়েই কবি তাঁর মানসসুন্দরীর সঙ্গে এক অপূর্ব মিলনের দিব্যস্বপ্ন রচনা করেছেন এই কবিতায়। মনোময়ী রতির আস্বাদন যে কী অপূর্ব হতে পারে, তারই চরম সাক্ষ্য এই কবিতা। আধুনিক বাংলা প্রেমকাব্যে রবীন্দ্রনাথের 'মানসসুন্দরী' অদ্বিতীয়, অতুলনীয়।

৪০

'সোনার তরী'-'চিত্রা'র যুগে কবির সৌন্দর্য-চেতনা ও জীবনদেবতা-চেতনাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই যুগেও কাদম্বরী দেবীর মানবীমূর্তি এবং তাকে অবলম্বন করে কবিমানসে বিলসিত বিরহ-বিপ্রলম্ভের উপলব্ধি মৃত্যু-চেতনার প্রেক্ষাপটে এক নূতন মাধুর্য বহন করে এনেছে। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রজীবননাট্যে মৃত্যুর আবির্ভাব ঘটেছে এক অভিনব মূর্তিতে। ভানুসিংহের বিরহিণী রাধা মৃত্যুকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান।' 'কড়ি ও কোমলে'র পরবর্তী রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে দেখেছেন জীবনের দয়িতরূপে। মৃত্যুর সঙ্গে মিলিত হয়েই জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তাই রবীন্দ্র-চেতনায় জীবন-বধূর বরবেশেই মৃত্যুর আবির্ভাব। প্রতিদিনের সুখের মোহাবেশ থেকে ছিন্ন করে মৃত্যু কবিকে

দীক্ষা দিয়েছে 'রুদ্র আনন্দে'। মৃত্যুই কবিচিত্তকে অসীমাভিসারী করেছে। এই অধ্যায়ের পঞ্চবিংশ পর্বে 'পঞ্চভূতে'র "অপূর্ব রামায়ণ" প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত কবির অবিস্মরণীয় উক্তিটিকে আবার স্মরণ করা যেতে পারে: 'যেদিকে মৃত্যু সেই দিকেই জগতের অসীমতা। সেই অনন্ত রহস্যভূমির দিকেই মানুষের সমস্ত কবিতা, সমস্ত সংগীত, সমস্ত ধর্মতন্ত্র, সমস্ত তৃপ্তিহীন বাসনা সমুদ্রপারগামী পক্ষীর মতো নীড় অন্বেষণে উড়িয়া চলিয়াছে।'

'মানসী', 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা' কাব্যে কবির মৃত্যুচেতনা ভাষা পেয়েছে 'মরণস্বপ্ন', 'প্রতীক্ষা', 'ঝুলন', 'স্নেহস্মৃতি' ও 'মৃত্যুর পরে' কবিতায়। শেষোক্ত কবিতা—'মৃত্যুর পরে'—রচিত হয় কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর দশ বৎসর পরে। ৮ বৈশাখ কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুদিন। ১৩০০ সালের বর্ষশেষে কবি লিখলেন 'স্নেহস্মৃতি'। ১৩০১ সালের বর্ষারম্ভে লিখলেন 'নববর্ষে', এবং একই দিনে, ৫ বৈশাখে, দুটি কবিতা—'দুঃসময়' ও 'মৃত্যুর পরে'। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর দশ বৎসর পরেও কবিমানসে মৃত্যুশোক কতটা জীবন্ত ছিল তারই সাক্ষ্য বহন করছে এই কবিতাগুলি। 'স্নেহস্মৃতি' দিয়ে এই শোকোচ্ছ্বাসের সূত্রপাত। 'সেই চাঁপা, সেই বেলফুল!' বর্ষশেষের প্রভাতে কবির হাতে প্রিয়জনের উপহার এল 'সেই চাঁপা, সেই বেলফুল।' অমনি তাঁর মনে পড়ল :

কতদিন পরিয়াছি সন্ধ্যাবেলা মালাগাছি
স্নেহের হস্তের গাঁথা বকুল-মুকুল ;
বড়ো ভালো লেগেছিল যেদিন এ হাতে দিল
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল !

কবির মনে পড়ল, কত বাঁশি, কত হাসি, উৎসবের দিনে কত কৌতুক তাঁর প্রাণের বীণায় আনন্দের সুরে ঝংকৃত হয়ে উঠেছিল। আজ 'আনন্দ পাথেয় যত, সকলি হয়েছে গত / দুটি রিক্তহস্তে মোর আজি কিছু নাই।' জীবনের 'এই-ধূলিময় শুষ্কপথে' কবি তাঁর নিয়তির সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিয়েছেন। তিনি জেনেছেন এ জীবনে 'সেই চাঁপা, সেই বেলফুল' আর কখনও ফুটবে না। তাই তিনি বলছেন :

আমি কিছু নাহি চাই, যাহা দিবে লব তাই,
চিরসুখ এ জগতে কে পেয়েছে কবে।
প্রাণে লয়ে উপবাস কাটে কত বর্ষমাস,

তৃষিত তাপিত চিত্ত কত আছে ভবে।
শুধু এক ভিক্ষা আছে, যেদিন আসিবে কাছে
জীবনের পথশেষে মরণ অকূল
সেদিন স্নেহের সাথে তুলে দিয়ো এই হাতে
সেই চাঁপা সেই বেলফুল !

কবিতাটি নিতান্তই একটি শোককাতর চিত্তের বিলাপসংগীত। 'স্নেহের হস্তের গাঁথা বকুল-মুকুল', 'সেই চাঁপা, সেই বেলফুল'—হারানো দিনের প্রেমের সুরভি-প্রতীক হয়ে সমস্ত কবিতাটিতে এক অপূর্ব মাধুর্য বিছিয়ে দিয়েছে। বেদনাদোলে আন্দোলিত স্মৃতির সৌরভে কবিতাটি আমোদিত। তত্ত্বভারহীন বিশুদ্ধ লিরিক হিসাবে অনবদ্য। পাঁচদিন পরে লেখা 'মৃত্যুর পরে' কবিতায় হৃদয়াবেগের সঙ্গে মিলিত হয়েছে তত্ত্বভাবনা। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর দশ বৎসর পরেও আত্মীয়পরিজনমহলে তাঁর 'আত্মখণ্ডন' যে হৃদয়হীন সমালোচনার বিষয়ীভূত ছিল তারই আভাস বহন করছে এই কবিতাটি। এই প্রতিকূল সমালোচনাই অনুরক্ত কবিচিত্তে জীবনজিজ্ঞাসার সৃষ্টি করেছে।—

হেথায় যে অসম্পূর্ণ,
সহস্র আঘাতে চূর্ণ
বিদীর্ণ বিকৃত,
কোথাও কি এক বার
সম্পূর্ণতা আছে তার
জীবিত কি মৃত।
জীবনে যা প্রতিদিন
ছিল মিথ্যা অর্থহীন
ছিন্ন ছড়াছড়ি
মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি
তারে গাঁথিয়াছে আজি
অর্থপূর্ণ করি।

এই জিজ্ঞাসারই উত্তর কবি খুঁজে পেলেন নিজের মনে। একটি পরম বিশ্বাসের মধ্যে তাঁর সমস্ত সংশয়, সমস্ত বিক্ষোভ বিলীন হল। এই বিশ্বাসেই মৃত্যু হলেন কবির প্রণম্য দেবতা। কবি বলছেন :

কত শিক্ষা পৃথিবীর
খসে পড়ে জীর্ণচীর
জীবনের সনে,
সংসারের লজ্জাভয়
নিমেষেতে দগ্ধ হয়
চিতা-হুতাশনে।
সকল অভ্যাস-ছাড়া
সর্ব আবরণহারা
সদ্য শিশুসম
নগ্নমূর্তি মরণের
নিষ্কলঙ্ক চরণের
সম্মুখে প্রণমো।

মৃত্যু জীবনকে নবীনতা দান করে, জীবনের নূতন মূল্যবোধ রচনা করে, তাই মৃত্যু বরণীয়। ইহজগতে যা অসম্পূর্ণ, 'সহস্র আঘাতে চূর্ণ / বিদীর্ণ বিকৃত', মৃত্যু তাকে সম্পূর্ণতা দান করে, জীবনের সমস্ত সংকীর্ণ চেতনাকে অসীমে প্রসারিত করে নূতন তাৎপর্যে মণ্ডিত করে তোলে, তাই মৃত্যুই জীবনের 'শেষ পরিপূর্ণতা'। কবি এই 'সর্ব আবরণহীন', 'নগ্নমূর্তি', 'নিষ্কলঙ্ক' মরণের কাছে আত্মনিবেদন করেই দুঃখতরণ শঙ্কাহরণ মন্ত্র পেয়েছিলেন, তাই তাঁর শোকাভিভূত চিত্তে মৃত্যু ছিল বাঞ্ছিত দয়িত।

৪১

কাদম্বরী দেবীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর উদ্দেশে নিবেদিত 'পুষ্পাঞ্জলি'তে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর দেশকেই বলেছেন তাঁর 'স্বদেশ'। বলেছেন, "বিস্মৃতিই যদি আমাদের অনন্তকালের বাসা হয় আর স্মৃতি যদি কেবলমাত্র দুদিনের হয় তবে সেই আমাদের স্বদেশেই যাই-না কেন! সেখানে আমার শৈশবের সহচর আছে; সে আমার জীবনের খেলাঘর এখান হইতে ভাঙিয়া লইয়া গেছে—যাবার সময় সে আমার কাছে কাঁদিয়া গেছে—যাবার সময় সে আমাকে তাহার শেষ ভালবাসা দিয়া গেছে।"[৮২]

প্রিয়মিলনের জন্যে মৃত্যুলোকে যাওয়ার এই বাসনাই প্রথম কাব্যরূপ পেল 'মানসী'তে "মরণস্বপ্ন" কবিতায়। কবিতাটি কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর চতুর্থ বৎসরে বৈশাখের সতেরো তারিখে লেখা। সেদিন কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ। প্রথম সন্ধ্যায় গগনের কোণে ম্লান চাঁদ দেখা দিয়েছে। আর

স্বদেশ পুরব হতে বায়ু বহে আসে
দূর স্বজনের যেন বিরহের শ্বাস।

কবির 'জাগ্রত আঁখির আগে কখনো বা চাঁদ জাগে / কখনো বা প্রিয় মুখ ভাসে'। সেই স্বপ্নাবিষ্ট চেতনায় এল 'মরণস্বপ্ন'—

রাজহংস ভেসে যায় অপার আকাশে
দীর্ঘ শুভ্র পাখা খুলি চন্দ্রালোক পানে তুলি ;
পৃষ্ঠে আমি কোমল শয়নে ;
সুখের মরণসম ঘুমঘোর আসে।

সেই স্বপ্নাচ্ছন্ন অর্ধজাগরণে কবির যে অভিজ্ঞতা হল তারই বর্ণনার উপসংহারে তিনি বলেছেন :

ক্রমে মিলাইয়া গেল সময়ের সীমা ;
অনন্তে মুহূর্তে কিছু ভেদ নাহি আর।
ব্যাপ্তিহারা শূন্যসিন্ধু শুধু যেন এক বিন্দু
গাঢ়তম অন্তিম কালিমা।
আমারে গ্রাসিল সেই বিন্দু-পারাবার।

এই পরাবাস্তব অভিজ্ঞতায় কবি এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে আবিষ্ট হলেন। সময়ের সীমা গেছে হারিয়ে, মুহূর্তই হয়ে উঠেছে অনন্ত। সেই স্বপ্নাবেশে কবিচিত্ত এক অভূতপূর্ব উপলব্ধি লাভ করল—

অন্ধকারহীন হয়ে গেল অন্ধকার।
'আমি' বলে কেহ নাই, তবু যেন আছে
অচৈতন্যতলে অন্ধ চৈতন্য হইল বন্ধ,
রহিল প্রতীক্ষা করি কার।
মৃত হয়ে প্রাণ যেন চিরকাল বাঁচে।

মৃত্যু এই চিরজীবনের আশ্বাস বহন করে এনেছে, 'মৃত হয়ে প্রাণ যেন চিরকাল বাঁচে', তাই জিজীবিষু কবি মৃত্যুকে অন্তরে আসন করে দিয়েছেন। তাই

আমাদের নিয়ে যায় চেতনার গহন গভীরে। দুরুদুরু হৃদয়-পঞ্জর-তটে অনন্তের ঢেউ এসে লাগে, বেজে ওঠে দিশাহীন সমুদ্রের ভৈরব সংগীত। কবিতার তৃতীয় স্তবকে প্রশ্নচ্ছলে এই-প্রতীতিই ভাষা পেয়েছে—

যে সুদূর সমুদ্রের পরপার-রাজ্য হতে
আসিয়াছ হেথা,
এনেছ কি সেথাকার নূতন সংবাদ কিছু
গোপন বারতা।
সেথা শব্দহীন তীরে উর্মিগুলি তালে তালে
মহামন্দ্রে বাজে,
সেই ধ্বনি কী করিয়া ধ্বনিয়া তুলিছ মোর
ক্ষুদ্র বক্ষোমাঝে।
রাত্রিদিন ধুকধুক হৃদয়পঞ্জর-তটে
অনন্তের ঢেউ,
অবিশ্রাম বাজিতেছে সুগম্ভীর সমতানে
শুনিছে না কেউ।
আমার এ হৃদয়ের ছোটোখাটো গীতগুলি,
স্নেহ-কলরব,
তারি মাঝে কে আনিল দিশাহীন সমুদ্রের
সংগীত ভৈরব ;

জীবনের পথে এইখানেই মৃত্যুর আবির্ভাবের পরম সার্থকতা। প্রতিদিনের তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী হাসিকান্না এবং সুখদুঃখের মোহাবেশ থেকে মুক্তি দিয়ে সে আমাদের যুক্ত করে বিশ্বজীবনের রহস্যলীলার সঙ্গে। সেখানে অনন্তের অন্তহীন প্রেক্ষাপটে মহাকালের রুদ্র তাণ্ডব প্রত্যক্ষ করে প্রাণ মাভৈঃ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। এই মাভৈঃ মন্ত্রই জীবন-মৃত্যুর উদ্বাহমন্ত্র।

মৃত্যুর এই মাভৈঃ মন্ত্রে দীক্ষিত প্রাণের আনন্দ নৃত্যচ্ছন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে 'সোনার তরী'র 'ঝুলন' কবিতায়। 'ঝুলনে'র অন্য নাম হতে পারত 'মরণখেলা'। যে-চেতনার আবির্ভাবের মনস্তাত্ত্বিক ইতিহাস রচিত হয়েছে 'প্রতীক্ষা' কবিতায়, তারই উপলব্ধিজনিত আনন্দ গীতিকাব্যের ভাষায় ক্ষরিত হয়েছে 'ঝুলনে'। ষণ্মাত্রিক ধ্বনিপ্রধান ছন্দে রুদ্র-আনন্দের মহামন্ত্র রচনায়

এখানে রবীন্দ্রনাথ যে পরমা সিদ্ধি লাভ করেছেন সমগ্র জীবনের সৃষ্টিলীলায় সাফল্যের সেই তুঙ্গশিখর তিনি আর কখনও স্পর্শ করতে পারেন নি। এই অনবদ্য গীতিকাব্যের রসরহস্যের ভূমিকা হিসাবে আমরা রবীন্দ্রনাথের একটি গদ্যরচনার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চাই।

৪২

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর আঠারো বছর পরে রবীন্দ্র-জীবনে মৃত্যুর পুনরাবির্ভাব ঘটল। কবিজায়া মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হল ১৩০৯ সালের ৭ অগ্রহায়ণ। আট-ন মাস যেতে-না-যেতেই কবি হারালেন তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকাকে, পরবর্তী শরতে। জীবনে মৃত্যুর এই দ্বিতীয় আবির্ভাবে কবি মৃত্যুদেবতার বন্দনা করলেন 'পাগল' প্রবন্ধে। ১৩১১ সালের শ্রাবণ সংখ্যার বঙ্গদর্শনে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হল। প্রবন্ধটি রচিত হয় মজঃফরপুরে আষাঢ় মাসে। আষাঢ়ের বৃষ্টিধৌত নীলাকাশের নিচে নিবিড় মধ্যাহ্নের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে কবি ভোলানাথের ডিমিডিমি ডমরুধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। সেই পরিবেশে 'মৃত্যুর উলঙ্গ শুভ্র মূর্তিটি' তাঁর চোখে প্রতিভাত হল। কবি পুনরায় রুদ্রমন্ত্র উচ্চারণ করলেন—

হে রুদ্র, তোমার ললাটের যে ধ্বক্‌ধ্বক্ অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গমাত্রে অন্ধকারে গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, সেই শিখাতেই লোকালয়ে সহস্রের হাহাধ্বনিতে নিশীথরাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। হায় শম্ভু, তোমার নৃত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহাপুণ্য ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সংসারের উপরে প্রতিদিনের জড়হস্তক্ষেপে যে একটা সামান্যতার একটানা আবরণ পড়িয়া যায়, ভাল মন্দ দুয়েরই প্রবল আঘাতে তুমি তাহাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে থাক ও প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত তরঙ্গিত করিয়া শক্তির নব নব লীলা ও সৃষ্টির নব নব মূর্তি প্রকাশ করিয়া তোলো। পাগল, তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত হৃদয় যেন পরাঙ্মুখ না হয়। সংহারের রক্ত আকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র যেন ধ্রুবজ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। নৃত্য করো, হে উন্মাদ, নৃত্য করো। সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষ-

কোটিযোজনব্যাপী নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্রসংগীতের তাল কাটিয়া না যায়। হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভালো এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক।[৮৩]

এই প্রবন্ধ রচনার এক যুগ আগে [১২৯৯, ১৫ চৈত্র] 'সোনার তরী'র "ঝুলন" কবিতাটি রচিত। দুটি রচনার আত্মিক যোগসূত্র আবিষ্কার করা মোটেই আয়াসসাধ্য নয়।

দুটি রচনায় "পাগল" শব্দটির ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত। প্রবন্ধে বলা হয়েছে, 'এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন', 'তিনি কেবল নিখিলকে নিয়মের বাহিরের দিকে টানিতেছেন।' 'ইহার হাতে বাঁশি নাই, সামঞ্জস্যের সুর ইহার নহে, পিনাক ঝংকৃত হয়, বিধিবিহিত যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায় এবং কোথা হইতে একটি অপূর্বতা উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে।' প্রবন্ধকার তাঁকে সম্বোধন করেই বলছেন, 'পাগল, তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত হৃদয় যেন পরাঙ্মুখ না হয়।' কবিতায়ও কবি বলছেন, 'স্বপ্ন টুটিয়া বাহিরিছে আজ দুটো পাগোল'। এই পাগল দুটি হলেন কবি স্বয়ং এবং তাঁর প্রাণ। প্রাণকে নিয়ে পাগলের রুদ্র-তাণ্ডবে যোগ দেবার আনন্দই কবিতাটির আলম্বন। কবি এতদিন তাঁর প্রাণকে কুসুমিত বাসরশয়নের সুখস্বপ্নে নিলীন করে রেখেছিলেন। জীবনের সমস্ত দুঃখ-ব্যথা থেকে পরম সোহাগে তাকে রেখেছিলেন আগলে।—

শেষে সুখের শয়নে শ্রান্ত পরান
আলস-রসে,
আবেশবশে।
পরশ করিলে জাগে না সে আর
কুসুমের হার লাগে গুরুভার,
ঘুমে-জাগরণে মিশি একাকার
নিশি-দিবসে।

সুখাবেশে আবিষ্ট এই জীবন্মৃত অবস্থা থেকে বাঁচবার পথ কবি খুঁজে পেলেন মরণের রুদ্রতাণ্ডবের মধ্যে। শুরু হল প্রাণের সঙ্গে তাঁর মরণখেলা—

আমি পরানের সাথে খেলিব আজিকে

মরণখেলা
নিশীথবেলা।
সঘন বরষা, গগন আঁধার,
হেরো বারিধারে কাঁদে চারিধার,
ভীষণ রঙ্গে ভবতরঙ্গে
ভাসাই ভেলা ;
বাহির হয়েছি স্বপ্নশয়ন
করিয়া হেলা,
রাত্রিবেলা।

সেই বর্ষানিশীথে, অন্ধকার আকাশের নিচে, ভবতরঙ্গে যে ভেলা ভাসিয়ে খেলার শুরু, দেখতে দেখতে সেই ভেলাই মত্ত ঝটিকার ঠেলায় মরণদোলা হয়ে উঠল—

মরণদোলায় ধরি রশিগাছি
বসিব দু-জনে বড়ো কাছাকাছি,
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া
মারিবে ঠেলা,
আমাতে প্রাণেতে খেলিব দু-জনে
ঝুলন-খেলা
নিশীথবেলা।

এই স্তবকে এসে কবিতাটির রসরহস্য উন্মীলিত হয়েছে। প্রথম স্তবকে যা ছিল মরণ-খেলা, এইখানে এসে তা হয়ে উঠেছে মরণদোলায় ঝুলন-খেলা। কবি আর তাঁর প্রাণবঁধু সেই ঝুলন-খেলার দোসর। মৃত্যুর তাণ্ডবের মধ্য দিয়ে প্রেমের পুনরুজ্জীবনই এই কবিতার মর্মবাণী। এইখানে এসে কবির মৃত্যুচেতনারও একটি নিগূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারা যায়। মৃত্যুর মধ্যেই প্রাণ পেয়েছে মাভৈঃ মন্ত্র। তাই মরণখেলাই শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছে ঝুলনখেলা।

ঝুলনের রূপকল্পটি স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন বৈষ্ণবপদাবলী থেকে। কিন্তু তারও আগে একটি ছবি তাঁর মনকে বিশেষভাবে দোলা দিয়েছিল। কবির একবিংশতি বর্ষটি কেটেছিল চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগান-

বাড়িতে। গঙ্গাতীরের সেই দুর্গপ্রাসাদটি গঙ্গার ঘাটের সঙ্গেই গ্রথিত ছিল। তারই সর্বোচ্চতলে ছিল 'সন্ধ্যাসংগীতে'র কবির কাব্যনিকেতন। প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে সেই প্রাসাদদুর্গের বর্ণনাপ্রসঙ্গে কবি তার বৈঠকখানার শার্সিতে আঁকা দুটি ছবির কথা বলেছেন। "একটি ছবি ছিল, নিবিড় পল্লবে-বেষ্টিত গাছের শাখায় একটি দোলা—সেই দোলায় রৌদ্রছায়াখচিত নিভৃত নিকুঞ্জে দুজনে দুলিতেছে,… শার্সির উপরে আলো পড়িত এবং এই ছবিগুলি বড় উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিত। এই ছবি দুটি সেই গঙ্গাতীরের আকাশকে যেন ছুটির সুরে ভরিয়া তুলিত।… কোথাকার কোন্ একটি চিরনিভৃত ছায়ায় যুগলদোলনের রসমাধুর্য নদীতীরের বনশ্রেণীর মধ্যে একটি অপরিস্ফুট গল্পের বেদনা সঞ্চার করিয়া দিত।" [৮৪]
এই অপরিস্ফুট বেদনাকেই কবি ভাষা দিয়েছেন 'ছবি ও গানে'র "দোলা" কবিতায়।—

গলেতে বাহু বেঁধে
দুজনে কাছাকাছি,
দুলিছে এলো চুল
দুলিছে মালাগাছি।
আঁধার ঘনাইল,
পাখিরা ঘুমাইল,
সোনার রবি-আলো আকাশে মিলাইল।
মেঘেরা কোথা গেল চলে,
দুজনে বসে বসে দোলে।[৮৫]

'ছবি ও গানে'র যুগে সপ্তমাত্রিক ধ্বনিপ্রধান ছন্দের এই হিন্দোলা কবির সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসে নি। কিন্তু বৈঠকখানার সেই যুগলদোলনের রসমাধুর্য কবিকল্পনাকে গভীরভাবেই স্পর্শ করেছিল। তাই চিত্রার্পিত নায়ক-নায়িকা কবিতার অন্তিম পঙ্‌ক্তিমিথুনে আকাশের যুগল-তারায় রূপান্তরিত হয়েছিল—

পৃথিবী ছাড়িয়া যেন তারা
দুটিতে হয়েছে দুটি তারা।

এই ছবিটির অনুপ্রেরণার সঙ্গে পরবর্তীকালে মিশেছে বৈষ্ণবপদাবলীর ঝুলনলীলার অনুষঙ্গ। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর এক বৎসর পরে [১২৯২ বৈশাখ] শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে সম্পাদিত 'পদরত্নাবলী'তে রবীন্দ্রনাথ উদ্ধব দাসের

একটি ঝুলনের পদ উদ্ধার করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনলীলা বর্ষার উৎসব। রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রেক্ষাপটেও রয়েছে বর্ষার তাণ্ডব—

সঘন বরষা, গগন আঁধার,
হেরো বারিধারে কাঁদে চারিধার,
ভীষণ রঙ্গে ভবতরঙ্গে
ভাসাই ভেলা।

এর সঙ্গে দু'টি বৈষ্ণব পদের তুলনা করা যাক—

সঘন মগন গগন ঘোর
হরখে গরজে বরখে জোর [নন্দদাস

অথবা

ঝুলত রঙ্গে নাগর সঙ্গে
প্রেম তরঙ্গে পুলক অঙ্গে…[কৃষ্ণানন্দ

ভাষা ও ছন্দের এই সাদৃশ্য অবশ্যই চোখে পড়বার মত। কিন্তু বৈষ্ণবের ঝুলনলীলা একান্তভাবেই মাধুর্যলীলা। রবীন্দ্রনাথ তাকে মৃত্যুর তাণ্ডবের সঙ্গে যুক্ত করে 'পবনে গগনে সাগরে' সম্প্রসারিত করে দিয়েছেন। ঝঞ্ঝা এসে অট্টহেসে দোলনাকে প্রচণ্ডবেগে আন্দোলিত করছে। লক্ষ যক্ষশিশুর অট্টরোল শোনা যাচ্ছে। 'আকাশে পাতালে পাগলে মাতালে' হট্টগোল উঠেছে। বৈষ্ণবের আনন্দোৎসব রবীন্দ্রনাথের হাতে মৃত্যুঞ্জয় জীবনতাণ্ডবে রূপান্তরিত হয়েছে। কবি বলছেন :

আয় রে ঝঞ্ঝা, পরান-বধূর
আবরণরাশি করিয়া দে দূর,
করি লুণ্ঠন অবগুণ্ঠন
বসন খোল্।

মৃত্যুর সংগমে কবিচেতনার এই আবরণভঙ্গের রুদ্রলীলায় কবিমানসেরও চরম শক্তিপরীক্ষা হল। এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রেমেরই জয় হল।

বধূরে আমার পেয়েছি আবার
ভরেছে কোল।
প্রিয়ারে আমার তুলেছে জাগায়ে
প্রলয়-রোল।

এই জন্যেই আমরা 'ঝুলন' কবিতাকে বলেছি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রেমের পুনরুজ্জীবন। এবং এখানেই আবার স্মরণ করতে হবে যে, কবির মৃত্যুচেতনা উপেয় নয়, উপায় মাত্র। জীবনমৃত্যুর হরণপূরণের বিশ্বলীলার মধ্য দিয়ে কবি তাঁর প্রেমচেতনাকে সামগ্রিক জীবনচেতনার সঙ্গে যুক্ত করে পেলেন। 'মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর' অনাসক্ত দৃষ্টি মেলে তিনি জগৎ ও জীবনের সত্যরূপটি আবিষ্কার করলেন। মৃত্যু এসে প্রেমকে মানসলোক থেকে বিশ্বলোকে সম্প্রসারিত করে দিল।

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রেমের এই পুনরুজ্জীবনের ইতিহাস 'চৈতালি'র চারিটি সনেটের মধ্যেও রূপায়িত হয়ে রয়েছে। ১৩০৩ সালের ৭ শ্রাবণ, একই দিনে, কবি লিখেছিলেন এই সনেট-চতুষ্টয়—'নদীযাত্রা,' 'মৃত্যুমাধুরী', 'স্মৃতি', এবং 'বিলয়'। এই প্রসঙ্গে প্রথম খণ্ডে আমরা বলেছি, নদীযাত্রায় চলতে চলতে কবিমানসে চন্দননগর-প্রবাসকালীন নতুন-বৌঠানের সঙ্গে নদীযাত্রার 'স্মৃতি' ভেসে উঠেছে।[৮৬] প্রথম চতুর্দশপদী 'নদীযাত্রা'র ষট্‌ক-বন্ধে কবি বিশ্বপ্রকৃতির পরম শান্তির মধ্যে মৃত্যুকে নবরূপে দেখতে পেলেন—

> পরিপূর্ণ ধরামাঝে বসিয়া একাকী
> চিরপুরাতন মৃত্যু আজি ম্লান-আঁখি।
> সেজেছে সুন্দর বেশে, কেশে মেঘভার
> পড়েছে মলিন আলো ললাটে তাহার।

মৃত্যুর এই সুন্দর রূপই দ্বিতীয় চতুর্দশপদী 'মৃত্যুমাধুরী'তে মধুর হয়ে উঠেছে—

> পরান কহিছে ধীরে—হে মৃত্যু মধুর,
> এই নীলাম্বর, এ কি তব অন্তঃপুর।
> আজি মোর মনে হয় এ শ্যামলা ভূমি
> বিস্তীর্ণ কোমল শয্যা পাতিয়াছ তুমি।
> জলে স্থলে লীলা আজি এই বরষার,
> এই শান্তি, এ লাবণ্য, সকলি তোমার।
>
> * * *
>
> প্রশান্ত করুণচক্ষে, প্রসন্ন অধরে
> তুমি মোরে ডাকিতেছ সর্ব চরাচরে।

প্রথম মিলনভীতি ভেঙেছে বধূর,
তোমার বিরাট মূর্তি নিরখি মধুর।
সর্বত্র বিবাহবাঁশি উঠিতেছে বাজি,
সর্বত্র তোমার ক্রোড় হেরিতেছি আজি।

তৃতীয় কবিতায় নতুন-বৌঠানের স্মৃতি কবিমানসে ভেসে উঠেছে। এবং চতুর্থ কবিতায় অসীম আকাশে নতুন-বৌঠানেরই আঁখি-দুটি কবি ভেসে উঠতে দেখলেন। ভাবতে বিস্ময় লাগে, একই দিনে, প্রায় একই নিশ্বাসে লেখা দুটি কবিতায় কবি একবার দেখছেন মৃত্যুর মধুর রূপ, সঙ্গে সঙ্গেই আবার দেখছেন নতুন-বৌঠানের অশ্রুমাখা হাসির বিকাশ। 'মৃত্যুমাধুরী'তে মৃত্যুকে সম্বোধন করে কবি বলছেন :

প্রশান্ত করুণচক্ষে, প্রসন্ন অধরে
তুমি মোরে ডাকিতেছ সর্ব চরাচরে।

আর 'বিলয়' কবিতায় নতুন-বৌঠানের মুখখানি স্মরণ করে বলছেন :

যেন তার আঁখি দুটি নবনীল ভাসে
ফুটিয়া উঠিছে আসি অসীম আকাশে।
বৃষ্টিধৌত প্রভাতের আলোক-হিল্লোলে
অশ্রুমাখা হাসি তার বিকাশিয়া তোলে।
তার সেই স্নেহলীলা সহস্র আকারে
সমস্ত জগৎ হতে ঘিরিছে আমারে।

এর পর আর সন্দেহ থাকে না যে, কবি মৃত্যুর জন্যেই মৃত্যুকে ভালবাসেন নি, প্রেমের জন্যেই মৃত্যুকে ভালবেসেছেন। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই প্রেমের পুনর্জন্ম হয়েছে। মৃত্যুই প্রেমকে বিশ্বের প্রেক্ষাপটে অমরত্ব দান করেছে।

৪৩

'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থে কাদম্বরী দেবীর আবির্ভাব নব নব রূপে ঘটেছে। চিত্রায় অন্তর্যামী-জীবনদেবতার পাশেই রয়েছে তাঁর মানবীমূর্তি। কিন্তু চৈতালিতে প্রেয়সী ও শ্রেয়সী যেন একই বিগ্রহে অভেদাঙ্গ।

"গীতহীন" কবিতায় কবি বলছেন, 'চলে গেছে মোর বীণাপাণি'। বলছেন :

চলে গেছে মোর বীণাপাণি।
কতদিন হল সে না জানি।
কী জানি কী অনাদরে বিস্মৃত ধূলির 'পরে
ফেলে রেখে গেছে বীণাখানি।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, এ কবিতা বুঝি বাগ্‌দেবীর উদ্দেশে বিরচিত। অনেকদিন কবিতা লেখা হয় নি, তাই এ আক্ষেপ। কিন্তু ইতিহাস অন্য কথা বলছে। 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থ শেষ হয়েছে ১৩০২ সালের ফাল্গুনে। ফাল্গুনে লেখা সাতটি কবিতা 'চিত্রা'য় সংকলিত হয়েছে। শেষ কবিতা "সিন্ধুপারে" লেখা ৩০ ফাল্গুন। 'চৈতালি'র ৭৯টি কবিতার মধ্যে পঞ্চাশটি লেখা ১৩০২ সালের চৈত্র মাসে। কাজেই কবিতা লিখতে না পারার জন্যে এ আক্ষেপ নয়। আসলে কবি তাঁর মানসসুন্দরীকেই বলছেন বীণাপাণি। তিনিই কবির কাব্যরচনার প্রেরণাদাত্রী দেবী। 'কবির অন্তরে তুমি কবি'। 'চিত্রা'র "অন্তর্যামী" কবিতায় বলেছেন :

অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।

কাব্যরচনার এই প্রেরণাদাত্রী বীণাপাণিকে 'সোনার তরী'র "মানসসুন্দরী" কবিতায় কবি শুধু প্রেয়সীরূপেই ধ্যান করেছেন। স্পষ্টই বলেছেন :

বীণা ফেলে দিয়ে এস, মানসসুন্দরী,
দুটি রিক্ত হস্ত শুধু আলিঙ্গনে ভরি
কণ্ঠে জড়াইয়া দাও,—

কিন্তু এই প্রেয়সী মানসসুন্দরীই কবির 'আজন্ম-সাধন-ধন' 'কবিতা, কল্পনা-লতা'। 'চৈতালি'র "উৎসর্গ" কবিতায় কবি তাঁকেই আহ্বান করেছেন তাঁর জীবনের 'দ্রাক্ষা-কুঞ্জবনে'।—

তুমি এস নিকুঞ্জ-নিবাসে,
এস মোর সার্থক-সাধন।

বলাই বাহুল্য, মানসসুন্দরীর 'আজন্ম-সাধন-ধন'ই এই কবিতার 'সার্থক-সাধন'। মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থে' জীবনদেবতা পর্যায়ের প্রথমেই চৈতালির

এই "উৎসর্গ" কবিতাটিকে স্থান দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু উৎসর্গ কবিতায় জীবনদেবতার প্রেমলীলাই মুখ্য আস্বাদনীয়।—

লুটে লও ভরিয়া অঞ্চল
জীবনের সকল সম্বল,

অন্তর্যামীর লীলারসকে ইন্দ্রিয়-সীমানায় এনে কবি এ-কবিতায় যে সম্ভোগ-নৈবেদ্য রচনা করেছেন, ইন্দ্রিয়াকুলতার এমন 'অসহ উচ্ছ্বাস' রবীন্দ্রকাব্যে কদাচিৎ দৃশ্যমান হয়েছে।—

শুক্তিরক্ত নখরে বিক্ষত
ছিন্ন করি ফেলো বৃন্তগুলি,
সুখাবেশে বসি লতামূলে
সারাবেলা অলস অঙ্গুলে
বৃথা কাজে যেন অন্যমনে
খেলাচ্ছলে লহ তুলি তুলি
তব ওষ্ঠে দশন-দংশনে
টুটে যাক পূর্ণ ফলগুলি।

মানসসুন্দরী কবিতার মানস-সম্ভোগ এই স্তবকে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের মাধুরীতে অনবদ্য। দ্রাক্ষাকুঞ্জের বেদন-নিবেদনের এই রূপকল্পটি জীবনের সকল-সম্বল-সমর্পণ-করা ঐকান্তিক নিষ্ঠারই প্রতীক।

অথচ, ভেবে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না যে, "উৎসর্গ" এবং "গীতহীন" কবিতা দুটি একই দিনে লেখা। যে বীণাপাণি কবিকে পরিত্যাগ করে চলে গেছেন বলে "গীতহীন" কবিতায় কবি আক্ষেপ করছেন, তাঁকেই জীবনের দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে আহ্বান করে 'জীবনের সকল সম্বল' সমর্পণ করে দিয়েছেন "উৎসর্গ" কবিতায়।

পরদিন লেখা "স্বপ্ন" কবিতায় কিন্তু কবিচেতনা নেমে এসেছে একেবারে মর্ত্যপ্রেমের প্রাকৃত স্তরে। কবি বলছেন :

কাল রাতে দেখিনু স্বপন ;—
দেবতা-আশিস সম   শিয়রে সে বসি মম
মুখে রাখি করুণ নয়ন
কোমল অঙ্গুলি শিরে   বুলাইছে ধীরে ধীরে

স্বধামাখা প্রিয়-পরশন—
কাল রাতে হেরিনু স্বপন।

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর এগারো বৎসর পরে লেখা এই কবিতা। এখানে কিন্তু 'কবি' সম্পূর্ণই অনুপস্থিত। জেগে আছে প্রেম। আর আছে একটি পরম বিশ্বাস। মৃত্যুর শাসন-লঙ্ঘন-করা সেই মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসই কবিমানসে রচনা করেছে প্রবাস-বিপ্রলম্ভের স্বপ্নকামনা। তিনি নিজে যেমন স্বপ্নযোগে প্রিয়ার 'সুধামাখা প্রিয়-পরশন' লাভ করছেন, তেমনি আরেকটি স্বপ্ন-সম্ভাবনাও তাঁর মনে সঙ্গে সঙ্গে উদিত হয়েছে—

শিথানে মাথাটি থুয়ে সেও একা শুয়ে শুয়ে
কী জানি কী হেরিছে স্বপন,
দ্বিপ্রহরা যামিনী যখন।

যে-বিশ্বাস এই পারস্পরিক স্বপ্ন-মিলন রচনা করেছে সেই বিশ্বাসেই কবি 'মানসী'র যুগে লিখেছিলেন "মানসিক অভিসার" কবিতাটি।—

হয়তো বা এখনি সে এসেছে হেথায়
মৃদুপদে পশিতেছে এই বাতায়নে ;
মানসমূরতিখানি আকুল আমায়
বাঁধিতেছে দেহহীন স্বপ্ন-আলিঙ্গনে।

শুধু এই যুগেই নয়, সারাজীবনই কবি ভাবসম্মিলনে এই স্বপ্ন-আলিঙ্গনের আস্বাদনে বিভোর হয়ে ছিলেন।

৪৪

১৩০২ সালের চৈত্রে লেখা কাব্য-পঞ্চাশতের বেশির ভাগই সনেটকল্প চতুর্দশপদী রচনা। চৈত্রের শেষ সপ্তাহে কবিমানসে আবার কাদম্বরী দেবীর আবির্ভাব ঘটল। ২৮ চৈত্র চারিটি চতুর্দশপদী লিখলেন—মানসী, নারী, প্রিয়া এবং ধ্যান। এই কবিতা-চতুষ্টয়ে একটি ভাবই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে—কবি-মানসে মানসলক্ষ্মীর বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার নিগূঢ় ইতিহাস। প্রথম কবিতাটি সর্বজন-পরিচিত।—

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী।

পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে। * * *
পড়েছে তোমার 'পরে প্রদীপ্ত বাসনা,
অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা।

এই কবিতায় সাধারণ সত্যের আকারে যে তত্ত্ব প্রকাশিত, তারই বিশেষ রূপ ফুটে উঠেছে দ্বিতীয় কবিতা "নারী"তে।—

তুমি এ মনের সৃষ্টি তাই মনোমাঝে
এমন সহজে তব প্রতিমা বিরাজে।

সেই প্রতিমাকেই কবি কখনও দেখেছেন বিশ্বলোকে, কখনও মনোলোকে। এই ভাবে মানসীই হয়ে উঠেছেন বিশ্বরমা।—

চন্দ্রে তব মুখশোভা, মুখে চন্দ্রোদয়,
নিখিলের সাথে তব নিত্য বিনিময়।
মনের অনন্ত তৃষ্ণা মরে বিশ্ব ঘুরি
মিশায় তোমার সাথে নিখিল মাধুরী।
তার পরে মনগড়া দেবতারে, মন
ইহকাল পরকাল করে সমর্পণ।

শেষ দুটি পঙ্‌ক্তি বিশেষ ব্যঞ্জনাবহ। যাঁর কাছে কবি তাঁর ইহকাল পরকাল সমর্পণ করেছেন সেই 'মনগড়া দেবতা'ই তাঁর জীবনদেবতা। কবির এই মানসলক্ষ্মী-জীবনদেবতার মহিমাজ্যোতিতেই কবি দেখেছেন জগৎলক্ষ্মীকে।—

তোমার মহিমাজ্যোতি তব মূর্তি হতে
আমার অন্তরে পড়ি ছড়ায় জগতে।
যখন তোমার 'পরে পড়ে নি নয়ন
জগৎ-লক্ষ্মীর দেখা পাই নি তখন।
স্বর্গের অঞ্জন তুমি মাখাইলে চোখে,
তুমি মোরে রেখে গেছ অনন্ত এ লোকে।

* * *

তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে,
তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে।

চতুর্থ কবিতাটির নাম "ধ্যান"। মানসীর ধ্যানে কবি এক অপূর্ব স্বপ্নে নিমগ্ন

হলেন। সেই ধ্যানযোগে বিশ্বজগৎ বিলুপ্ত হয়ে গেল। 'চিত্রা'র নাম-কবিতায় কবি বলেছিলেন :

একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়-বৃন্ত-শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে,
চারিদিকে চির যামিনী।

'চৈতালি'র "ধ্যান" তারই অনুরূপ :

নাহি দিন নাহি রাত্রি নাহি দণ্ড পল,
প্রলয়ের জলরাশি স্তব্ধ অচঞ্চল।
যেন তারি মাঝখানে পূর্ণ বিকাশিয়া
একমাত্র পদ্ম তুমি রয়েছ ভাসিয়া।
নিত্যকাল মহাপ্রেমে বসি বিশ্বভূপ
তোমা মাঝে হেরিছেন আত্মপ্রতিরূপ।

এই কবিতার অন্তিম পঙ্‌ক্তিমিথুনে 'বিশ্ব-বিলোপ-বিমল-আঁধারে' যেন কবির বিশেষ সত্তাটিও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সেই আত্মবিলোপ-করা প্রলয়-পয়োধি-জলে শুধু ভেসে আছে পদ্মপ্রতীকে তাঁর প্রেম। আর সেই প্রেমের মধ্যেই প্রেম-স্বরূপ বিশ্ববিধাতা তাঁর আত্মপ্রতিরূপ প্রত্যক্ষ করছেন।

এই অপূর্ব ধ্যানের আবেশেই কবি পরদিন লিখলেন দুটি কবিতা—"অসময়" আর "গান"। "অসময়" কবিতাটি 'গান"-এরই গৌরচন্দ্রিকা। 'চৈতালি'র রচনাবলী-সংস্করণের সূচনায় কবি লিখেছেন, 'চৈতালিতে অনেক কবিতা দেখতে পাই যাতে গানের বেদনা আছে কিন্তু গানের রূপ নেই।' "গান" কবিতাটিতে গানের রূপ নেই, গানের বেদনা আছে। বেদনা নয় আনন্দ। "ধ্যান" কবিতায় কবি তাঁর মানসীকে বিশ্বের প্রেক্ষাপটে একটি পূর্ণবিকশিত পদ্মরূপে উদ্ভাসিত হতে দেখেছিলেন। "গান" কবিতায় আছে তারই সুরভিত কুসুম-স্পর্শের আনন্দ। কবি বলছেন :

কুসুমের মতো শ্বসি পড়িতেছ খসি খসি
মোর বক্ষ 'পরে।
গোপন শিশিরছলে বিন্দু বিন্দু অশ্রুজলে
প্রাণ সিক্ত করে।

নিঃশব্দ সৌরভরাশি পরানে পশিছে আসি,
সুখস্বপ্ন পরকাশি নিভৃত অন্তরে।
পরশ-পুলকে ভোর চোখে আসে ঘুমঘোর,
তোমার চুম্বন, মোর সর্বাঙ্গে সঞ্চরে।
কুসুমের মতো শ্বসি পড়িতেছ খসি খসি
মোর বক্ষ 'পরে।

ধ্যানসমুখ প্রেমের এই কুসুমস্পর্শ নিয়েই ১৩০২ সালের চৈতালি-স্বপ্ন সার্থক হল।

'চৈতালি'র দ্বিতীয়ার্ধের কবিতাগুলি রচিত হয় ১৩০৩ সালের শ্রাবণ মাসে। ৭ শ্রাবণে লেখা নদীযাত্রা, মৃত্যুমাধুরী, স্মৃতি ও বিলয়—এই চারিটি চতুর্দশপদীর কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই কবিতা-চতুষ্টয়ের শেষে মৃত্যুস্নাত প্রেম বিশ্বের প্রেক্ষাপটে নবজন্ম পেল। কবি বলছেন, 'তার সেই স্নেহলীলা সহস্র আকারে / সমস্ত জগৎ হতে ঘিরেছে আমারে।' ৭ তারিখে লেখা প্রথম চতুর্দশপদীতে যে নদীযাত্রার কথা আছে তারই উপসংহার রচিত হয়েছে ১১ তারিখে লেখা 'স্বার্থ', 'প্রেয়সী' ও 'শান্তিমন্ত্র' কবিতায়। প্রথম কবিতায় স্বার্থ-চেতনা বিসর্জন দিয়ে কবি বরণ করে নিলেন 'অমৃতে অশ্রুতে মাখা' চির-প্রেমকে। তিনি বলছেন:

আমি লইলাম বাছি চিরপ্রেমখানি
জাগিছে যাহার মুখে অনন্তের বাণী
অমৃতে অশ্রুতে মাখা। মোর তরে থাক্
পরিহাস্য পুরাতন বিশ্বাস নির্বাক।
থাক্ মহাবিশ্ব, থাক্ হৃদয়-আসীনা
অন্তরের মাঝখানে যে বাজায় বীণা।

এই ষট্‌ক-বন্ধের 'পরিহাস্য পুরাতন বিশ্বাস নির্বাক' চরণটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অন্তিম পঙ্‌ক্তিমিথুনে হৃদয়-আসীনা যে-বীণাপাণির কথা বললেন, তারই প্রশস্তিগাথা রচিত হয়েছে 'প্রেয়সী'তে। 'চৈতালি'র 'বীণাপাণি'কে সংশয়াতীত ভাবে চিনতে পারা যাবে এই কবিতায়। কবিদৃষ্টিতে যিনি প্রেয়সী, তিনিই শ্রেয়সী, তিনিই বীণাবাদিনী। কবি বলছেন:

হে প্রেয়সী, হে শ্রেয়সী, হে বীণাবাদিনী,

আজি মোর চিত্তপদ্মে বসি একাকিনী
ঢালিতেছ স্বর্ণসুধা ; মাথার উপর
সত্তস্নাত বরষার স্বচ্ছ নীলাম্বর
রাখিয়াছে স্নিগ্ধহস্ত আশীর্বাদে ভরা :
সম্মুখেতে শস্যপূর্ণ হিল্লোলিত ধরা
বুলায় নয়নে মোর অমৃত-চুম্বন ;
উতলা-বাতাস আসি করে আলিঙ্গন ;

* * *

তুমি আজি মুগ্ধমুখী আমারে ভুলালে,
ভুলাইলে সংসারের শতলক্ষ কথা—
বীণাস্বরে রচি দিলে মহা নীরবতা।

"প্রেয়সী" কবিতার এই প্রেয়সী বীণাবাদিনীই 'শান্তিমন্ত্রে' হয়েছেন কবির অন্তর্যামিনী দেবী। তাঁরই শরণাগত কবি বলছেন :

কাল আমি তরী খুলি লোকালয়মাঝে
আবার ফিরিয়া যাব আপনার কাজে—
হে অন্তর্যামিনী দেবী ছেড়ো না আমারে,
যেয়ো না একেলা ফেলি জনতা-পাথারে
কর্মকোলাহলে।

* * *

বিরোধ উঠিবে গর্জি শতফণা ফণী,
তুমি মৃদুস্বরে দিয়ো শান্তিমন্ত্রধ্বনি—
স্বার্থ মিথ্যা, সব মিথ্যা—ব'লো কানে কানে—
আমি শুধু নিত্য সত্য তোর মাঝখানে।

এই কবিতাগুলি একদিকে যেমন বীণাবাদিনী অন্তর্যামিনী দেবীর কাছে কবির পরম আত্মনিবেদনের সুরে ঝংকৃত, অন্যদিকে তেমনি পয়ারছন্দে রচিত এই সনেটকল্প রচনাগুলি 'চিত্রা' কাব্যের অন্তর্যামী-জীবনদেবতা-চেতনারই সহজবোধ্য কাব্যভাষ্য।

চৈতালি কাব্যে কবির প্রেমচেতনার রসবিশ্লেষণ সমাপ্ত করার পূর্বে এই কাব্যের দুটি উৎসর্গ-কবিতার প্রতি আবার দৃষ্টিনিবদ্ধ করা প্রয়োজন। 'উৎসর্গ' শিরোনামায় কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাটির আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। আমরা প্রথম খণ্ডে বলেছি, কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দশখানি গ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন। তার দশম গ্রন্থ হল চৈতালি।[৮৭] 'চৈতালি'র উৎসর্গ কবিতাটি যে কাদম্বরী দেবীকেই স্মরণ করে লেখা তার প্রমাণ চৈতালির অন্যান্য কবিতা। মোহিতচন্দ্র সেনের 'কাব্যগ্রন্থে' "জীবনদেবতা" পর্যায়ের প্রথম কবিতা হিসাবে এই কবিতাটিকেই সংকলন করা হয়েছে, এ কথা পূর্বেই বলেছি। কবিজীবনের দ্রাক্ষাকুঞ্জে যে গুচ্ছ গুচ্ছ ফল রসভারে পূর্ণ হয়েছে সেগুলিকে কবি তাঁর 'অন্তর্যামিনী দেবী'র উদ্দেশে নিবেদন করেছেন। এই দ্রাক্ষাফলের উপমা প্রথম দেখা দিয়েছে চিত্রার "জীবনদেবতা" কবিতায়।—

দুঃখসুখের লক্ষধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষাসম।

এখানে জীবনপাত্রে উচ্ছলিত দুঃখসুখের সহস্রধারার উপমান হয়েছে দলিত দ্রাক্ষা। চৈতালির "উৎসর্গ" কবিতায় দ্রাক্ষা আর উপমান-মাত্রই নয়, রূপক-অলংকারে জীবনেরই রূপকল্পে উন্নীত হয়েছে। তাই জীবন হয়ে উঠেছে দ্রাক্ষাকুঞ্জ।

'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থের আরেকটি উৎসর্গ-কবিতা আছে। 'চৈতালি' প্রথম সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থাবলীর অন্তর্গত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩০৩ সালে।[৮৮] চৈতালির সূচনায় কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত ছিল একটি ষট্‌পদী কবিতা। চৈতালির পরবর্তী সংস্করণে এটি আর ব্যবহৃত হয় নি। রচনাবলী-সংস্করণে তা পুনরায় 'চৈতালি'তে বিন্যস্ত হয়েছে। এই উৎসর্গ কবিতাটি এখানে উদ্ধারযোগ্য :

তুমি যদি বক্ষোমাঝে থাক নিরবধি,
তোমার আনন্দমূর্তি নিত্য হেরে যদি
এ মুগ্ধ নয়ন মোর,—পরান-বল্লভ,

তোমার কোমলকান্ত চরণ-পল্লব
চিরস্পর্শ রেখে যায় জীবনতরীতে—
কোনো ভয় নাহি করি বাঁচিতে মরিতে।

এই 'পরান-বল্লভে'র পরিচয় চৈতালির কবিতাগুলিতে পাওয়া গেছে। ১৩০৩ সালের ১১ই শ্রাবণে লেখা কবিতাত্রয়ে ইনিই কবির হৃদয়-আসীনা বীণাবাদিনী অন্তর্যামিনী দেবী। 'চিত্রা'র যুগে দেখেছি 'অন্তর্যামী' [ভাদ্র ১৩০১] এবং 'সাধনা' [৪ কার্তিক ১৩০১] কবিতায় যিনি দেবী-রূপে কবির আরাধ্যা তিনিই 'জীবনদেবতা' কবিতায় [২৯ মাঘ, ১৩০২] হয়ে উঠেছেন অন্তরতম দেবতা। বৈষ্ণব পদাবলীর সহৃদয় কবিরসিক রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবের প্রেমবিলাসবিবর্তের সঙ্গে নিশ্চয়ই পরিচিত ছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যখণ্ডে রামানন্দমিলন নামক অষ্টম অধ্যায়ে প্রেমবিলাসবিবর্তের উদাহরণ হিসাবে রামানন্দ রায় নিজকৃত যে পদটি গান করেন তাতে বিলাসবিবর্তের রসরহস্যটি বিধৃত আছে :

না সো রমণ, না হাম রমণী।
দুঁহু-মন মনোভব পেষল জনি ॥[৮৭]

চৈতালির দ্বিতীয় উৎসর্গ-কবিতার 'পরান-বল্লভ' সম্বোধনটি চৈতালির "প্রার্থনা" কবিতায় [১৪ শ্রাবণ ১৩০৩] ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে কবি বলছেন :

আজি কিসের পিপাসা মিটিল না, ওগো
পরম পরান-বল্লভ।
চিতে চিরসুধা করে সঞ্চার, তব
সকরুণ করপল্লব।

এই 'পরম পরান-বল্লভে'র কাছে কবি 'চৈতালি'র অন্তিম প্রার্থনা জানিয়ে বলেছেন :

নাথ, যার যাহা আছে তার তাই থাক্
আমি থাকি চিরলাঞ্ছিত,—
শুধু তুমি এ জীবনে নয়নে নয়নে
থাকো থাকো চির-বাঞ্ছিত।

এই কবিতা লেখার তিন দিন আগে রচিত "শান্তিমন্ত্র" কবিতায় কবি প্রার্থনা করেছিলেন :

হে অন্তর্যামিনী দেবী ছেড়ো না আমারে,
যেয়ো না একেলা ফেলি জনতা-পাথারে,
কর্মকোলাহলে। সেথা সর্ব ঝঞ্চনায়
নিত্য যেন বাজে চিত্তে তোমার বীণায়
এমনি মঙ্গলধ্বনি।

এই দুটি কবিতা একসঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই বুঝতে পারা যায় যে, "শান্তিমন্ত্রে"র অন্তর্যামিনী দেবীই "প্রার্থনা"য় রূপান্তরিত হয়েছেন পরম পরান-বল্লভে। আর, বলাই বাহুল্য, কবির হস্তলিখিত উৎসর্গের পরান-বল্লভও তিনিই।

কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশ্যে কবির গ্রন্থোৎসর্গ প্রসঙ্গে আরেকটি উৎসর্গ-কবিতার প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করা অত্যাবশ্যক। মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থ' সমগ্রভাবেই কাদম্বরী দেবীকে উৎসর্গীকৃত। উৎসর্গ-কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত হল:

আমারে কর তোমার বীণা,
লহ গো লহ তুলে!
উঠিবে বাজি তন্ত্রীরাজি
মোহন অঙ্গুলে!
কোমল তব কমল-করে
পরশ কর পরান 'পরে,
উঠিবে হিয়া গুঞ্জরিয়া
তব শ্রবণমূলে।
কখনো সুখে কখনো দুখে
কাঁদিবে চাহি তোমার মুখে,
চরণে পড়ি রবে নীরবে
রহিবে যবে ভুলে!
কেহ না জানে কি নব তানে
উঠিবে গীত শূন্যপানে
আনন্দের বারতা যাবে
অনন্তের কূলে!

এই উৎসর্গ-কবিতার সঙ্গে অন্তর্যামী কবিতার 'আমি কি গো বীণা-যন্ত্র তোমার' স্তবকাংশটির ভাবসাদৃশ্য অবশ্য-লক্ষণীয়। কিন্তু এর সঙ্গে 'চৈতালি'র বীণাবাদিনী

প্রেয়সীর মিল অন্তরঙ্গতর। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে এই গীতি-উৎসর্গটি গীতবিতানে 'প্রেম'-পর্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে। চৈতালির বীণাবাদিনীকে সম্বোধন করে কবি বলেছেন, 'হে প্রেয়সী, হে শ্রেয়সী।' তাই 'চৈতালি' আলোচনার সূচনাতেই বলা হয়েছে, 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থে কবির অন্তর্যামিনী বীণাবাদিনী দেবী একই সঙ্গে কবির 'প্রেয়সী' ও 'শ্রেয়সী'। একই বিগ্রহের দুটি লাবণ্যমূর্তি।

৪৬

চৈতালি-পরবর্তী কয়েকটি বৎসর কাদম্বরী দেবীর প্রেমমূর্তিখানি যেন রবীন্দ্র-মানসপটে অস্পষ্ট হয়ে এসেছিল। চৈতালির শেষগুচ্ছের কবিতা রচিত হয় ১৩০৩ সালের শ্রাবণ মাসে। কবির বয়স তখন ৩৫ পেরিয়ে ৩৬। তার আঠারো বৎসর পরে, ১৩২১ সালের কার্তিক মাসে, এলাহাবাদে ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদের বাড়িতে নতুন-বৌঠানের একখানি পুরনো ফোটো দেখে রবীন্দ্রনাথ বলাকা কাব্যগ্রন্থের 'ছবি' কবিতাটি রচনা করেন। 'ছবি' যে নতুন-বৌঠানের ফোটো দেখেই লেখা, তা কবি নিজেই স্বীকার করে গেছেন : 'The poem was addressed to Natun Bouthan's photograph।'[৯০] এই কবিতার প্রথমার্ধে কবি বলছেন, একদিন তুমি আমার জীবনে কত সত্য ছিলে, আজ 'তুমি শুধু ছবি।'—

এ জীবনে
আমার ভুবনে
কত সত্য ছিলে।
মোর চক্ষে এ নিখিলে
দিকে দিকে তুমিই লিখিলে
রূপের তুলিকা ধরি রসের মুরতি।
সে-প্রভাতে তুমিই তো ছিলে
এ-বিশ্বের বাণী মূর্তিমতী।

তারপর একদিন দুজনের মিলিত যাত্রার অবসান হল। শুরু হল দূর হতে দূরে কবির একলা পথ-চলা। কবি তারই ইঙ্গিত দিয়ে বলছেন :

একসাথে পথে যেতে যেতে
রজনীর আড়ালেতে
তুমি গেলে থামি।
তার পরে আমি
কত দুঃখে সুখে
রাত্রিদিন চলেছি সম্মুখে।
চলেছে জোয়ার-ভাঁটা আলোকে আঁধারে
আকাশ-পাথারে,

*　　*　　*

সহস্রধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন-নির্ঝরিণী
মরণের বাজায়ে কিঙ্কিণী।
অজানার সুরে
চলিয়াছি দূর হতে দূরে,
মেতেছি পথের প্রেমে।
তুমি পথ হতে নেমে
যেখানে দাঁড়ালে
সেখানেই আছ থেমে।

*　　*　　*

সবার আড়ালে
তুমি ছবি। তুমি শুধু ছবি।

এই উদ্ধৃতির একটি বাক্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত। 'সহস্রধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন-নির্ঝরিণী / মরণের বাজায়ে কিঙ্কিণী।' কথাটি জন্ম-মৃত্যু-শাসিত মানুষ মাত্রেরই জীবন-সত্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত সহস্রশীর্ষ পুরুষের ক্ষেত্রে তার ব্যঞ্জনা অপরিসীম। আমরা এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে 'স্বপন-মুরতি গোপনচারী' কবিকে তাঁর অন্তরতম সত্তায় বুঝবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু 'মানুষ-আকারে বদ্ধ যে-জন ঘরে', কবির সেই সাংসারিক সত্তাকেও তো একেবারে বিস্মৃত হলে চলবে না! কবি অবশ্য বলছেন, সেই সাংসারিক মানুষটির জীবন-চরিতে 'কবি'কে পাওয়া যাবে না—

মানুষ-আকারে বদ্ধ যে-জন ঘরে,

ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতি-নিন্দার জ্বরে,
কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।

কিন্তু সেই জীবনকে একেবারে অস্বীকার করেও তো কবি-জীবন যাপন করা যায় না! মানুষ হিসাবে সংসারের কাছে, স্বদেশের বিদেশের কাছে, অসংখ্য দায় ও দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব কবিকেও পালন করতে হবে। সেখানে 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর' বলে নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই তা করেন নি। বরং জীবনে এমন-সব কাজ করেছেন যা তাঁর কবিজীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল না। ৬৪ বৎসর বয়সে পদার্পণ করে সে-কথা তাঁরও বিশেষ ভাবে মনে হয়েছে। 'যাত্রী' গ্রন্থের 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'তে ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের ৫ই অক্টোবর কবি তাঁর নিজের জীবন সম্বন্ধে যে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন, তার প্রতি পুনরায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে। কবি বলছেন :

"জীবনের মাঝমহলে, যে-কালটাকে বলে পরিণত বয়স, সেই সময়ে অনেক বড়ো বড়ো সংকল্প, অনেক কঠিন সাধনা, অনেক মস্ত লাভ, অনেক মস্ত লোকসান এসে জমেছিল। সব জড়িয়ে ভেবেছি, এইবার আসা গেল পাকা-পরিচয়ের কিনারাটাতে। সেই সময়ে কেউ যদি হঠাৎ এসে জিজ্ঞাসা করত, "তোমার বয়স কত?" তা হলে আমার গোড়ার দিকের ছত্রিশটা বছর সরিয়ে রেখে বলতুম, আমি হচ্ছি বাকিটুকু। অর্থাৎ আমার বয়স হচ্ছে কুষ্টির শেষ দিকের সাতাশ। এই পাকা সাতাশের রকম-সকম দেখে গম্ভীর লোকে খুশি হল। তারা কেউ বললে, "নেতা হও," কেউ বললে "সভাপতি হও," কেউ বললে, "উপদেশ দাও"।...

"এমন সময় ঘাটে পড়লুম। একদিন বিকেলবেলায় সামনের বাড়ির ছাতে দেখি, দশ-বারো বছরের একটি ছেলে খালি গায়ে যা-খুশি করে বেড়াচ্ছে।

* * *

"আজ মনে হচ্ছে, ওই ছেলেটার কথা আমারই খুব ভিতরের কথা, গোলেমালে অনেককাল তার দিকে চোখ পড়ে নি। বারো বছরের সেই নিত্য-ভোলা ইস্কুল-পালানো লক্ষ্মীছাড়াটা গাম্ভীর্যের নিবিড় ছায়ায় কোথায় লুকিয়ে লুকিয়ে খেলা করছিল। এখন ভাবনা ধরিয়ে দিলে, আমার আসল

পরিচয় কোন্‌ দিকটায়। সেই আরম্ভবেলাকার সাতাশের [ছত্রিশের ?] দিকে, না শেষবেলাকার ?...

"এও বুঝলুম, জগতে কাঁচা মানুষের খুব একটা পাকা জায়গা আছে, চিরকেলে জায়গা। ষাট বছরে পৌঁছে হঠাৎ দেখলুম, সেই জায়গাটা দূরে ফেলে এসেছি।

"যতই বুঝতে পারি ততই দেখতে পাই, পাকা দেয়ালগুলোই মায়া, পাথরের কেল্লাই কয়েদখানা। মন কাঁদছে, মরবার আগে গাখোলা ছেলের জগতে আর একবার শেষ খেলা খেলে নিতে, দায়িত্ববিহীন খেলা। আর, কিশোর বয়সে যারা আমাকে কাঁদিয়েছিল, হাসিয়েছিল, আমার কাছ থেকে আমার গান লুট করে নিয়ে ছড়িয়ে ফেলেছিল, আমার মনের কৃতজ্ঞতা তাদের দিকে ছুটল।...মধ্যাহ্নে মনে হল তারা তুচ্ছ ; বোধ হল, তাদের ভুলেই গেছি। তার পরে সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন নক্ষত্রলোক সমস্ত আকাশ জুড়ে আমার মুখের দিকে চাইল তখন জানলুম, সেই ক্ষণিকা তো ক্ষণিকা নয়, তারাই চিরকালের ; ভোরের স্বপ্নে বা সন্ধ্যাবেলার স্বপ্নাবেশে জানতে না-জানতে তারা যার কপালে একটুখানি আলোর টিপ পরিয়ে দিয়ে যায় তাদের সৌভাগ্যের সীমা নেই।"[৯১]

৬৪ বৎসর বয়সে গদ্যে-লেখা এই আত্মকথাই ৭৪ বৎসর বয়সে 'শেষসপ্তকে'র তেতাল্লিশ-সংখ্যক কবিতায় পুনরাবৃত্ত হয়েছে। কবি বলছেন কৈশোরের 'তৃণবিছানো বীথিকা' একদিন এসে পৌঁছল 'পাথরে-বাঁধানো রাজপথে'। সেই বন্ধুর পথ দিয়ে কবি পৌঁছলেন 'তরঙ্গমন্দ্রিত জনসমুদ্রতীরে'।—

সেদিন জীবনের রণক্ষেত্রে
দিকে দিকে জেগে উঠল সংগ্রামের সংঘাত
গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে।
একতারা ফেলে দিয়ে
কখনো বা নিতে হল ভেরী।
খর মধ্যাহ্নের তাপে
ছুটতে হল
জয়পরাজয়ের আবর্তনের মধ্যে।

কবির জীবনমধ্যাহ্নে 'তরঙ্গমন্দ্রিত জনসমুদ্রতীরে' 'জীবনের রণক্ষেত্রে' সংগ্রামের এই সংঘাত তাঁর তৎকালীন কাব্যকবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে কিনা, বিচার করে দেখা যেতে পারে। ছত্রিশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করে, ১৩০৩ সালের শ্রাবণ মাসে, কবি 'চৈতালি'র সর্বশেষ কবিতাগুচ্ছ রচনা করলেন। তাঁর কাব্যলোকে তাঁর নিভৃত-মনের আত্মকথা-বলার একটা যুগ যেন শেষ হল। ১৪ শ্রাবণ কবি লিখলেন চৈতালির শেষ কবিতাপঞ্চক। ইচ্ছামতী নদীর কাছে বিদায় গ্রহণ করে কবি তার উপান্ত কবিতায় বলছেন :

চলিয়াছি রণক্ষেত্রে সংগ্রামের পথে।
সংসার-বিপ্লবধ্বনি আসে দূর হতে।

বস্তুত, চৈতালির পরবর্তী যুগের কাব্যচতুষ্টয় হল 'কথা', 'কাহিনী,' 'কল্পনা' ও 'ক্ষণিকা'। এই যুগের কবিতা সম্পর্কে কবি বলেছেন, তাঁর 'কাব্যভূগোলে' আর একটা দ্বীপ। অন্তর্মুখী কবিচেতনা তখন বহির্মুখী হয়েছে 'ইতিহাসের রাজ্যে'। "মনের সেই অবস্থায় কখনো কখনো কাহিনী বড়ো ধারায় উৎসারিত হয়ে নাট্যরূপ নিল।" "এমনি করে এই সময়ে আমার কাব্যে একটা মহল তৈরি হয়ে উঠেছে যার দৃশ্য জেগেছে ছবিতে, যার রস নেমেছে কাহিনীতে, যাতে রূপের আভাস দিয়েছে নাটকীয়তায়।" অর্থাৎ আত্মগত গীতিকবিতার যুগ অবসিত হয়ে এই পর্বে দেখা দিয়েছে বহিরাগত কাহিনী-কবিতা।

ভাবের দিক দিয়ে কিন্তু চৈতালিতেই এই যুগ-পরিবর্তনের লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যাবে। চৈতালির ১৩০৩ সালের ১০ শ্রাবণে লেখা দুটি চতুর্দশপদী কবিতার নাম 'প্রথম চুম্বন' ও 'শেষ চুম্বন'। প্রথম কবিতায় আছে নিশারম্ভে সম্ভোগ-মিলনের ব্যঞ্জনা। দ্বিতীয় কবিতায় ফুটে উঠেছে নিশান্তের জাগরণসংগীত। 'দূর স্বর্গে বাজে যেন নীরব ভৈরবী।' যামিনীর স্বপ্ন-যবনিকা খসে যাবার পরে

প্রবেশিল বাতায়নে পরিতাপসম
রক্তরশ্মি প্রভাতের আঘাত নির্মম।

এই 'নির্মম আঘাতে' কবি তাঁর স্বপ্নোত্থিত চেতনায় লক্ষ্য করলেন—

মুহূর্তে উঠিল বাজি চারিদিক হতে
কর্মের ঘর্ঘরমন্দ্র সংসারের পথে।

মহারবে সিংহদ্বার খুলে বিশ্বপুরে ;
অশ্রুজল মুছে ফেলি চলি গেনু দূরে।

'শেষ চুম্বন' শীর্ষক চতুর্দশীর এই অন্তিম চতুষ্কের অপরিসীম ব্যঞ্জনাবহ পঙ্‌ক্তি হল 'মহারবে সিংহদ্বার খুলে বিশ্বপুরে'। পরের দিন কবি লিখলেন নবযুগারম্ভের প্রথম কবিতা: 'যাত্রী'। স্বগত-ভাষণে নিজের দিকে তাকিয়ে বললেন 'ওরে যাত্রী যেতে হবে বহুদূরদেশে'।

এই দূরদেশে যাত্রার ইঙ্গিত নিয়ে চৈতালির কবিতাগুলি ১৩০৩ সালে সংকলিত 'কাব্যগ্রন্থাবলী'র অন্তর্ভুক্ত হয়েই প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর দু-বৎসর কবির কোনো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। ১৩০৬ সালের মাঘ মাসে প্রকাশিত হল 'কথা'। এই গ্রন্থের কবিতাগুলি মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থে' দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে হল 'কথা' ও 'কাহিনী'। ১৩০৭ সালের বৈশাখে বেরোল 'কল্পনা'। শ্রাবণে 'ক্ষণিকা'। 'কথা ও কাহিনী'র বেশির ভাগ কবিতাই ১৩০৬ সালের আশ্বিন-কার্তিক-অগ্রহায়ণে লেখা। দু-একটি আছে ১৩০৪ সালের। 'কল্পনা'র অনেক কবিতাই ১৩০৪ সালের। শেষের কবিতাগুলি ১৩০৬ সালে লেখা। 'ক্ষণিকা'র বেশির ভাগ কবিতাই ১৩০৭ সালের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে লিখিত হয়েছিল।

এই পর্বে কবিমানসের দিক্‌পরিবর্তনের নিগূঢ় ইতিহাস কৌতূহলী পাঠক খুঁজে পাবেন 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে। পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার আলোকচিত্র রচনাবলী-সংস্করণের সপ্তম খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে। 'সঞ্চয়িতা'তেও তার পুনর্মুদ্রণ দেখতে পাওয়া যাবে। কবিতাটির নাম 'স্বর্গপথে'। আলোচনার প্রয়োজনে কবিতাটি এখানে সমগ্রভাবে উদ্ধার করছি :

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ চরণে
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত গগনে
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া ;
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে
দিক্ দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,—
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

এ নহে মুখর বনমর্মর গুঞ্জিত
নিম্নে সাগর মহা অজাগর শ্বসিছে,
এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুসুম রঞ্জিত
ফেন-হিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে।
কোথায় সে তীর শ্যামপল্লব পুঞ্জিত,
কোথায় সে নীড়, কোথা আশ্রয়শাখা,
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

এতদিনে সেথা বনবনান্ত নন্দিয়া
নব বসন্ত আসিয়াছে নব ভূপতি ;
পঞ্চমরাগে পঞ্চশায়কে বন্দিয়া
স্খলদঞ্চলা নাচে চঞ্চলা যুবতী ;
এতদিনে সেথা আকুল কোকিল ক্রন্দিয়া
হানে সংগীত বিফল মিনতি মাখা ;
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

বিরহিণীকুল এতদিনে ফুল চন্দনে
অর্ঘ্য সাজায়ে বসেছে বাসর-দুয়ারে,
নবদম্পতি কম্পিত বাহু বন্ধনে
মিলনের মোহে বাঁধিয়াছে দোঁহে দোঁহারে।
"এস এস" স্বর বাজিছে সুদূর অঙ্গনে,
দূর বনে অতি করুণ মূরতি আঁকা…।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

'স্বর্গপথে' কবিতা পাণ্ডুলিপিতে এই চারিটি স্তবকেই সমাপ্ত। প্রথম পাঠই এখানে উদ্ধার করা হয়েছে। পাণ্ডুলিপিতে কিছু কিছু সংস্কার করে সংশোধিত আকারে কবিতাটি যে রূপ পেয়েছে, এখানে তারও উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রথম স্তবকের প্রথম ও তৃতীয় চরণের 'আসিছে মন্দ চরণে' এবং 'নাহি অনন্ত গগনে' যথাক্রমে হয়েছে 'আসিছে মন্দ মন্থরে' এবং 'নাহি অনন্ত অম্বরে'। দ্বিতীয় স্তবকের দ্বিতীয় চরণ 'নিয়ে সাগর মহা অজাগর শ্বসিছে' হয়েছে 'এ যে অজাগর গরজি সাগর ফুলিছে'। পঞ্চম চরণের 'শ্যাম পল্লব' হয়েছে 'ফুল-পল্লব'। তৃতীয় স্তবকের চতুর্থ চরণের 'নাচে' হয়েছে 'ফিরে'। ষষ্ঠ চরণের 'হানে সংগীত' হয়েছে 'হানিছে কাকলি'। চতুর্থ স্তবকের প্রথম ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি প্রথম-পাঠে ছিল—

বিরহিণীকুল এতদিনে ফুল চন্দনে
অর্ঘ্য সাজায়ে বসেছে বাসর-দুয়ারে ;

পরিবর্তিত পাঠে হয়েছে—

কিন্নরীকুল নন্দন-ফুলচন্দনে
সাজায়ে অর্ঘ্য বসেছে স্বর্গদুয়ারে।

এই পরিবর্তনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখানেই প্রথম-পাঠের মর্ত্যলীলা পরিশোধিত হয়ে 'স্বর্গপথে'র আভাস বহন করে এনেছে। কিন্তু এই পরিবর্তনে পূর্বাপর ভাবের সঙ্গতি রক্ষিত হয় নি। সম্ভবত এই পরিবর্তনের ফলেই কবিতাটির নামকরণ হয়েছিল 'স্বর্গপথে' ; কিন্তু এই নামকরণও দূরান্বয়দোষদুষ্ট বলেই অসার্থক।

কিন্তু কবিমানসের দিঙ্‌নির্ণয়ে কবিতাটির গুরুত্ব অপরিসীম। কবিতাটি দু-ভাঁজ করা। এর প্রথম দুটি স্তবকে আছে যাত্রার কথা। সে-যাত্রার কথা কবি বলেছিলেন চৈতালির 'যাত্রী' কবিতায় : 'ওরে যাত্রী যেতে হবে বহুদূরদেশে।' 'স্বর্গপথে'র শেষ দুটি স্তবকে আছে পশ্চাতের আকর্ষণ। চৈতালির 'শেষ চুম্বন' কবিতার অন্তিম পঙ্‌ক্তিমিথুনে কবি বলেছিলেন :

মহারবে সিংহদ্বার খুলে বিশ্বপুরে ;
অশ্রুজল মুছে ফেলি চলি গেনু দূরে।

'স্বর্গপথে' কবিতার প্রথম স্তবকযুগলে আছে বিশ্বপুরে নিষ্ক্রমণের কথা। দ্বিতীয় স্তবকযুগলে 'অশ্রুজল মুছে ফেলা'র ইতিহাস।

ভাবের দিক থেকে কবিতাটি যে দ্বিধাবিভক্ত, কবি নিজেও তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই 'কল্পনা' কাব্যসংকলনে পাণ্ডুলিপির এই 'স্বর্গপথে' কবিতাই দ্বিখণ্ডিত হয়ে পৃথক দুটি কবিতার জন্ম দিয়েছে। সে দুটি কবিতা হল :

'দুঃসময়' এবং 'অসময়'। 'দুঃসময়' কবিতায় আছে অন্তহীন যাত্রার কথা। 'অসময়ে' আছে পিছনে-ফেলে-আসা অতীত জীবনের প্রতি মোহময় আকর্ষণের আনন্দ-বেদনা-ঘন মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, দুঃসময়' কবিতার রচনা-তারিখ দেওয়া হয়েছে ১৫ বৈশাখ ১৩০৪ ; আর 'অসময়ে'র কোন নির্দিষ্ট তারিখ দেওয়া নেই, শুধু লেখা আছে ১৩০৬। আমাদের মনে হয়, স্বর্গপথে কবিতাটি কবি লিখেছিলেন ১৩০৪ সালের ১৫ বৈশাখে। তারপর দীর্ঘ-দিন তিনি আর পাণ্ডুলিপির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন নি। দু-বৎসর পরে 'কথা' ['কাহিনী'-সুদ্ধ] প্রকাশিত হবার পর কবি 'কল্পনা'র পাণ্ডুলিপি-সংস্কারে হস্তক্ষেপ করেন। তখনই, অর্থাৎ ১৩০৬ সালেই, 'দুঃসময়' এবং 'অসময়' কবিতা-দুটি পৃথক পৃথক রূপ পেয়েছে। এই রূপায়ণে কবিমানসের বিবর্তনের দুর্নিরীক্ষ্য ইতিহাসটিও অনেকখানি স্বচ্ছ হয়ে এসেছে।

'দুঃসময়' কবিতাটি পাঁচ স্তবকে সম্পূর্ণ। 'স্বর্গপথে'র প্রথম দুটি স্তবকের সঙ্গে নূতন তিনটি স্তবক যুক্ত হয়ে 'দুঃসময়' নবজন্ম পেয়েছে। 'পাখি'র রূপকটি এই স্তবক-পঞ্চকে আদ্যোপান্ত একটি অখণ্ড সঙ্গতি লাভ করেছে। রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে মানুষ চিরযাত্রী। এই যাত্রার কথা কবিজীবনের প্রথম থেকেই উচ্চারিত হয়েছে। সে-যাত্রা জলে স্থলে আকাশে। মর্ত্যচেতনা পেরিয়ে বিশ্বলোকে সে-যাত্রা যতই সুদূরে সম্প্রসারিত হয়েছে ততই কবি জল-স্থলের পরিধি পেরিয়ে আকাশে উধাও পাখা মেলে ধরেছেন। কবিজীবনের দ্বিতীয়ার্ধে 'বলাকা'য় কবি 'চরৈবেতি' মন্ত্রে যে বলাকা-স্তোত্র রচনা করেছেন, তারই প্রথম বন্দনাগীতি রচিত হয়েছে 'কল্পনা'র 'দুঃসময়' কবিতায়। কবিতাটির মূল কথা উপনিষদের ভাষায় বলা যায়, 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' ; 'মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।' রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টিতে রাত্রির তমসা পেরিয়ে অরুণোদয়ের পথে জ্যোতির্লোকে উত্তরণেরই অন্য নাম মৃত্যু পেরিয়ে অমৃতলোকে প্রয়াণ। নূতন রচিত শেষের তিনটি স্তবকের প্রথমেই আছে তামস-তপস্যার ইঙ্গিত :

> এখনো সমুখে রয়েছে সুচির শর্বরী,
> ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত-অচলে ;
> বিশ্ব-জগৎ নিশ্বাসবায়ু সম্বরি
> স্তব্ধ আসনে প্রহর গনিছে বিরলে ;

বিশ্বভুবনে সম্প্রসারিত এই তামস-তপস্যার প্রেক্ষাপটেই কবিমানস সঞ্চয়ন করেছে অন্তহীন যাত্রার অনিঃশেষ 'উৎসাহ'। সংস্কৃত আলংকারিকগণের ভাষায় কবিতাটি 'বীররসে'র সার্থক উদাহরণ। ওর আলম্বন দূরযানী কবিহৃদয়। তারই প্রতীক হল 'মহা নভ-অঙ্গনে' মুক্তপক্ষ বিহঙ্গ। যে ধ্রুবপদে কবিতাটির সুর প্রথমেই বাঁধা হয়েছে, কবিতার অন্তিম স্তবকের অন্তিম চরণচতুষ্টয়ে তারই পূর্ণ প্রকাশ—

> আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন
> উষা দিশাহারা নিবিড়-তিমির-আঁকা,
> ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
> এখনি, অন্ধ, বন্ধ ক'রো না পাখা।

৪৮

'অসময়' কবিতাটিতে সম্পূর্ণ বিপরীত সুর ফুটে উঠেছে। কবিতাটি সাতটি স্তবকে গঠিত। 'স্বর্গপথে'র তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবক পরিশোধিত আকারে এই কবিতারও তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকে রূপান্তরিত হয়েছে। 'অসময়' নামকরণের তাৎপর্য নূতন-রচিত প্রথম স্তবকের প্রথমেই ধরা পড়েছে—

> হয়েছে কি তবে সিংহ-দুয়ার বন্ধ রে,
> এখনো সময় আছে কি, সময় আছে কি ?

এই 'সিংহ-দুয়ার' 'শেষ চুম্বন' কবিতার সিংহদ্বারকেই মনে করিয়ে দেবে। সেখানে নিশান্তের স্বপ্নোত্থিত চেতনায় কবি সংসারের পথে' 'কর্মের ঘর্ঘরমন্দ্র' শুনেছিলেন। পুরমন্দিরের সিংদ্বার মুক্ত হয়েছিল বিশ্বলোকে। 'অসময়' কবিতায় দেখা যাচ্ছে, কবি সারাদিন মন্দিরের বাইরে 'জনতারণ্যে' মিশে গিয়ে 'নগর সংগীত' গেয়ে বেড়িয়েছেন। সন্ধ্যাগমে তাঁর চিত্তে আবার পুরমন্দিরের প্রদীপশিখার আকর্ষণ দুর্নিবার হয়ে উঠেছে। কবি বলছেন :

> ওই কি প্রদীপ দেখা যায় পুরমন্দিরে ?
> ও যে দুটি তারা দূর পশ্চিম-গগনে।
> ও কি শিঞ্জিত ধ্বনিছে কনক-মঞ্জীরে ?
> ঝিল্লির রব বাজে বনপথে সঘনে।

এই মরীচিকা-লেখাই দিগন্তপথ রঞ্জিত করে সারাদিন তাঁকে ছলনা করেছে এখন তাঁর মনে হয়েছে 'আশা-হুতাশনে' তিনি বৃথাই 'জীবন-আহুতি' দিয়েছেন। বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছেন, এখন সন্ধ্যা বন্ধ্যা হয়ে আকাশে দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই পরম হতাশার মধ্যে একটি সান্ত্বনার বাণী কণ্ঠে নিয়েই কবিতাটি সমাপ্ত হয়েছে—

তবু একদিন এই আশাহীন পন্থ রে
অতি দূরে দূরে ঘুরে ঘুরে শেষে ফুরাবে,
দীর্ঘ ভ্রমণ একদিন হবে অন্ত রে,
শান্তি-সমীর শ্রান্ত শরীর জুড়াবে।
দুয়ার-প্রান্তে দাঁড়ায়ে বাহির প্রান্তরে
ভেরী বাজাইব মোর প্রাণপণ প্রয়াসে।
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিছে আকাশে।

'দুয়ার-প্রান্তে' 'বাহির প্রান্তরে' দাঁড়িয়ে প্রাণপণ প্রয়াসে ভেরী-বাজানোর এই সান্ত্বনাতেই কবি 'শেষ চুম্বনে'র 'অশ্রুজল' মার্জনা করেছেন। কিন্তু 'একতারা' ফেলে দিয়ে এই 'ভেরী' বাজানোর প্রাণপণ প্রয়াস [দ্রষ্টব্য, শেষসপ্তকের ৪৩-সংখ্যক কবিতা] কবির ৬৪ বৎসর বয়সে-লেখা ডায়েরির চিন্তায় তাঁর জীবনের বিড়ম্বনা বলেই মনে হয়েছে। কিন্তু তবু এই ছিল কবির নিয়তি। মর্ত্যজীবনের এই দায়িত্বের হাত থেকে তাঁর নিষ্কৃতি ছিল না। কারোরই নেই, কবিরই বা থাকবে কেন?

কিন্তু সংসারের প্রতি সহস্রবিধ দায়িত্ব পালন করতে হবে বলে অন্তরের অন্তরতম সত্যকেই বা ভুলে যেতে হবে কেন? রবীন্দ্রনাথও ভোলেন নি। 'কল্পনা'র "অসময়" কবিতা লেখার বছর চারেক আগে 'চৈতালি'র "অসময়" কবিতাটি রচিত। সেদিনকার আত্মমানসের পরিচয় দিতে গিয়ে কবি ওই কবিতায় বলছেন, "এ হৃদয় মম তপোভঙ্গ-ভয়ভীত তপোবনসম।" 'তপোভঙ্গ-ভয়ভীত' কবির সেই মানস-তপোবনে কবিমানসীর আবির্ভাব এবং তার বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে কবি সেদিন বলেছিলেন :

এমন সময়ে হেথা বৃথা তুমি প্রিয়া
বসন্তকুসুমমালা এসেছ পরিয়া ;

এনেছ অঞ্চল ভরি যৌবনের স্মৃতি,—
নিভৃত নিকুঞ্জে আজি নাই কোনো গীতি।
শুধু এ মর্মরহীন বনপথ 'পরি
তোমারি মঞ্জীর দুটি উঠিছে গুঞ্জরি।
প্রিয়তমে, এ কাননে এলে অসময়ে,
কালিকার গান আজি আছে মৌন হয়ে।
তোমারে হেরিয়া তারা হতেছে ব্যাকুল,
অকালে ফুটিতে চাহে সকল মুকুল।

এই উদ্ধৃতির শেষ পঙ্‌ক্তিই প্রমাণ করে যে কবিপ্রিয়তমার আবির্ভাব 'বৃথা' হয় নি। কল্পনার 'অসময়' কবিতায়ও সিংহদ্বার রুদ্ধ দেখে কবির কেবলই মনে হয়েছে, "এখনো সময় আছে কি সময় আছে কি?" এই জিজ্ঞাসাই অন্তর্জীবনে ফিরে যাবার ব্যাকুলতাকে ভাষা দিয়েছে। তা ছাড়া কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম চারি চরণের সংশয়িত জিজ্ঞাসাই নিশ্চিত প্রতীতির জন্ম দিয়েছে। তা না হলে পুরমন্দিরের প্রদীপ পশ্চিম-গগনে 'দুটি তারা' হয়ে ফুটে উঠত না। বলা প্রয়োজন যে, 'দুঃসময়' কবিতার 'তারাগুলি'র সঙ্গে 'অসময়ে'র এই 'দুটি তারা'র কোনো সম্পর্ক নেই। এ দুটি তারা কবিজীবনের ধ্রুবতারা। কাদম্বরী দেবীর 'স্নেহময়, ছায়াময়, সন্ধ্যাময়' আঁখি-দুটিই সন্ধ্যাসংগীতের কবির মানস-আকাশে তারা হয়ে ফুটে উঠেছিল। 'অসময়ে'ও সেই দুটি তারাকেই কবি পশ্চিম-গগনে ফুটে উঠতে দেখেছেন। সে তারা তাঁর কল্পনার আকাশে কোনোদিনই অস্তমিত হয় নি।

৪৯

তবে যে কবি বলাকার 'ছবি' কবিতায় কাদম্বরী দেবীর ছবির দিকে তাকিয়ে বলেছেন, 'তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি', এ কথার অর্থ তাহলে কী দাঁড়াল? কবি নিজেই তার উত্তর দিয়েছেন কবিতার দ্বিতীয়ার্ধে। তিনি বলছেন:

তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে।
তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে
তাই ভুল।

অন্যমনে চলি পথে, ভুলি নে কি ফুল।
ভুলি নে কি তারা।
তবুও তাহারা
প্রাণের নিশ্বাসবায়ু করে সুমধুর,
ভুলের শূন্যতা মাঝে ভরি দেয় সুর।
ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা ;
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।

এই বিস্মৃতি-তত্ত্বের আলোকেই কবির কর্মময় জীবনের প্রদীপ্ত প্রহরে কাদম্বরী দেবীর স্থাননির্দেশ করতে হবে। 'ছবি' কবিতার অন্তিম পর্যায়ে কবি পরপর তিনটি অবিস্মরণীয় উক্তি করেছেন।—

প্রথম :

নয়ন-সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই ;
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।

দ্বিতীয় :

নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
তব সুর বাজে মোর গানে ;
কবির অন্তরে তুমি কবি,
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।

তৃতীয় :

তোমারে পেয়েছি কোন্ প্রাতে,
তারপরে হারায়েছি রাতে।
তারপরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি।

বস্তুত, কবি যাকে বলেছেন 'জীবনের মাঝমহল', যখন 'অনেক বড়ো বড়ো সংকল্প', 'অনেক কঠিন সাধনা' তাঁকে ডাক দিয়েছে জীবনসংগ্রামের কেন্দ্রভূমিতে তখনকার বহির্মুখী কর্মব্যস্ততার দিনে কাদম্বরী দেবীর কথা তাঁর মনে পড়ে নি।

তাই চৈতালির পরে গীতাঞ্জলি-পর্ব পর্যন্ত কবির কাব্যলোকে কবিমানসীর প্রত্যক্ষ আবির্ভাব পরিলক্ষিত হবে না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, কাদম্বরী দেবী কবিজীবন থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন। তাঁর আসন কবির অন্তরে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলেই তিনি 'শ্যামলে শ্যামল' হয়ে, 'নীলিমায় নীল' হয়ে, কবির নিখিল ভুবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। অন্যের তো কথাই নয়, কবি নিজেও জানেন না যে, তাঁরই সুর কবির গানে চিরদিন বেজেছে, কেন না 'কবির অন্তরে কবি' হয়ে তিনি কবিচেতনায় নিত্যবিরাজমানা ছিলেন। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের সঙ্গে শুধু তফাত এইখানে যে, এই যুগে সেই গোপনচারিণীকে কবি লাভ করেছেন 'অন্ধকারে, অগোচরে।' তাই কবির মধ্যজীবনে কাদম্বরী দেবীর প্রেমমূর্তিখানি বাইরের আলোয় অস্পষ্ট ও অনুজ্জ্বল হলেও তিনিই ছিলেন কবির অন্তরের মূর্তিমতী প্রেরণা। কবির অন্তরে কবি।

বলাকার 'ছবি' কবিতায় ব্যাখ্যাত বিস্মৃতি-তত্ত্ব শুধু যে ওই একটিমাত্র কবিতায়ই প্রকাশিত হয়েছে এমন নয়। 'ছবি' কবিতাটি রচিত হয় ১৩২১ সালের ৩ কার্তিক। তার সাড়ে চার মাস পরে কবি 'ফাল্গুনী' নাটক রচনা করেন। "পাণ্ডুলিপি অনুসারে ফাল্গুনী রচনার তারিখ ও স্থান, ২০ ফাল্গুন ১৩২১, সুরুল।"[৯৬] সম্ভবত নাটক লেখা শেষ হবার পরই কবি দুটি গান রচনা করেন ২০ ফাল্গুন রাত্রিতে এবং ২১ ফাল্গুন প্রাতে। প্রথম গানটি হল 'তোমায় নতুন করেই পাব বলে / হারাই ক্ষণে ক্ষণ / ও মোর ভালবাসার ধন।' দ্বিতীয় গানটি 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম / চোখের বাহিরে।' এই গানে 'ছবি' কবিতার ভাবানুষঙ্গ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। 'ছবি' কবিতাটির তাৎপর্য অনুধাবনের জন্যে গানটি অপরিহার্য বলেই মনে হয়। গানে কবি বলছেন

চোখের আলোয় দেখেছিলেম
চোখের বাহিরে।
অন্তরে আজ দেখব, যখন
আলোক নাহি রে।
ধরায় যখন দাও না ধরা
হৃদয় তখন তোমায় ভরা,
এখন তোমার আপন আলোয়
তোমায় চাহি রে।

তোমায় নিয়ে খেলেছিলেম
খেলার ঘরেতে।
খেলার পুতুল ভেঙে গেছে
প্রলয়-ঝড়েতে।
থাক তবে সেই কেবল খেলা,
হ'ক না এখন প্রাণের মেলা,—
তারের বীণা ভাঙল, হৃদয়-
বীণায় গাহি রে॥

কবি বলছেন, 'প্রলয়-ঝড়ে' যদি 'খেলার পুতুল' ভেঙেই থাকে তবে এখন 'কেবল খেলা' ছেড়ে 'প্রাণের মেলা' শুরু হোক। 'তারের বীণা' যদি ভেঙেই থাকে, কবির 'হৃদয়-বীণা'তেই গান বাজবে।

এই গানের প্রথম কলিতে কবি বলছেন, 'ধরায় যখন দাও না ধরা / হৃদয় তখন তোমায় ভরা'। এই সত্যই 'বড়ো বড়ো সংকল্প' গ্রহণের দিনেও, হয়তো বা কবির অজ্ঞাতসারেই, তাঁর চেতনার মর্মমূলে বাসা বেঁধে ছিল। 'চিত্রা'র "এবার ফিরাও মোরে" কবিতায় কবিজীবনে মহৎকর্মের আহ্বান উদাত্তস্বরে ধ্বনিত হয়েছে। সেখানেও কবি বলেছেন

মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস
মূঢ় বিজ্ঞজনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস
অতিপরিচিত অবজ্ঞায়, গেছে সে করিয়া ক্ষমা
নীরবে করুণনেত্রে—অন্তরে বহিয়া নিরুপমা
সৌন্দর্যপ্রতিমা।

অন্তরের এই 'নিরুপমা সৌন্দর্যপ্রতিমা'ই কবির কর্মজীবনের সমস্ত প্রেরণার উৎস। বাইরে তাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, কিন্তু 'অন্ধকারে অগোচরে' থেকেই সে কবিচিত্তকে অনুক্ষণ অনুপ্রাণিত করেছে।

চৈতালি-পরবর্তী 'কথা', 'কাহিনী', 'কল্পনা', ও 'ক্ষণিকা'—এই কাব্য-চতুষ্টয় সম্পর্কে কবির যে-বক্তব্য রচনাবলী-সংস্করণে 'কল্পনা'র 'সূচনা'য় প্রকাশিত হয়েছে তা একান্তভাবে 'কথা' ও 'কাহিনী' সম্পর্কেই প্রযোজ্য; 'কল্পনা' ও 'ক্ষণিকা' সম্পর্কে নয়। শেষের দুখানি কাব্যগ্রন্থে আত্মগত গীতি-কবিতাই মুখ্য। 'কল্পনা'র অনেক কবিতা ১৩০৪ সালে লেখা। কয়েকটি ১৩০৫-এ। বাকিগুলির রচনাকাল ১৩০৬। ১৩০৪ সালের রচনাগুলি একান্তভাবেই প্রেমের কবিতা। তার মধ্যে কয়েকটি অপূর্ব-সুন্দর গানও আছে। মল্লার-রাগে 'নববিরহ' রচনা করে কবি বলেছেন:

হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে
সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।

'সিন্ধু ভৈরবী'তে রচনা করলেন 'লীলা'। 'কেন বাজাও কাঁকন কনকন, কত ছল ভরে।' তাতে বললেন:

হেরো নদী-পরপারে গগন-কিনারে
মেঘ-মেলা,
তা'রা হাসিয়া হাসিয়া চাহিছে তোমারি
মুখ'পরে
কত ছলভরে।

এই দুটি গানের রচনা-তারিখ দেওয়া নেই; শুধু বলা হয়েছে ১৩০৪ সালে লেখা। কিন্তু আশ্বিনের ৭ থেকে ১২ তারিখের মধ্যে কবি লিখলেন, 'লজ্জিতা' [৭ আশ্বিন], 'যাচনা' ও 'কাল্পনিক' [৮ আশ্বিন], 'মানসপ্রতিমা' ও 'সংকোচ [৯ আশ্বিন], 'প্রার্থী' ও 'সকরুণা' [১০ আশ্বিন] এবং 'ভিখারি' [১২ আশ্বিন]। এই গীতি-অষ্টকে কবির প্রেমচেতনা বিচিত্র রূপে ও রসে বিলসিত; কিন্তু এর মধ্যে 'কবিমানসী'র আবির্ভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। 'কাল্পনিক' গানে কবি বলছেন, 'মানস-প্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায় আকাশে।' পরদিনই 'ইমন-কল্যাণে' লিখলেন, 'মানসপ্রতিমা' গানটি:

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর
আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্য-গগন-বিহারী।

আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা ;
তুমি আমারি যে তুমি আমারি
মম অসীম-গগন-বিহারী।

এই গানের সাক্ষ্য থেকে দেখা যায়, কবি শুধু যে 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে'ই তাঁর 'মানসপ্রতিমা' রচনা করেছেন এমন নয় ; তিনি নিজের 'হৃদয়-রক্ত-রঞ্জনে' সেই মানসপ্রতিমার চরণ রাঙিয়ে দিয়েছেন। নিজের সুখদুঃখ ভেঙে তাঁর অধর এঁকেছেন 'সুধাবিষে মিশে', নিজের মোহের স্বপ্নাঞ্জন পরিয়ে দিয়েছেন তাঁর নয়নে। শুধু তাও নয়, কবি বলছেন, "মম সংগীত তব অঙ্গে অঙ্গে / দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে।" বিরহী প্রেমের এই গীতিপ্রসাধনে সজ্জিতা, কবির 'হৃদয়রক্ত-রঞ্জনে' রঞ্জিতা এই প্রেমপ্রতিমার পরিচয়ে ভুল হবার কথা নয়।

৫১

'কল্পনা'র পরবর্তী কাব্যসংকলন 'ক্ষণিকা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩০৭ সালের শ্রাবণ মাসে। কবির বয়স তখন ৪০ বৎসর। চল্লিশ পেরিয়ে একচল্লিশ বৎসর বয়সে, ১৩০৮ সালের পৌষ মাসে, কবিজীবনে শুরু হল নূতন অধ্যায়। কবি হলেন আশ্রমগুরু। রবীন্দ্রজীবনের এই অভিনব অধ্যায়ের সূত্রপাত হয় ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ। ওই দিনে বোলপুরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে কবি তাঁর জীবনের মহত্তম কর্মযজ্ঞ শুরু করলেন। তিনি হলেন আশ্রম-বিদ্যালয়ের শিক্ষাগুরু। কবিজীবনে পদ্মা-শিলাইদহ পর্বের অবসান হল, শুরু হল শান্তিনিকেতনের সাধনা। এই পর্বের প্রথম কাব্যফসল সংকলিত হয়েছে 'নৈবেদ্যে'। রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহে যাকে 'গীতাঞ্জলি' পর্ব বলা হয় তার সূচনা 'নৈবেদ্যে'। নৈবেদ্যের শুরুতেই কবি এই কাব্য-গ্রন্থের সুর বেঁধে দিয়েছেন,—

প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে
করি' জোড়কর হে ভুবনেশ্বর
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

'নৈবেদ্যে'র প্রকাশ ১৩০৮ সালে। ভাবলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না যে, রবীন্দ্রকাব্যলোকে 'ক্ষণিকা'র পরেই এসেছে 'নৈবেদ্য'। 'ক্ষণিকা' অনেকান্ত অনুরাগের কাব্য। 'ক্ষণিকা'র একপ্রান্তে আছে 'কথা ও কাহিনী', অন্য প্রান্তে 'নৈবেদ্য-খেয়া-গীতাঞ্জলি'। কবির সাধক-সত্তার কাছে তাঁর শিল্পী-সত্তার নিঃশেষ আত্মসমর্পণের পূর্বে প্রেমিকের অন্তিম বিদ্রোহ বিঘোষিত হয়েছে 'ক্ষণিকা'য়। সে ইতিহাস পৃথকভাবে আলোচনার যোগ্য।

বোলপুরে আশ্রম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কবির ব্যক্তিজীবনে নেমে এল চরম বিপর্যয়। আমরা কবিজীবনের এই কর্মযজ্ঞকে 'বিশ্বজিৎ' যজ্ঞের সঙ্গে তুলনা করেছি। এই বিশ্বজিৎ যজ্ঞে কবির প্রথম দক্ষিণা হল তাঁর সংসার-জীবন। আশ্রম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার এক বৎসরের মধ্যেই কবিজায়া লোকান্তরিতা হলেন। মাস কয়েক পরে কবি হারালেন তাঁর মেজোমেয়েকে। পত্নী ও কন্যার এই মর্মান্তিক বিয়োগবেদনাও কবিচিত্তকে ঈশ্বরনিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করেছে। কিন্তু একের পর এক এই মৃত্যুর আঘাতে আরেকটি অবিস্মরণীয় মৃত্যুর স্মৃতি নিশ্চয়ই তাঁর মানসপটে ভেসে উঠেছিল। 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি বলেছেন, "আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে।"

এই 'অশ্রুর মালা'ই নূতন করে গাঁথা হল মোহিতচন্দ্র-সেন সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থে'র উৎসর্গ-কবিতায়। চিত্রার যুগে রচিত এই গানটিকে সমগ্র 'কাব্যগ্রন্থে'র উৎসর্গ-কবিতারূপে স্থাপন করে কবি বলছেন, 'আমারে কর তোমার বীণা, লহ গো লহ তুলে।' এই কাব্যগীতেরই শেষকলিতে আছে:

কেহ না জানে কি নব তানে
উঠিবে গীত শূন্যপানে
আনন্দের বারতা যাবে
অনন্তের কূলে।

আমরা পূর্বে বলেছি, এই গ্রন্থোৎসর্গ কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশেই নিবেদিত [৯৫]। চল্লিশোত্তর কবি তাঁর সমগ্র কাব্যরচনাকে যে-বীণাবাদিনীর হাতে তুলে দিয়ে বলছেন "আমারে কর তোমার বীণা," তিনি কবি ও কাব্যলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বীণাপাণিও হতে পারতেন। কিন্তু কবি এই গানটিকে গীতবিতানে

"প্রেম" পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত করে [৯৬] সে অনুমানের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। তা ছাড়া গানের শেষের কলিতে একটি আভ্যন্তরীণ ইঙ্গিতও কাদম্বরী দেবীর প্রতিই অঙ্গুলি-নির্দেশ করছে। বলাকার 'ছবি' কবিতায় কবি তাঁর নতুন-বৌঠানের ফোটোকে সম্বোধন করে বলেছেন :

নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
তব স্বর বাজে মোর গানে ;
কবির অন্তরে তুমি কবি।

'কাব্যগ্রন্থে'র উৎসর্গ-কবিতায়ও এই একই প্রকাশরীতি লক্ষণীয় : 'কেহ না জানে কি নব তানে / উঠিবে গীত শূন্যপানে।' তা ছাড়া কবির অন্তরে তিনি কবি বলেই তাঁর কাছে অনুরক্ত কবির প্রার্থনা, 'আমারে কর তোমার বীণা।'

'কাব্যগ্রন্থে'র শুধু উৎসর্গ-কবিতাই নয়, আরও অনেক কবিতা কাদম্বরী দেবীর প্রতি কবির অনুরাগে রঞ্জিত হয়েছে বলে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত এই কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলী গ্রন্থানুক্রমে মুদ্রিত না হয়ে ভাবানুক্রমে বিভিন্ন বিভাগে সজ্জিত হয়েছিল, এবং এই সকল বিভাগের 'প্রবেশক' রূপে কবি অনেকগুলি নূতন কবিতা রচনা করেছিলেন[৯৭]। বিভাগগুলি হচ্ছে—যাত্রা, হৃদয়-অরণ্য, নিষ্ক্রমণ, বিশ্ব, সোনার তরী, লোকালয়, নারী, কল্পনা, লীলা, কৌতুক, যৌবনস্বপ্ন, প্রেম, কবিকথা, প্রকৃতিগাথা, হতভাগ্য, সংকল্প, স্বদেশ, রূপক, কাহিনী, কথা, কণিকা, মরণ, নৈবেদ্য, জীবনদেবতা, স্মরণ, শিশু, গান, নাট্য।

এই বিভাগগুলির মধ্যে 'স্মরণ' এবং 'গানে'র কোনো 'প্রবেশক' কবিতা নেই। কয়েকটি পুরনো কবিতা প্রবেশকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। বাকিগুলি কাব্যগ্রন্থের বিভাগ-বিন্যাসের সময়ই রচিত। সোনার তরী, কল্পনা এবং নৈবেদ্য,—এই তিনটি নামে কবির তিনখানি কাব্যসংকলন আছে। কিন্তু 'কাব্যগ্রন্থে'র এই বিভাগত্রয়ে সংকলিত কবিতাগুলি নূতন ভাবে গ্রথিত। তা ছাড়া, ভাবানুক্রমে সজ্জিত কাব্যগ্রন্থের বিভাগগুলির নামকরণ দেখে একথা বলা অন্যায় হবে না যে, ১৩১০ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্যলোকে বিশুদ্ধ ঈশ্বরভক্তিমূলক কোনও স্বতন্ত্র বিভাগ রচনা করা অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত হয়নি।

'কাব্যগ্রন্থে'র প্রথম বিভাগের নাম 'যাত্রা'। ওতে কবির বাল্যকালের তিনটি কবিতা স্থান পেয়েছে। কাব্যবিচারে কবিতাগুলি নিতান্তই নগণ্য। কিন্তু এ যাত্রা যে ঈশ্বরাভিমুখে নয়, তা কবিতাগুলি পড়লেই বুঝতে পারা যায়। বরং 'সোনার তরী'র "নিরুদ্দেশ যাত্রা"র অনতিস্ফুট আভাস এতে রয়েছে। এই 'যাত্রা'র প্রবেশক কবিতায় কবি বলছেন :

কেবল তব মুখের পানে
চাহিয়া,
বাহির হনু তিমির রাতে
তরণীখানি বাহিয়া!

নয়নপাতে ডেকেছ মোরে
নীরবে!
হৃদয় মোর নিমেষ মাঝে
উঠেছে ভরি' গরবে।

কথাটি আমি শুধাব নাকো
তোমারে!
দাঁড়াব নাকো ক্ষণেক তরে
দ্বিধার ভরে দুয়ারে।

বলাই বাহুল্য, এই 'তুমি' 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র যাত্রাসঙ্গিনীকেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

কাব্যগ্রন্থের 'কল্পনা' বিভাগে ষোলোটি কবিতা স্থান পেয়েছে। তার মধ্যে আছে 'ছবি ও গানে'র 'নিশীথ চেতনা', 'চৈতালি'র 'নিশীথ', 'কল্পনা'র 'মানস-প্রতিমা' [তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর] এবং 'স্বপ্ন' [দূরে বহু দূরে/স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে]। এই চারিটি কবিতার মধ্যে নিশীথ চেতনা, নিশীথ স্বপ্ন এবং মানস-প্রতিমার ভাবানুষঙ্গ বিশ্লেষণ করে কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে এগুলির সম্পর্ক পূর্বেই নির্ণীত হয়েছে। স্বভাবতই 'কল্পনা' বিভাগের প্রবেশক-কবিতা রচনার সময়ও কাদম্বরী দেবীর ভাবানুষঙ্গ কবিমানসে ক্রিয়াশীল ছিল। কবি বলছেন :

মোর কিছু ধন আছে সংসারে,
বাকি সব ধন স্বপনে,
নিভৃত স্বপনে !
ওগো কোথা মোর আশার অতীত,
ওগো কোথা তুমি পরশ-চকিত,
কোথা গো স্বপনবিহারী !
তুমি এস এস গভীর গোপনে,
এস গো নিবিড় নীরব চরণে,
বসনে প্রদীপ নিবারি,
এস গো গোপনে !

* * *

রাজপথ দিয়ে আসিয়ো না তুমি,
পথ ভরিয়াছে আলোকে,
প্রখর আলোকে !
সবার অজানা, হে মোর বিদেশী,
তোমারে না যেন দেখে প্রতিবেশী,
হে মোর স্বপনবিহারী !
তোমারে চিনিব প্রাণের পুলকে,
চিনিব সজল আঁখির পলকে,
চিনিব বিরলে নেহারি'
পরম পুলকে।

বলাই বাহুল্য, এই কবিতায় 'নিভৃত স্বপনে' 'গভীর গোপনে' কবি যাঁকে পেতে চাইছেন তাঁর সঙ্গে তাঁর জীবন-মরণ-বিহারী 'মানস-প্রতিমা'র একাত্মতা অনুভব না করে পারা যায় না। মানস-প্রতিমায় তিনি ছিলেন কবির সন্ধ্যাস্বপনবিহারী, তাঁর সাধের সাধনা, এখানেও তিনি হয়েছেন তাঁর স্বপনবিহারী—আশার অতীত স্বপ্নের ধন।

কাব্যগ্রন্থের 'লীলা'-বিভাগের প্রবেশক [তোমারে পাছে সহজে বুঝি / তাই কি এত লীলার ছল] এবং 'সোনার তরী'র প্রবেশক [তোমায় চিনি বলে আমি করেছি গরব] কবিতা-দুটিতেও মানস-প্রতিমাকেই কবি স্মরণ করেছেন।

'সোনার তরী' বিভাগের শুরু হয়েছে 'সোনার তরী' কবিতা দিয়ে, আর ওর সমাপ্তি 'আবির্ভাব' [বহুদিন হল কোন্ ফাল্গুনে] ও 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য়। এ সব কবিতার সঙ্গে কাদম্বরী দেবীর জীবনদেবতা-মূর্তির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। স্বভাবতই মনে করা যেতে পারে প্রবেশক-কবিতায়ও কবি তাঁকেই ধ্যান করেছেন—

তোমায় চিনি বলে আমি করেছি গরব
লোকের মাঝে ;
মোর আঁকা পটে দেখেছে তোমায়
অনেকে অনেক সাজে।

* * *

তোমার অনেক কাহিনী গাহিয়াছি আমি
অনেক গানে।
গোপন বারতা লুকায়ে রাখিতে
পারিনি আপন প্রাণে!

* * *

জ্যোৎস্না-নিশীথে, পূর্ণ শশীতে,
দেখেছি তোমার ঘোমটা খসিতে,
আঁখির পলকে পেয়েছি তোমায়
লখিতে!
বক্ষ সহসা উঠিয়াছে দুলি,
অকারণে আঁখি উঠিছে আকুলি,
বুঝেছি হৃদয়ে ফেলেছ চরণ
চকিতে!

এ-সব কবিতায় যে লীলারস আস্বাদিত হয়েছে তাতে ভগবানকে টেনে আনা কষ্টকল্পনা হবে। বস্তুত কাব্যগ্রন্থের যাত্রা, সোনার তরী, কল্পনা, লীলা প্রভৃতি বিভাগের প্রবেশক-কবিতায় যে লীলারস উচ্ছলিত হয়েছে তা একান্ত ভাবেই মানবিক স্তরে বিলসিত। বরং নানা নামে নানা রূপে কবি যে একটি বিশিষ্ট সত্তাকেই বার বার স্মরণ করেছেন তা তর্কাতীত ভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে প্রেম-পর্যায়ের প্রবেশক ও সমাপ্তি-কবিতায়।

প্রেম-পর্যায়ের প্রবেশকে কবি বলছেন, আকাশ-সিন্ধুমাঝে রবি-শশাঙ্ক অবিরাম মাতোয়ারা হয়ে অযুত চক্রে ঘুরে মরছে। এই ঘূর্ণির মাঝখানে প্রেমই ধ্রুব সুন্দর :

স্থির আছে শুধু একটি বিন্দু
ঘূর্ণির মাঝখানে—
সেইখান হতে স্বর্ণকমল
উঠেছে শূন্যপানে !
সুন্দরী ওগো সুন্দরী !
শতদলদলে ভুবনলক্ষ্মী
দাঁড়ায়ে রয়েছ মরি মরি !
জগতের পাকে সকলি ঘুরিছে,
অচল তোমার রূপরাশি !
নানাদিক হতে নানা দিন দেখি,—
পাই দেখিবারে ওই হাসি !

কবিতার শেষার্ধে এই বিশ্বসত্যকে নিজের সত্তায় অনুভব করে কবি বলেছেন :

জনমে মরণে আলোকে আঁধারে
চলেছি হরণে পুরণে,
ঘুরিয়া চলেছি ঘুরণে !
* * *
কোথাও থাকিতে না পারি ক্ষণেক,
রাখিতে পারিনে কিছু,
মত্ত হৃদয় ছুটে চলে যায়
ফেণপুঞ্জের পিছু !
হে প্রেম, হে ধ্রুব সুন্দর !
স্থিরতার নীড় তুমি রচিয়াছ
ঘূর্ণার পাকে খরতর !

এই প্রবেশক-কবিতায় প্রেমের ধ্রুব-সুন্দর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার পর এই পর্যায়ে প্রথমেই স্থান পেয়েছে 'মদনভস্মের পর' কবিতাটি। তারপর ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর 'মরণ' এবং 'কো তুঁহু'। তারপর 'মানসী'র ব্যক্তিগত

প্রেমের কবিতাগুলি। শেষের দিকে 'কল্পনা' ও 'ক্ষণিকা' থেকেও প্রেমের কয়েকটি কবিতা ও গান সংকলিত হয়েছে। কিন্তু এই বিভাগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা হল শেষের কবিতাটি। 'সোনার তরী' কাব্যের "অচল স্মৃতি" দিয়েই 'প্রেমে'র পূর্ণাহুতি রচিত হয়েছে। কবি বলছেন:

আমার হৃদয়-ভূমি-মাঝখানে জাগিয়া রয়েছে নিতি
অচল ধবল শৈলসমান একটি অচল স্মৃতি।

যেখানে চরণ রেখেছে, সে মোর মর্ম গভীরতম,
উন্নত শির রয়েছে তুলিয়া সকল উচ্চে মম।
মোর কল্পনা শত
রঙিন মেঘের মত
তাহারে ঘেরিয়া হাসিছে কাঁদিছে সোহাগে হয়েছে নত।

* * *

চারিদিকে তার কত আসা যাওয়া কত গীত কত কথা,
মাঝখানে শুধু ধ্যানের মতন নিশ্চল নীরবতা।
দূরে গেলে তবু, একা
সে শিখর যায় দেখা,
চিত্ত-গগনে আঁকা থাকে তার নিত্য-নীহার-রেখা!

এই 'অচল স্মৃতি'তে যাঁর প্রেমমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে, কবি বলছেন, তাঁরই উদ্দেশে তাঁর 'বাসনা-বিহগ একেলা সেথায় ধাইতেছে নিশিদিন।' যদিও কবিতাটি 'সোনার তরী'-যুগের রচনা, তবু 'কাব্যগ্রন্থে'র প্রেম-পর্যায়ের সবশেষে বিন্যস্ত হয়ে তা নূতন তাৎপর্য পেয়েছে। প্রেমের ধ্রুব-সুন্দর মূর্তিই কবির 'হৃদয়-ভূমি-মাঝখানে' 'অচল ধবল শৈল সমান' একটি অচল স্মৃতিতে চিরবিরাজমান। কবির চিত্তগগনে তারই নিত্য-নীহার-রেখা নিশ্চল নীরবতায় অঙ্কিত হয়ে রয়েছে

য়ে
:হ
:ত

'কাব্যগ্রন্থ' প্রকাশের পর-বৎসর বঙ্গবাসী অফিস থেকে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রনাথকে তাঁর আত্মজীবনী লিখতে অনুরোধ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনবৃত্তান্তটা বাদ দিয়ে কেবল কাব্যের মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে সেদিন তাঁর জীবনটা যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার কথাই লিখে দিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছেন, তাঁর সুদীর্ঘ কালের কবিতা লেখার ধারাটাকে যখন তিনি পশ্চাৎ ফিরে দেখেন তখন তাঁর মনে হয় এ একটা ব্যাপার, যার ওপরে তাঁর কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। এক কৌতুকময়ী রমণী 'কবির অন্তরে কবি' হয়ে তাঁর সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ নিয়ে তাঁর জীবনকে রচনা করে চলেছেন। কবি তাঁর কাব্যে তাঁরই নাম দিয়েছেন 'জীবনদেবতা'। এই জীবনদেবতা কে, এবং কবির জীবনে তাঁর কী কাজ, সে তত্ত্ব চিত্রার অন্তর্যামী কবিতার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে অবশেষে কবি বলছেন, "নিজের জীবনের মধ্যে এই যে আবির্ভাবকে অনুভব করা গেছে— যে আবির্ভাব অতীতের মধ্য হইতে অনাগতের মধ্যে প্রাণের পালের উপরে প্রেমের হাওয়া লাগাইয়া আমাকে কাল-মহানদীর নূতন নূতন ঘাটে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছেন সেই জীবনদেবতার কথা বলিলাম।"[৯৮]

'প্রাণের পালের উপরে প্রেমের হাওয়া' লাগিয়ে যিনি কবিকে কাল-মহানদীর নূতন নূতন ঘাটে বহন করে নিয়ে চলেছেন সেই অন্তর্যামী-জীবনদেবতার কথা বলতে গিয়ে তাঁরই প্রাকৃত মানবীমূর্তিকে কবির মনে পড়ে নি, এ কথা চিন্তা করা মনস্তত্ত্বসম্মত নয়।

এই আত্মপরিচয় রচনার অল্পদিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের জীবনবৃত্তান্তে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হল। ১৯০৫ সনের [১৩১২ বঙ্গাব্দ] বঙ্গভঙ্গ তৎপরবর্তী স্বদেশী আন্দোলনের সংগঠনকর্মে কবি সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তমালতরুতলের বংশীবাদক হলেন মহা-কুরুক্ষেত্রের পাঞ্চজন্যনাদী পার্থসারথি। 'মানসী'র যুগে 'গুরুগোবিন্দ' কবিতায় কবি শিখনেতার কণ্ঠে ভাষা দিয়ে বলেছিলেন :

কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব—
'পেয়েছি আমার শেষ।

তোমরা সকলে এস মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ ॥'

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দিনে এই বজ্রগর্ভ বাণী যেন কবিরই নিজের অন্তরের বাণী হয়ে উঠেছিল। স্বদেশপ্রেমাত্মক সংগীতে ও কবিতায়, প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় রবীন্দ্র-ভারতী অগ্নিবীণা বাজাতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু এই 'প্রায়োজনিক' প্ররোচনা 'অসূর্যম্পশ্য' কবিকে বেশিদিন তাঁর তপঃক্ষেত্র থেকে দূরে রাখতে পারল না। নগর-কীর্তনের মোহমুক্ত কবি নিজের ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় ফিরে গেলেন তাঁর আশ্রমনিকেতনে। 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থে সে ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে।

কবিজীবনের সেই আত্মিক সংকটের দিনে আবার ঘটল মৃত্যুর আবির্ভাব। কবিপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ গত হয়েছিলেন ১৩১১ সালের ৬ই মাঘ [১৯০৫ সনের ১৯ জানুয়ারি]। কবি তাঁর কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথকে হারালেন ১৩১৪ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ। ঠিক পাঁচ বৎসর পূর্বে এই একই দিনে [৭ই অগ্রহায়ণ] কবি হারিয়েছিলেন তাঁর পত্নীকে। পাঁচ বৎসরের মধ্যে পিতা, পত্নী ও দুটি সন্তানের মৃত্যু শোকার্ত কবিচিত্তকে যে বিচলিত করেছিল তা বলাই বাহুল্য। কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু ছিল সবচেয়ে মর্মান্তিক। শমীর বয়স তখন ১৩ বৎসর। শান্তিনিকেতনের পূজাবকাশে মাতৃহারা বালক গিয়েছিল মুঙ্গেরে আশ্রমবন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে। সেখানে হঠাৎ সে কলেরায় আক্রান্ত হয়। সংবাদ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন তার কাছে ছুটে গেলেন তখন শমীর শেষ অবস্থা। অসহায় পিতা সন্তানের শেষকৃত্য সম্পন্ন করে নীরবে ফিরে এলেন নিজের সাধনক্ষেত্রে। বাইরের কাজকর্ম ঠিকই চলতে লাগল, কিন্তু অন্তরে যে বিপ্লব ঘটে গেল তার কথা কেউ জানতে পারল না। এই সময়ে লেখা একখানি চিঠিতে কবি লিখেছেন, "অল্পদিনের মধ্যে খুব একটা বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে এসেছি।...সমস্ত আঘাত কাটিয়ে জীবনযাত্রা যেমন চলছিল তেমনি চলছে, হয়তো একটা পরিবর্তন ঘটেছে—কিন্তু সে পরিবর্তন উপর থেকে দেখা যায় না—সে পরিবর্তন নিজের চোখেও হয়তো সম্পূর্ণভাবে লক্ষ্যগোচর হতে পারে না।"[৯৯]

কবিজীবনে এই বিপ্লবী পরিবর্তনের সাক্ষী হয়ে এল গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি। 'খেয়া' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩১৩ সালের আষাঢ় মাসে। 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হল তার চার বৎসর পরে, ১৩১৭ সালের শ্রাবণে। এই চার বৎসরে কবি অনেক গদ্যগ্রন্থ রচনা করেছেন, কিন্তু কাব্যগ্রন্থ একখানিও নয়।

'গীতাঞ্জলি'র গানগুলি ১৩১৬ ও ১৭ সালে লেখা। ১৭ সালে ৯৮টি, ১৬ সালে ৪৫টি। বাকিগুলি '১৩, '১৪ ও '১৫ সালে লেখা হয়েছিল। প্রথম চারটি রচনার তারিখ দেওয়া নেই, কেবল সালের নির্দেশ আছে—১৩১৩। পঞ্চম গান [অন্তর মম বিকশিত করো / অন্তরতর হে] লেখা হয় শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর একবিংশতি দিবসে, ১৩১৪ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণ। এই গানে কবি তাঁর শোকার্ত চিত্তকে ইষ্টদেবতার চরণে নিবেদন করে শান্তি ও সান্ত্বনা খুঁজছেন—"চরণপদ্মে মম চিত নিস্পন্দিত করো হে।" গীতাঞ্জলির আরো দুটি গান ১৩১৪ সালের অগ্রহায়ণে লেখা। তার প্রথমটিতে কবি বলছেন :

চেতনা আমার কল্যাণ-রস-সরসে
শতদল সম ফুটিল পরম হরষে
সব মধু তার চরণে তোমার ধরিয়া।
নীরব আলোকে জাগিল হৃদয়প্রান্তে
উদার উষার উদয়-অরুণ কান্তি,
অলস আঁখির আবরণ গেল সরিয়া।

দ্বিতীয়টিতে [তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে] কবি তাঁর ইষ্টদেবতার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলছেন :

এস দুঃখে সুখে এস মর্মে
এস নিত্য নিত্য সব কর্মে ;
এস সকল কর্ম অবসানে।
তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে ॥

এই শরণাগতির সুরেই 'গীতাঞ্জলি'র সুর বাঁধা হয়েছে। সংগ্রামক্লান্ত শোকার্ত কবি তাঁর প্রাণে ইষ্টদেবতাকে আবাহন করেছেন। এই পরম আত্মনিবেদনের লগ্নে কবি স্বভাবতই তাঁর সমস্ত সুখদুঃখকে ইষ্টদেবতার চরণে নিবেদন করে শান্তরসে নিমগ্ন হতে চেয়েছেন। তাই গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির মুখ্য আলম্বন ঈশ্বরনিষ্ঠা ও ঈশ্বরপ্রেম।

কিন্তু মুখ্য আলম্বন হলেও একমাত্র আলম্বন নয়। গীতাঞ্জলিতে কবিতা ও গানের সংখ্যা ১৫৭। তার মধ্যে ৮৬টি গানে কবি সুর যোজনা করেছেন, ৭১টিতে করেন নি। সুরসংযুক্ত গানগুলিই গীতবিতানে স্থান পেয়েছে। গীতবিতানের গানগুলি কবি পূজা, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র ও আনুষ্ঠানিক —এই কটি ভাগে বিন্যস্ত করেছেন। বিভাগ-বিন্যাস সুচিন্তিত ও নির্ভরযোগ্য হয়েছে একথা বলা যাবে না। গীতাঞ্জলির গানগুলির মধ্যে পূজা-বিভাগে স্থান পেয়েছে ৬৩টি। প্রকৃতি-বিভাগে ১৭, স্বদেশে ১, বিচিত্রে ৪ এবং প্রেম-পর্যায়ে একটি।

আমাদের বিশ্বাস গীতাঞ্জলির ৬০, ৬১ ও ৮৩ সংখ্যক তিনটি গানে কাদম্বরী দেবীর ছায়াপাত হয়েছে। ৬০ এবং ৬১ সংখ্যক গান দুটি ১৩১৭ সালের বৈশাখ মাসের ৪ ও ১২ তারিখে লেখা। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুদিন ৮ বৈশাখ। চিত্রা-চৈতালির যুগ পর্যন্ত দেখা গেছে, বৈশাখের প্রথম পক্ষে রচিত কবিতায় কাদম্বরী দেবীর স্মৃতিই মুখ্য স্থান পেয়েছে। গীতাঞ্জলির আলোচ্য দুটি গানও একই সুরে বাঁধা। স্মৃতি-বিস্মৃতির আলো-আঁধারি লীলায় 'অন্ধকারে অগোচরে' তাঁর চেতনায় যে কবিমানসীরই আবির্ভাব ঘটেছে সেকথাই কবি বলছেন এই দুটি গানে—

বিশ্ব যখন নিদ্রামগন,
গগন অন্ধকার ;
কে দেয় আমার বীণার তারে
এমন ঝংকার।
নয়নে ঘুম নিল কেড়ে,
উঠে বসি শয়ন ছেড়ে,
মেলে আঁখি চেয়ে থাকি
পাই নে দেখা তার।

এই স্বপনচারিণী বীণাবাদিনী কবির স্বপ্নেই আনাগোনা করেন, তাঁর জাগ্রৎ চেতনায় ধরা দেন না ; এইজন্যেই কবির আক্ষেপ। কিন্তু তবু তাঁরই গলায় নিজের কণ্ঠহার পরিয়ে দেবার জন্যে তিনি ব্যাকুল—

কোন্ বেদনায় বুঝি না রে
হৃদয় ভরা অশ্রুভারে,

পরিয়ে দিতে চাই কাহারে
আপন কণ্ঠহার।

এই গানটি পূজা-অংশে বিন্যস্ত হলেও এতে চৈতালি-যুগে বিরচিত প্রেমের কবিতার ভাবানুষঙ্গই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এক সপ্তাহ পরে লেখা ৬১-সংখ্যক গানটিকে কবি নিজেই প্রেম-পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। ভাবের দিক দিয়ে কিন্তু আগের রচনাটির সঙ্গে তা যুগ্মসত্তায় গ্রথিত। এখানেও নীরব রাতে বীণা হাতে স্বপনচারিণীর আবির্ভাব।—

এসেছিল নীরব রাতে
বীণাখানি ছিল হাতে,
স্বপনমাঝে বাজিয়ে গেল
গভীর রাগিণী।

আগের রচনায় কবি আপন কণ্ঠহার তাকে পরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, এখানে 'তার মালার পরশ' বুকে পাওয়ার জন্যে ব্যাকুলতা আক্ষেপানুরাগের ভঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে—

জেগে দেখি দখিন হাওয়া
পাগল করিয়া
গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায়
আঁধার ভরিয়া।
কেন আমার রজনী যায়
কাছে পেয়ে কাছে না পায়,
কেন গো তার মালার পরশ
বুকে লাগে নি॥

গীতাঞ্জলি পর্যায়েও যে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র 'মানস-সুন্দরী'র আবির্ভাব ঘটেছে তার নিঃসংশয় প্রমাণ ৮৩-সংখ্যক কবিতাটি। কবি এই রচনায় সুরযোজনা করেন নি, তাই ওটি গীতবিতানে স্থান পায় নি। প্রথম স্তবকটি উদ্ধার করলেই এই রচনার আলম্বনস্বরূপিণীকে চিনতে পারা যাবে :

কথা ছিল এক-তরীতে কেবল তুমি আমি
যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে ;

ত্রিভুবনে জানবে না কেউ আমরা তীর্থগামী
কোথায় যেতেছি কোন্ দেশে সে কোন্ দেশে।
কূলহারা সেই সমুদ্র-মাঝখানে
শোনাব গান একলা তোমার কানে,
ঢেউয়ের মতন ভাষা-বাঁধন-হারা
আমার সেই রাগিণী শুনবে নীরব হেসে।

এই রচনার "এক-তরীতে কেবল তুমি আমি" এবং "ত্রিভুবনে জানবে না কেউ আমরা তীর্থগামী"—এই বাক্য-দুটিতে শুধু সোনার তরীর নিরুদ্দেশ যাত্রাই নয়, কবির সমগ্র কৈশোর-যৌবনের লীলাই অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। পরবর্তীকালে 'বীথিকা'র 'কৈশোরিকা' কবিতায় কবি বলেছেন—

স্রোতে চলে তরী ভাসি।
জীবনের স্মৃতি-সঞ্চয়-করা তরী
দিনরজনীর সুখে দুখে গেছে ভরি,
আছে গানে গাঁথা কত কান্না ও হাসি।
পেলব প্রাণের প্রথম পশরা নিয়ে
সে তরণী-'পরে পা ফেলেছ তুমি প্রিয়ে,
পাশাপাশি সেথা খেয়েছি ঢেউয়ের দোলা।
কখনো বা কথা কয়েছিলে কানে কানে,
কখনো বা মুখে ছলোছলো দুনয়ানে,
চেয়েছিলে ভাষা-ভোলা।

'কৈশোরিকা'র সঙ্গে কবির এই নৌযাত্রাই গীতাঞ্জলির রচনাটিতে ভিন্ন ছন্দে প্রকাশিত হয়েছে। এর 'তুমি' আর-যিনিই হোন্, ভগবান নন, কেননা ভগবান 'তীর্থদেবতা' হতে পারেন, কিন্তু 'তীর্থগামী' যাত্রী কিছুতেই হতে পারেন না। 'ত্রিভুবনে জানবে না কেউ আমার তীর্থগামী'—এই পঙ্‌ক্তিটি বিশেষভাবেই লক্ষ্য করার মত।

'গীতাঞ্জলি'র পরবর্তী কাব্য 'গীতিমাল্যে'র ২২, ২৩ ও ২৪ সংখ্যক তিনটি গানেও কাদম্বরী দেবীর আবির্ভাব অনুভব করা যায়। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্যের মধ্যে রয়েছে 'জীবনস্মৃতি'। গীতাঞ্জলির সর্বশেষ গান লেখা হয়েছিল ১৩১৭ সালের ২৯ শ্রাবণ। গীতিমাল্যের বেশির ভাগ রচনাই

১৩১৮ সালের চৈত্র থেকে ১৩২১ সালের আষাঢ়ের মধ্যে লেখা। 'জীবনস্মৃতি' ১৩১৮ সালের ভাদ্র থেকে ১৩১৯ সালের শ্রাবণ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে 'প্রবাসী' মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়। 'গীতিমাল্যে'র ২২, ২৩ ও ২৪ সংখ্যক কবিতা লেখা হয় ১৩১৯ সালের ৬ ও ৭ বৈশাখ। কবি তখন 'জীবনস্মৃতি'র শেষ পর্যায় রচনা করছেন। লিখছেন 'মৃত্যুশোক'। স্বভাবতই জীবনসিন্ধু মন্থন করে তাঁর মানসপটে ভেসে উঠেছে কাদম্বরী দেবীর মানবী মূর্তিখানি। কবির এই আত্মনিমগ্ন মানসিক অবস্থায় যখন আবার ৮ই বৈশাখ এসেছে তখন তাঁর উদ্দেশেই কবি তিনটি গানের গীতিমাল্য রচনা করেছেন। এই তিনটি গান হল: 'কে গো অন্তরতর সে।' [৬ বৈশাখ ১৩১৯], 'আমারে তুমি অশেষ করেছ / এমনি লীলা তব।' [৭ বৈশাখ ১৩১৯], এবং 'হার-মানা হার পরাব তোমার গলে।' [৭ বৈশাখ ১৩১৯]।

গীতাঞ্জলির কবি একদিন তাঁর ইষ্টদেবতাকে 'অন্তরতর' সম্বোধন করে যে গান রচনা করেছিলেন, তার সঙ্গে 'গীতিমাল্যে'র 'কে গো অন্তরতর সে' গানের ভাবানুষঙ্গ বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারা যাবে, প্রথম গানটি শরণাগত ভক্তের প্রার্থনাসংগীত, আর দ্বিতীয়টি গোপন অনুরাগের আনন্দিত হৃদয়োচ্ছ্বাস। গানটি এখানে সমগ্রভাবেই উদ্ধৃত হল :

কে গো অন্তরতর সে।
আমার চেতনা আমার বেদনা
তারি সুগভীর পরশে।
আঁখিতে আমার বুলায় মন্ত্র,
বাজায় হৃদয়বীণার তন্ত্র,
কত আনন্দে জাগায় ছন্দ
কত সুখে দুখে হরষে॥

সোনালী রুপালি সবুজে সুনীলে
সে এমন মায়া কেমনে গাঁথিলে,
তারি সে আড়ালে চরণ বাড়ালে
ডুবালে সে সুধাসরসে।
কত দিন আসে কত যুগ যায়
গোপনে গোপনে পরান ভুলায়,

নানা পরিচয়ে নানা নাম লয়ে
নিতি নিতি রস বরষে ॥

এই উদ্ধৃতির দ্বিতীয় স্তবকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। 'বলাকা'র ছবি কবিতায় কবি বলেছেন, 'ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা / বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।' এই স্বীকৃতিই গীতিমাল্যের গানটিতে উচ্চারিত হয়েছে: 'কত দিন আসে কত যুগ যায় / গোপনে গোপনে পরান ভুলায়।'

পরদিন [৭ বৈশাখ] লেখা দুটি গানও বিশুদ্ধ প্রেম-সংগীত। 'কে গো অন্তরতর সে' রচনায় কবি বলেছেন, 'আমার চেতনা আমার বেদনা / তারি সুগভীর পরশে।' এই 'সুগভীর স্পর্শ'ই পরের দিনের সংগীতে হয়েছে 'অমৃতস্পর্শ'। কবি বলছেন:

তোমারি ঐ অমৃতপরশে
আমার হিয়াখানি
হারাল সীমা বিপুল হরষে
উথলি' উঠে বাণী।

এই সীমাহারা বিপুল হর্ষ লীলা-রস-রহস্যে হয়তো মর্ত্য-সীমাকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে, কিন্তু একই দিনে লেখা পরের গানটিতে বিশুদ্ধ মানবপ্রেমই অভিমানী প্রেমিকের কণ্ঠে উচ্চারিত—

হার-মানা হার পরাব তোমার গলে।
দূরে রব কত আপন বলের ছলে।
জানি আমি জানি ভেসে যাবে অভিমান,
নিবিড় ব্যথায় ফাটিয়া পড়িবে প্রাণ,
শূন্য হিয়ার বাঁশিতে বাজিবে গান,
পাষাণ তখন গলিবে নয়নজলে।

শেষের পঙ্‌ক্তিটি কারোয়ারে কাদম্বরী দেবীকে উপহার-দেওয়া কাচমণি পাথরের 'হৃদয়ে'-খোদিত ষোড়শাক্ষর পদযুগ্মককে স্মরণ করিয়ে দেবে:

পাষাণ হৃদয় কেটে
খোদিনু নিজের হাতে
আর কি মুছিবে লেখা
অশ্রুবারিধারাপাতে।

গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালিতে সংগুপ্ত কবির প্রেম-চেতনার সংশয়াতীত প্রমাণ হিসাবে 'গীতালি'র সর্বশেষ কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। বস্তুত, একসূত্রে গ্রথিত গীতাখ্য এই তিনখানি কাব্যেরই ভরতবচন রচিত হয়েছে 'গীতালি'র এই সর্বশেষ কবিতাটিতে। তাই কবিতাটির গুরুত্ব অপরিসীম। এই কবিতায় গীতাঞ্জলির কবি বলছেন,

> এই তীর্থদেবতার ধরণীর মন্দির-প্রাঙ্গণে
> যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইনু সযত্ন চয়নে
> সায়াহ্নের শেষ আয়োজন ; যে পূর্ণ প্রণামখানি
> মোর সারাজীবনের অন্তরের অনির্বাণ বাণী
> জ্বালায়ে রাখিয়া গেনু আরতির সন্ধ্যা-দীপ মুখে
> সে আমার নিবেদন তোমাদের সবার সম্মুখে
> হে মোর অতিথি যত। তোমরা এসেছ এ জীবনে
> কেহ প্রাতে, কেহ রাতে, বসন্তে, শ্রাবণ-বরিষনে ;
> কারো হাতে বীণা ছিল, কেহ বা কম্পিত দীপশিখা
> এনেছিলে মোর ঘরে ; দ্বার খুলে দুরন্ত ঝটিকা
> বার বার এনেছ প্রাঙ্গণে। যখন গিয়েছ চলে
> দেবতার পদচিহ্ন রেখে গেছ মোর গৃহতলে।
> আমার দেবতা নিল তোমাদের সকলের নাম ;
> রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবারে প্রণাম।

কবিকণ্ঠের এই অকুণ্ঠ স্বীকৃতি থেকে এ কথা বিনা দ্বিধাতেই বলা যেতে পারে যে, গীতাঞ্জলি-গাতিমাল্য-গীতালির কবি বহুক্ষেত্রে প্রেমের উপকরণ দিয়েই তাঁর 'পূজার অর্ঘ্য' রচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলেই আমরা গীতাঞ্জলি-পর্বের আলোচনার উপসংহার রচনা করব। গীতালির আলোচ্য শেষ কবিতাটি রচিত হয় এলাহাবাদে ১৩২১ সালে, ৩রা কার্তিক প্রভাতে। সেইদিনই সন্ধ্যায় কবি রচনা করেন কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত মুক্তবন্ধ-ছন্দে রচিত 'বলাকা'র প্রথম কবিতা 'ছবি'।

রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহে 'বলাকা'র প্রায় একযুগ পরে এল 'পূরবী'। মাঝখানে আছে দুখানি কাব্যগ্রন্থ—'পলাতকা' আর 'শিশু ভোলানাথ'। 'পলাতকা'য় আছে শ্বাসাঘাতপ্রধান-রীতির মুক্তবন্ধ-ছন্দে লেখা কয়েকটি কাহিনী-কবিতা। 'শিশু ভোলানাথে' ছন্দিত হয়েছে কবির প্রৌঢ়মানসের শিশুলীলা। 'পলাতকা'র কোনো কোনো কবিতায় কাহিনীটা নির্মোক। বিশেষ করে 'মুক্তি' কবিতায় নাম-না-বলা নায়িকার মধ্যে নতুন-বৌঠানের মূর্তিকে যেন চিনতে পারা যায়। সে বলছে, 'এ সংসারে এসেছিলেম ন-বছরের মেয়ে'। তারপর 'দশের ইচ্ছা বোঝাই-করা' জীবনটাকে টেনে টেনে একদিন সে বাইশ বছরের প্রান্তে এসে পৌঁছল। জীবনে এই প্রথম সে শুনতে পেল, 'বিয়ের বাঁশি বিশ্ব-আকাশ মাঝে।' সে আবিষ্কার করল নিজের নারীসত্তাকে :

আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুরে বেঁধেছে জ্যোৎস্না-বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা,
মিথ্যা হত কাননে ফুল-ফোটা।

এই আত্ম-আবিষ্কারে সে বুঝতে পারল জীবনটা তার কাছে একটা মস্ত ফাঁকি। তাই মরণ-বাসরঘরেই তার মুক্তির ডাক এল। ভানুসিংহের মানসরাধাও একদিন মৃত্যুকে প্রিয়তম বলেই জেনেছিল। বলেছিল, 'মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান।' 'মুক্তি'র নায়িকাও বলছে :

দ্বারে আমার প্রার্থী সে যে, নয় সে কেবল প্রভু,
হেলা আমায় করবে না সে কভু।
চায় সে আমার কাছে
আমার মাঝে গভীর গোপন যে সুধারস আছে।

এই উদ্ধৃতির 'নয় সে কেবল প্রভু', এবং 'হেলা আমায় করবে না সে কভু', বাক্যদুটিতে বিপ্রলব্ধা নায়িকার যে বেদনা মর্মরিত হয়েছে তা যেন কাদম্বরী দেবীর মর্মবেদনারই দোসর। তা ছাড়া এখানেও মুক্তিকামনাই মৃত্যুকামনাকে ডেকে এনেছে—

মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী,
মধুর মরণ, ওগো আমার অনন্ত ভিখারি।

দাও, খুলে দাও দ্বার,
ব্যর্থ বাইশ বছর হতে পার করে দাও
কালের পারাবার।

এই করুণ কাহিনী শুধু 'পলাতকা'র "মুক্তি" কবিতাতেই আকস্মিকভাবে আসে নি। রবীন্দ্রমানসে তার একটা স্থায়ী আসন ছিল। 'পলাতকা'র "মুক্তি" যেন 'গল্পগুচ্ছের' "স্ত্রীর পত্র" গল্পেরই পরিপূরক কাহিনী।

'পলাতকা'র শেষভাগে কয়েকটি গীতিকবিতাও সংকলিত হয়েছে। উপান্ত কবিতা 'শেষ গান'ই 'পূরবী'র প্রথমে পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে। যারা কবির সাঁঝসকালের গানের দীপে আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে তাদের হাতে হাত রেখে জীবনের শেষগান গাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই ওতে ভাষা পেয়েছে। আর, বলাই বাহুল্য, তাদেরই কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন কাদম্বরী দেবী। 'পলাতকা'র শেষ কবিতা "শেষ প্রতিষ্ঠা"য় কাদম্বরী দেবীরই মূর্তি-প্রতিষ্ঠার নূতন মন্ত্র উচ্চারিত হল। কবি বলছেন:

এই কথা সদা শুনি, "গেছে চলে", "গেছে চলে।"
তবু রাখি ব'লে
ব'লো না, "সে নাই।"
সে-কথাটা মিথ্যা, তাই
কিছুতেই সহে না যে,
মর্মে গিয়ে বাজে।

*　　*　　*

আমি চাই সেইখানে মিলাইতে প্রাণ
যে-সমুদ্রে আছে নাই পূর্ণ হয়ে রয়েছে সমান।

'পলাতকা'র এই কবিতাটি 'বলাকা'র "ছবি" থেকে 'পূরবী'র "লীলাসঙ্গিনী"তে উত্তরণের সোপান।